আদরিণী

CAL. ART. STUDIO.

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

দ্বিতীয় খণ্ড।

কলিকাতা।

১৬৭ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,—কর প্রেসে
শ্রীঅধর নাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত
ও প্রকাশিত।

মূল্য ২, টাকা মাত্র।

সূচীপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

অশুদ্ধ সংশোধন।

পৃষ্ঠা।		পংক্তি।	অশুদ্ধ।		শুদ্ধি।

বিজয়সিংহের "জাহাঙ্গীর" স্থানে "আরঙ্গজেব" হইবে।

১১১	...	৯	ইউরোপ	...	হউক না
১৪৫	...	১৮	বায়রণ দান্তে	...	বায়রণ ও দান্তে
২৫৭	...	৩	অর্থাৎ আমি	...	আমি যে,আমি সেই। (আমি স্বতঃ সিদ্ধ)
ঐ	...	৭	শূন্যপথে ভ্রাম্যমান		পড়িতে হইবে না।
ঐ	...	১৪	মানব দেহে	...	জীবদেহে।
ঐ	...	২২	*তোমার কি আছে*		*তুমি কে*

☞ অনবকাশ বশতঃ সকল ভ্রম সংশোধন হই। না। আকার ইকারের ভুলগুলি পাঠকগণ আপনারা সংশোধন করিয়া পাঠ করিলে বাধিত হইব।

আদরিণী।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

২য় খণ্ড] ১২৮৮ সাল। [১ম সংখ্যা

নব বর্ষ।

অনন্ত কাল সমুদ্রের অতুঙ্গ উর্ম্মিমালা বিলোড়িত বিশাল উরসে এই ব্রহ্মাণ্ড ভাসিয়া বেড়াইতেছে; ভাসিতে ভাসিতে কখন ডুবিতেছে, কখন উঠিতেছে, কখন আধ আধ ডুবিয়া আবার ভাসিতেছে, সন্তরণ পর চঞ্চল বালকের ন্যায় কিয়ৎক্ষণ ডুবিয়া থাকিয়া আবার ভাসিতেছে। সেই সময়-তরঙ্গে ভাসমান পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রাদি লোকনিবাসী শরীরী মাত্রেই তাহার লহরী লীলায় ভাসিতে ভাসিতে, নাচিতে নাচিতে, থাকিয়া থাকিয়া কোথায় যাইতেছে দেখিতে পাই না, আবার পলক পরিবর্ত্তন করিতে না করিতে একটার স্থানে শত শতটা দৃষ্টিগোচর হইতেছে; সময়ের অপরিবর্জ্জ-নীয় নিয়মে তাহারাও আবার ভাসিয়া ভাসিয়া কতকদূর গিয়া অদৃশ্য হইয়া কোথায় চলিয়া যাইতেছে, খুঁজিয়া পাই না। ক্ষণস্থায়ী লঘুকায় ফেণ-

পুঞ্জের ন্যায় শত, সহস্র, কোটী কোটী উল্কাপিণ্ড, জ্যোতিষ্ক মণ্ডল উৎপন্ন হইয়া ভাসিয়া ভাসিয়া কালরূপ মহাব্ধির অনন্ত অঙ্কে অঙ্গ লুকাইতেছে, বহু অনুসন্ধানেও দেখিতে পাইতেছি না। এই সময়সমুদ্র সুবিস্তৃত, সুদূর-প্রসারী, এবং অনন্ত! উহার হৃদ্‌কম্পনে পোতাদিরত কথাই নাই, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দ্বীপ শ্রেণীও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। এই অসীম বারিধি অতলস্পর্শ, অস্থির! গগনস্পর্শী অত্যুচ্চ কীর্ত্তিস্তম্ভ ইহার চঞ্চল বক্ষে স্থির থাকিতে পারে না, বা ইহার অন্তস্থল স্পর্শ করিতেও সমর্থ হয় না। রম-নীয় নগর, অপূর্ব্ব হর্ম্ম্য ইহাতে কোন চিহ্নই রাখিতে পারে না, দেব, দৈত্য মনুষ্য সকলেই এই মহাকায় সমুদ্র হৃদয়ে তৃণাণুতৃণ অপেক্ষাও লঘু। এই জড় জগৎ, মনুষ্যাদি উৎকৃষ্ট শ্রেণীস্থ প্রাণীবর্গ সকলই সময় তরঙ্গে ক্ষুদ্র জলবিম্ব সদৃশ এবং তাহাদিগের উৎপত্তি, স্থিতি এবং বিনাশ যখন কালের স্বেচ্ছাসাপেক্ষ, তখন অন্যান্য পার্থিব পদার্থের কথা আর কি বলিব!

এই সুমহৎ কাল-সমুদ্রে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাসাদি শাস্ত্র অর্ণবপোতের ন্যায় ভাসমান রহিয়াছে, রাজবিপ্লবরূপ ভয়ানক তরঙ্গান্দোলনে সময়ে সময়ে ডুবু ডুবু হয়, কোন কোনটা ডুবিয়া যায়; কিন্তু অনেকগুলিই ডুবিয়াও ডুবে না। ভারতে আর্য্যাধিকারের বিলোপ এবং যবনাধিকার তরঙ্গে ভার-তীয় আর্য্য সাহিত্য, আর্য্য দর্শন এবং আর্য্য ইতিহাসাদি ডুবিতে ডুবিতে রহিয়া গিয়াছে, কেবল যেগুলি ক্ষুদ্রায়ত, দুর্ব্বলাঙ্গ সেই গুলিই তরঙ্গাঘাতে চূর্ণ হইয়া জলমগ্ন হইয়াছে। যে গুলি অক্ষতাঙ্গে আজিও এই কাল সমুদ্র বক্ষে ভাসিতেছে, সে গুলি প্রায় চিরস্থায়ীত্ব লাভ করিয়া পৃথিবীর নানা দেশে, নানা স্থানে মহামূল্য পণ্য বহন করিয়া তত্তৎ স্থানের মহদুপকার সংসাধন করিতেছে। বঙ্গীয় সাহিত্যসম্বন্ধে আমাদিগের বক্ষ্যমান সংবাদ ও সাময়ীক পত্র সমুদায়ও কালসমুদ্রে এক একটী পোত স্বরূপ। গ্রাহকগণ তাহার পক্ষে বায়ু, লেখকগণ পাল, অর্থ তাহার কর্ণ, এবং সম্পাদক কর্ণধার। বঙ্গীয় বায়ুমণ্ডল সর্ব্বদাই চঞ্চল, একভাবে দীর্ঘকাল প্রবাহিত নহে, ক্ষণে ক্ষণে তাহার গতিপরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়; কাজেই পোতের পক্ষে অনুকূল নহে। কিন্তু তাহা বলিয়া যে সাহিত্যিক বঙ্গ নির্বাত নিষ্কম্প বলিব তাহাও নহে। একখানি জলযান,সমুদ্রে ভাসিতে না

ভাসিতে চারিদিক হইতে বায়ু বহিতে থাকে, তাহা দেখিয়াই নবব্রতী কর্ণধারগণ উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া আপন যান ভাসাইয়া সাগরবক্ষে ভাসিতে উদ্যত হয়েন! কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কিছুদূর যাইতে না যাইতেই দেখিতে পান বায়ু অনুকূল নহে; প্রতিকূল ও উচ্ছৃঙ্খল তরঙ্গাঘাতে যান দোদুল্যমান, পাল শীঘ্রই চঞ্চল হইয়া পড়ে, স্থির থাকিতে পারে না, কর্ণধার বুদ্ধি ও কর্ত্তব্য জ্ঞান হারাইয়া অস্থির হইয়া পড়েন, জলযান স্থির রাখিয়া চালাইতে পারেন না, কাজেই কখন ডুবে, কখন ভাসে, এইরূপ করিতে করিতে ক্ষণেক ডুবিয়া, ক্ষণেক ভাসিয়া নিমগ্ন হয়, কর্ণধার পরিপক্ক ও দৃঢ়ব্রত হইলে আপন দক্ষতায় কর্ণচালনার গুণে আপন পোত তরঙ্গ বক্ষে উত্তোলিত করিতে সমর্থ হয়েন কিন্তু বায়ু প্রতিকূল! কতক্ষণ তদ্রূপ অবস্থায় তিনি তাহাকে সুরক্ষিত করিতে পারেন! তখনই আবার সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হয়, কর্ণধারের উদ্যমে এইরূপে দুই এক বার উঠিয়া ডুবিয়া একবারে চিরকালের মত অদৃশ্য হয়, পুনরুত্থিত হয় না। কর্ণধার অপরিপক্ক এবং কর্ণ হীনবল হইলে কর্ণধারকে লইয়া সামাল সামাল পড়ে, এবং অবস্থা বিশেষে তাঁহার জীবন পর্য্যন্ত সংশয় হইয়া উঠে। আমরা ভিতরের কথা ততটা বলিতে পারি না, কিন্তু বোধহয় বায়ুর প্রতিকূলতাতেই জ্ঞানাঙ্কুরের মত এক খানি সুদৃঢ় পোতের অকাল নিমজ্জন! আর্য্য দর্শনের বায়ু বড় ভাল নয়, পালখানি মাঝা মাঝি রকমের, কর্ণধার ভাল, কর্ণের জোর ততটা নাই, সুতরাং আর্য্যদর্শন কখন ডুবিতেছে, কখন ভাসিতেছে, অথচ ডুবিয়া ডুবিয়াও চলিতেছে। বান্ধব আকারে বেশ, সুদৃঢ় নির্ম্মিত, পালখানি বড় শক্ত, কর্ণ বেশ সুকল, ভারি তেজস্বল, কর্ণধার ভারি সুচতুর, বায়ববিজ্ঞান পারদর্শী, কিন্তু কর্ণধারের শৈথিল্যে বান্ধব কিছু মন্দগতি। বঙ্গদর্শনের বায়ু খুব সানুকূল, পালখানি প্রথম বর্ষের পরই, নূতন হইলেও, কোন কোন অংশে পরিবর্ত্তিত, কর্ণ তেজস্বল, কর্ণধার অতিবড় দক্ষ, ম্যাগেলন, ড্রেক, কুক অপেক্ষাও দক্ষ, মনে করিলে যেমন তেমন পাল লইয়া তিনি দুই তিন বার পৃথিবী পরিক্রম করিয়া আসিতে পারেন; তথাপি আমরা বলিতে পারি না, কেন তিনি মধ্যে মধ্যে হাল ছাড়িয়া বসিয়া থাকেন। ইহাতে আমরা এই ভাবিব যে তাঁহার ক্ষমতা স্বত্তেও তিনি সুখ দুঃখের

চঞ্চল পরিক্রমণ দেখাইবার নিমিত্ত এবং আপনার নৌবিদ্যা পারদর্শীতা হেতু বিপদ প্রিয়তার বশ হইয়া আপন পোত ডুবাইয়া, তুলিয়া, নাচাইয়া দোলাইয়া কৌতুহল পরিতৃপ্তির জন্য মধ্যে মধ্যে হাল ছাড়িয়া অন্য কর্ণধারের হস্তে, তাঁহার অবর্ত্তমানে, কিরূপ চলিবে, তাহারই পরীক্ষা করিতেছেন।

আমাদিগের ক্ষুদ্র কায়া আদরিণী অর্ণবপোত নহে, মহাসমুদ্র পার হইবার জন্যও নহে। বস্তুতঃ একখানি ক্ষুদ্র তরণী, গ্রীষ্মকালের সকাল সন্ধ্যায় ক্ষুদ্র তরঙ্গময়ী গঙ্গাবক্ষে শীতল সমীর সেবায় বেড়াইবার উদ্দেশে নির্ম্মিত, ইহার কায়া ক্ষুদ্র, পালখানি সৌখিন কাপড়ে প্রস্তুত, কর্ণটী ক্ষুদ্র, একটু মজবুতও বলিতে পারি; এজন্য জোয়ার ভাটায় চলে, চালাইবার জন্য নৌবিদ্যা বিশারদ কাপ্তেনের প্রয়োজন হয় না, সামান্য বায়ুভরেই চলিয়া যায়। তথাপি ইচ্ছামত চালাইবার জন্য একটু অনুকূল বায়ুরও প্রয়োজন। এই রূপেই ত দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাটিয়া গেল। মানবমনে কখন আশার নিবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। এই অল্প সময় গঙ্গার স্থির জলে দুই একটা জাহাজী বয়ার ঘূর্ণাবর্ত্তে ও অমাবস্যা পূর্ণিমার জোয়ারে ভালয় ভালয় আপনার ক্ষুদ্র তরণীখানি চালাইয়াই তরঙ্গময় সাগরজলে যাইবার জন্য কর্ণধারের অসমসাহসীকতা ও অসীম কৌতুহল জন্মিয়াছে; এইজন্য ভাঙ্গিয়া গড়িয়া তরণীখানিকে বর্ত্তমান বর্ষে একটু বড় এবং শক্ত সমর্থ করিয়া সাগর সঙ্গম পর্য্যন্ত যাত্রা করিবার উদ্যোগ হইতেছে। পশ্চাৎ যেমন দেখা যাইবে সেইরূপ করিবার ইচ্ছা আছে, এখন ভবিষ্যতের কথায় প্রয়োজন নাই। এক্ষণে বায়ুমণ্ডলকে অভিবাদন করি তাঁহারা ক্ষুদ্র কায়া তরণীখানির প্রতি একটু অনুকুল দৃষ্টি রাখিলেই আমাদিগের সকল আশা, সকল ভরসা, সকল যত্ন সফল হইবে।

আজি আদরিণীর জন্মদিন, প্রণম্যগণকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদিগের পবিত্র পদধূলি কল্যাণের জন্য আদরিণীর মস্তকে দিয়া, সমবয়সীদিগকে নমস্কার এবং বয়ঃকনিষ্ঠদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আদরিণীর জন্মতিথির পূজায় প্রবৃত্ত হইলাম।

একটী রমণীর প্রতি।

১

কে তুমিলো সুহাসিনী সহাস্য আননে,
পশিয়া কাননে, চয়ি কুসুম রতন,
সাজাইছ বরবপুঃ অতীব যতনে,
হেলাইতে অবহেলে কামের কেতন ?
হাসিয়া মধুর হাসি ও বিম্ব অধরে,
ভুলাতেছ ওই রূপে সবে হেমাঙ্গিনী,
কিন্তু এ যৌবন তব চির দিন তরে,
নহে লো জীবনে স্থির হৃদি বিনোদিনী !

২

এই যে প্রকৃতি সতী নবীন যৌবনে,
সাজিয়াছে ভুলাইতে মানবের মন,
লয়ে যায় নিরূপম অমূল্য রতনে,
সাজাতেছ তব ওই যৌবন রতন।
এই সে বসন্তকাল চিরদিন তরে,
রহিবে না স্থির, কালে হইবে বিলীন,
নাহি কুহরিবে পিক আনন্দ অন্তরে,
প্রকৃতির চারু শোভা হইবে মলিন।

৩

আরনা হাসিবে বসি চারু বৃন্ত প'রে,
হাসাইতে মানবেরে,—প্রসূন রতন,
আর না উঠিবে লতা চারু বেশ প'রে,
বিজড়িয়া মহীরুহ প্রাণেশ রতন।

নব কিশলয় দাম হাসি মুখে আর,
প্রকৃতির মধুরিমা করিতে বর্দ্ধন,
হবে না চেষ্টিত, পুন করি পরিহার,—
হ'বে বিষাদিনী সতী—নবীন বসন।

৪

আবার বৎসর পরে যেই দিন হ'তে,
মৃদুল মলয়ানিল হ'বে প্রবাহিত,
আনন্দে প্রকৃতি সতী সেই দিন হ'তে,
নবীন যৌবনে পুনঃ হইবে সজ্জিত।
কিন্তু অয়ি বিধুমুখী তোমার যৌবন,
একবার জীবনেতে হইলে অন্তর,
কর যদি অবিরত সহস্র যতন,
এক দিন তরে কভু ফিরিবেনা আর।

৫

জীবন নদীতে এই যৌবনের স্রোত,
এক প্রবাহনে চির হয় প্রবাহিত,
কখন তাহাতে আর নাহি প্রতিস্রোত,
প্রকৃতির রিতি এই চির প্রচলিত।
তাই বলি সুবদনী হাস মন খুলে,
নাহি তাহে দুঃখ, কিন্তু বড় দুখ হয়,
হেরি যদি ও নয়ন অবিরত জলে—
প্লাবিত, বদন-দ্যুতি দ্যুতি হীন তায়।

সুধারাম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বড় অধিক দিনের কথা নয় ১২৭৩ সালের (বঙ্গাব্দ) ভাদ্রমাসের এক দিন প্রভাতকালে একটী ব্রাহ্মণ, বয়স আন্দাজ চুয়াল্লিশ বৎসর, সঙ্গে তদীয় সহধর্ম্মিণী ও বার তের বৎসর বয়সের একটী পুত্র, শশব্যস্তে মায়াপুর গ্রাম পশ্চাৎ রাখিয়া উত্তর মুখে বর্দ্ধমানের দিকে যাইতেছেন। বর্ষাকাল—পথ বড় পিছল—তায় মাঠ—ব্রাহ্মণ বড় কষ্টে চলিতেছেন। যখন তাঁহারা আদমপুরে পৌছিলেন, তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই।

১২৭৩ সাল যে কি ভয়ানক বৎসর পাঠকবর্গ বোধ হয় এখনও বিস্মৃত হয়েন নাই। ১১৭৬ সালের মন্বন্তরার কথা আমরা ইতিহাসে পড়িয়াছি, ও প্রাচীনগণের মুখে শুনিয়াছি। একশত বৎসর অতীত না হইতে হইতেই বঙ্গে পুনরায় তদ্রূপ মন্বন্তরা;—চারিদিকে হাহারব;—"হা অন্ন, যো অন্ন" বই লোকের মুখে আর অন্য শব্দ ছিল না; দরিদ্রের ত কথাই নাই, কত সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ নিঃস্ব হইয়া পড়িল, দিনান্তে অন্ন জুটিয়া উঠা ভার। সুবর্ণ অর্দ্ধ মূল্যে এবং রৌপ্য কাংশ্য মূল্যে বিক্রীত হইতে লাগিল। কত যে নির্ধন লোক মারা পড়িল তাহার সংখ্যা করা সুকঠিন। আমরা যে ব্রাহ্মণটীর উল্লেখ করিলাম তাঁহার নাম সুধাময় চক্রবর্ত্তী—সুধারামের বাস হুগলী জেলায় জাহানাবাদ সবডিবিজানের অন্তর্গত মায়াপুরে—হুগলী জেলার মানচিত্রে ফিরোজা বাদ বলিয়াও লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। কেন যে গ্রামটীর অপর নাম ফিরোজাবাদ তাহা আমরা এপর্য্যন্ত সবিশেষ অবগত নহি। এই গ্রামের মধ্যস্থলে একটী অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ আছে;—তাহার নিকটেই একটী বৃহৎ দীর্ঘিকা, দীর্ঘিকাটীর নাম "পাতসাহী দিঘি;"—বোধহয় কোন মুসলমান জমিদার কর্ত্তৃক ঐরূপ নাম প্রদত্ত হইয়া থাকিবে। যাহাই হউক সে সম্বন্ধে আমাদিগের কিছু অধিক বলিবার

প্রয়োজন নাই। সুধারামের পূর্ব্ব পুরুষ এই গ্রামে বাস করিতেন;—তাঁহার কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ব্যতীত কিছু নগদ টাকার সম্পত্তি ছিল। সুধারামের পূর্ব্বপুরুষদিগের বিলক্ষণ দেবকীর্ত্তি ও দোল দুর্গোৎসবাদি দৈব কার্য্যের অনুষ্ঠান ছিল। সুধারাম পৈতৃক সম্পত্তির সহিত তাঁহাদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি সদ্‌গুণের উত্তরাধিকারীত্ব লাভ করিয়া ছিলেন। যৌবন কালে তিনি বস্ত্র ও রেশমের ব্যবসার আরম্ভ করেন; তাহাতে বেশ দশ টাকা লাভ করিয়া পৈতৃক সম্পত্তির উন্নতিও করিয়াছিলেন। ঘাটালের ওয়াটসন কোম্পানির সহিত তাঁহার রেশমের কারবার চলিত;—কোম্পানির ঘরে তাঁহার খুব প্রতিপত্তি ও ছিল;—সুধারাম একজন বড় মহাজন। অল্প বয়সেই সুধা-রামের একটি পুত্র জন্মে তাহার নাম দুর্গাদাস;—দুর্গাদাসের পর সুধা-রামের পুত্র কন্যায় পাঁচটী। সর্ব্বকনিষ্ঠ বসন্ত, বার তের বৎসর বয়স্ক; আজি তাঁহার সঙ্গে যাইতেছে। "ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ," সুধারামের এই কথার সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যাইত। গ্রামের মধ্যে সুধারাম এক জন ভাগ্যবান্ পুরুষ সকলেই জানিত। কিন্তু অদৃষ্টের চঞ্চল চক্র নিয়তই ঘূর্ণায়মান; তাহার একদিকে সুখ, অপর দিকে দুঃখ; সুতরাং সেই অদৃষ্ট চক্রের নিয়তাবর্ত্তনে মনুষ্যের সুখ দুঃখের পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য; ইহাই যদি সংসারের অখণ্ডনীয় নিয়ম; এই যদি ললাট লিপির গুপ্ত রহস্য; এই অদৃ-ষ্টই যদি মনুষ্যের সুখ দুঃখের নিয়ন্তা তবে সুধারামের চিরদিন কেন সমান যাইবে? কেন তাঁহার সুখ সৌভাগ্য অব্যাহত থাকিবে? কেনই বা তাঁহার ললাট পট্টে সাধারণ লিপির ব্যভিচার হইবে? এবং কি কারণেই বা সেই বিশ্বজনীন নিয়মের প্রত্যবায় সম্ভাবিবে? এক বৎসর সুধারাম যে দরে রেশমের কণ্ট্রাক্ট লইয়া ছিলেন, সে বৎসর বাজার গরম হওয়ায় তাঁহার প্রায় দশ সহস্র মুদ্রা ক্ষতি হইল; সেই সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার একটী ভূসম্পত্তি লইয়া কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে মোকর্দ্দমা চলিতেছিল। হাইকোর্টের বিচারে তাঁহার পরাজয় হওয়ায় তাঁহাকে পাঁচ ছয় সহস্র মুদ্রা ক্ষতির পূরণ করিতে হইল; সেই ভূসম্পত্তিতে তাঁহার বিলক্ষণ আয় ছিল। তাহাও হস্তান্তরিত হইয়া গেল। তাঁহার ক্রীত সুখের দিন সেই সঙ্গে বিক্রীত হইল। যে সৌভাগ্যাগম নারিকেল ফলাম্বুবৎ কাহার অনুভাবনীয় নহে;

আজি সুধারামের সেই সৌভাগ্যের তিরোধান, সাধারণের অহর্নিশ আলোচনীয় হইয়া উঠিল। তাঁহার রেশমের কারবার বন্ধ হইল; তাঁহার দিন চলা ভার হইয়া উঠিল; পুত্র কয়টী অপ্রাপ্ত ব্যবহার; তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া মসী জীবীর কার্য্য দ্বারা আপন পরিবারের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। নিবিড় নীরদাগমে বলাকার ন্যায় বিপদ ও শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আসিয়া থাকে। মনুষ্যের বিপদ কখন একাকী আইসে না। তাসের পড়তার ন্যায় অদৃষ্টের পড়তা;—লোকের যখন পড়তায় জোর থাকে, তখন প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষ যেখানে কাটাক, ছয় খান রং ফেরাই সমেত প্রায়ই আসিয়া উপস্থিত হয়;—খেলওয়াড় মন্দ হইলেও জয়লাভ করে। আবার সেই পড়তা মন্দ হইলে রঙ্গের দুইখানি মাত্র সাতা আটা আসিয়া সাত তুরুপ রক্ষা করে, আর প্রতি হাত ভেস্তা হারায়; পাঁচ বারের ভেস্তার আনুসাঙ্গিক কাগজে বাদসাহী পাঞ্জা হারাইয়া মান সম্ভ্রম সকলই নষ্ট করে। খেলওয়াড়ের খেলার পারদর্শীতায় কিছু আসে যায় না। পড়তা ভাল হইলে বিচক্ষণ খেলওয়াড়ের উপর ও জয়লাভ করা যায়; কিন্তু সাবধান হওয়া চাই সাততুরুপ না হয়;—সাততুরুপে পড়তা বড় খারাপ করে;—শেষ তুকুড়ি সাতের খেলা পর্য্যন্ত রক্ষা হয় না, হাতের পাঁচ পর্য্যন্ত যায়। আমাদিগের সংসার খেলায় অনেক বি এ, এম এ, এণ্ট্রান্স ফেল খেলওয়াড়ের সহিত এই সংসার খেলায় খেলিতে বসিয়াছেন। বি এ; এম এ, দিগের খেলায় পারদর্শীতা আছে স্বীকার করি; কিন্তু তাঁহাদিগের পড়তা মন্দ; সুতরাং দুকুড়ি সাত রক্ষা হইতেছে না। প্রায়ই দেখিনা যে তাঁহাদিগের দুকুড়ি সাত রক্ষা হইয়া হাতের পাঁচ রহিল। এ সংসারে তাঁহাদিগের রংএর মুরুব্বির জোর নাই, সুতরাং খেলা হইতেছে না। পড়তা মন্দ;—কিন্তু তাও বলি, দীর্ঘকাল পড়তা সমান থাকেনা; একবার ফিরিলে, ভাল খেলওয়াড়;—বোম ভেস্তা পর্য্যন্ত জিতিয়া বসিবেন। সংসার খেলার পড়তাই মূল! রেশমের কণ্ট্রাক্টের সাততুরুপেই আমাদিগের সুধারাম হাতের পাঁচ হারাইলেন;—ক্রমে দুই তিন বৎসরের মধ্যে যতগুলি পুত্র কন্যা ছিল সকলই গেল, কেবল মাত্র বসন্ত রহিল। সুধারাম পড়তার আশায় খেলা বন্ধ করিতে পারিলেন না;—আর পড়তার মান্দ্যে কয় জনই বা খেলা

তুলিয়া দিয়া থাকেন? সুধারামের সংসারে এখন ক্রিয়া কলাপাদি বিন্তি পঞ্চাশের ডাক ছিল না, কেবলমাত্র চুকুড়ি সাতের খেলা, তা মসীজীবির ব্যবসায়েই, রক্ষা হইতেছিল। কিন্তু দুর্ভিক্ষের পড়তায় রং ফেরাই কিছুই পাড়িল না, সকলই মহাজনদিগের হাতে গেল। সুতরাং তাঁহার ঘোর বিপদ; তখন তিনি মায়াপুরের খেলা বন্ধ করিয়া অন্যত্র গিয়া পড়তা ফিরাইবার চেষ্টা করিলেন।

সংসার চলে না;—বিষয় বিভব ক্রমে সকলই গিয়াছে, যে গ্রামে থাকিয়া তিনি ক্রিয়া কলাপোপলক্ষে শত শত লোককে আহারাদি প্রদানে পরিতুষ্ট করিয়াছেন, সহস্র সহস্র অনাথ, বিপন্ন দীন দরিদ্রদিগকে অন্ন বস্ত্র দিয়া দানশীলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, আজি সেই গ্রামে থাকিয়া একমুষ্টি অন্নের জন্য পরদ্বারস্থ হওয়া অপেক্ষা, মরণ শ্রেয়স্কর বিবেচনায় তিনি পৃথিবীর মধ্যে প্রিয়তম স্থান জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতেও কৃত সংকল্প হইয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে পুত্র এবং ব্রাহ্মণীকে লইয়া প্রস্থান করিতেছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সূর্য্যোদয় হইল;—বর্ষার গাছ পালায় বৃষ্টিকরধৌত আর্দ্র পত্রনিচয়ে সূর্য্যের তরুণ রশ্মি প্রতিত হইয়া পাতাগুলিকে যেন সুবর্ণময় করিল। সরোবরে পদ্ম ফুটিল;—স্থলজ জলজ অন্য কোন ফুলে বর্ষাকালে মধু থাকে না, বৃষ্টিতে ধৌত হইয়া যায়; কেবল থাকে পদ্মে আর কেতক পুষ্পে;—সে জন্যই মধুমক্ষি ভ্রমর আর কোথাও থাকে না, কেবল পদ্মবনে আর কণ্টকাকীর্ণ হইলেও, কেতককুঞ্জে। কোকিল সুখের পাখী;—বড়মানুষের মোসাহেব; গীতবাদ্য আমোদ প্রমোদের সময় তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, বাবুর বিপদ পড়িলে, তাঁহার শরীর অসুস্থ হয়, বাটী হইতে বাহির হইবার সামর্থ থাকে না। এমন পাখী জলকাদায় ভিজিতে, কাদামাখিতে কেন আসিবে; এখন দুঃখের দুঃখী পাপিয়া প্রকৃতির প্রতি, মধুর

শব্দে, কোকিলের অকৃতজ্ঞতা দেখিতে না পারিয়াই যেন, " চোক গেল " বলিয়া বারম্বার চীৎকার করিতেছে। ক্ষুদ্রকায় হইলে কি হয়, যাহার মন বড়, তাহার সামর্থ কম হইলেও সে প্রশংসার উপযুক্ত, তাহার দৃষ্টান্ত দয়েল ;—বসন্তে নাচিয়া কুঁদিয়া গাছের ডালে বেড়াইয়াছে, আজিও তাই করিতেছে।

ক্রমে বেলা দু চারি দণ্ড হইল ;—সুধারাম কোথায় যাইতেছেন, কাহার নিকটই বা যাইতেছেন, কিছুরই অবধারিত নাই। স্নান কাল হইল ;—একটী গ্রামে পোঁছিলেন, সেখান হইতে তাঁহার বাটী প্রায় তিন চারি ক্রোশ ;—এখানকার কোন লোকই তাঁহার পরিচিত নহে ;—সুতরাং তিনি আহারীয়ের জন্য আপন স্ত্রী ও পুত্রটীকে রাখিয়া গ্রাম মধ্যে ভিক্ষার্থ গমন করিলেন। ভিক্ষাই যদি মিলিবে তবে " দুর্ভিক্ষ " নামের সার্থকতা কোথায় রহিল ! সুধারাম দেখিলেন, তাঁহার মত কতলোক ভিক্ষার্থী ;—ঐ অন্নকৃচ্ছ্রতায় সকলেই ব্যথিত। গ্রাম মধ্যে অন্নাভাব নাই এমন লোকের সংখ্যা বড় কম। যাহার আছে তাহারাও যে অতিথি অভ্যাগতদিগকে সাহায্য করিতে পারে তাহাও আশা করা যায় না। আমরা নগরের কথা বলিতেছি না পল্লীগ্রামে প্রতিবাসী বা গ্রামের কেহ দুঃখে পড়িলে, বা কাহার অন্নাভাব হইলে অন্যলোকে তাহাকে সাধ্যানুসারে আনুকূল্য করিয়া থাকে। সুধারাম স্বগ্রামে থাকিলে তাহার প্রত্যাশা করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি লোকলজ্জা, সম্ভ্রমের ভয়ে, বিদেশে থাকিলেন, কিন্তু এখানে অনাহার ! এগ্রাম সেগ্রাম করিয়া সমস্ত দিন গেল, অন্ন সংস্থান হইল না, বসন্ত বালক, তাহাকে দেখিয়া একজন গৃহস্থ গেহিনী দয়া করিয়া চারটী অন্ন দিয়াছিলেন, সে গৃহস্থের এমন সংস্থান ছিল্ না যে আমাদিগের ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর আতিথ্য সৎকার করে ;—ব্রাহ্মণ সমস্ত দিন ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিলেন, কিছুই পাইলেন না, আসিয়া শুনিলেন বসন্ত অনশনে নাই ;—তাঁহার ক্ষুধা তৃষ্টা তাহাতেই দুর হইল ; তাঁহার বড় ভাবনা ছিল, আসিলেই বসন্ত খাবার জন্য কাঁদিবে ; কিন্তু বসন্ত নিতান্ত ছেলে মানুষ নয় ; পিতা মাতার আহার হয় নাই, তাহা সে জানিত ; সুধারাম আসিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিল তাঁহার খাওয়া হইয়াছে কি না, আমাদিগের সুধারাম কখন মিথ্যা

কথা বলেন না। যদি তাঁহার মিথ্যা বলিবার সাহস থাকিত তাহা হইলে রেশমের ব্যবসায়ে সর্ব্বস্বান্ত হইতেন না; কিন্তু পুত্রের দুঃখ দেখিয়া তাঁহাকে অগত্যা বলিতে হইল যে তাঁহার আহার হইয়াছে।

বসন্ত ক্ষণেক চিন্তা করিল; চিন্তার পর আবার জিজ্ঞাসা করিল;— "মার ত খাওয়া হইল না।" সুধারাম বনিতা, পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন "বাবা তোমার খাওয়াতেই, আমার খাওয়া হইয়াছে।" বসন্ত বুঝিল না, মাতার মুখ পানেঁ চাহিয়া থাকিয়া বলিল "মা তবে তুমি কিছু খাও না।"

মাতা। হাঁ বাবা! আমার পেঠ ভরেছে।

বসন্ত। তা কি ক'রে হবে মা?

মাতা। কেন বাবা তুমি যখন আমার গর্ভেছিলে, তখন কি তুমি নিজে আহার কত্তে, আমি খেলেই তোমার খাওয়া হতো না?

বসন্ত। হাঁ মা! কিন্তু এখন ত তুমি খেলে আমার পেট ভরে না?

মাতা। বাবা! তুমি আমার গর্ভে থাকৃতে, আমি খেলেই যেমন তোমার খাওয়া হতো, এখন তেমনি তুমি খেলেই আমার খাওয়া হয়।

বসন্ত। না মা আমার কাছে তোমাকে কিছু খেতে হবে।

বসন্ত জননী কথা কহিলেন না, পুত্রকে বক্ষে লইলেন;—বসন্তর পৃষ্ঠে তদীয় জননীর গলিতাশ্রু ধারাকারে বহিতে লাগিল, বসন্ত জানিতে পারিল জননী কাঁদিতেছেন, কথা কহিতে চেস্টা করিল, পারিল না, জননীর পৃষ্ঠদেশ হইতে মস্তক তুলিয়া দুই হস্তে তাঁহার চক্ষু দুইটি ধরিল; এবারেও বসন্তর মুখে কথা আসিল না। বর্ষাকালের সন্ধ্যা আসিয়া নিশীথের অন্ধকারে পৃথিবীকে ঢাকা দিল। সুধারাম বটবৃক্ষতলে বসিয়া সহধর্ম্মিণী ও পুত্রের কথা শুনিয়া কি যে ভাবিতে বসিয়া ছিলেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না;—কই গভীর শ্বাস পতনেরও ত শব্দ পাই না। সুধারাম সীমন্তিনী পুত্রকে কোলে লইয়া বলিলেন "আর বসিয়া ভাবিলে কি হইবে, চল নিকটে ঠাকুর মন্দির থাকেত সেখানে গিয়া রাত্রি কাটাই।" অন্ধকার ময়ী রাত্রি—পথ কর্দ্দম পূর্ণ, অতি কষ্টে পুত্রকে লইয়া তাঁহারা স্ত্রী পুরুষে নিকটবর্ত্তী একটী দেবমন্দিরের সম্মুখে একখানি আটচালা ছিল, তাহাতে

গিয়া আশ্রয় লইলেন—বসন্তর মাতা আপন অঞ্চল ভূমে পাতিয়া বসন্তকে শোয়াইয়া, আপন স্বামীকে অতিরিক্ত একখানি বস্ত্র বিস্তৃত করিয়া শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন এবং আপনি মাটীতে শয়ন করিলেন।

বসন্ত পাছে জানিতে পারে, এজন্য অঞ্চলাংশে আপন দেহ সংলগ্ন করিয়া বসন্তকে কোলে করিয়া রহিলেন। প্রণয়ী মিলনের সুখের রাত্রী ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইলেও রমণীয়, দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া যায়, আর বিপদের রাত্রি কৌমুদী ভূষণা হইলেও ভীষণা ; কোনমতে ফুরায় না। বসন্ত জননীবক্ষে মুখ রাখিয়া একটু ক্ষণ জাগিয়া রহিল ; পরক্ষণেই ঘুমাইল ; ব্রাহ্মণ দম্পতি উভয়েই নীরব ; কিন্তু জাগ্রত ;—কাহার ও মুখে কথা নাই ;—এক শয্যায় শয়নে থাকিয়া স্ত্রী পুরুষকে আমরা কখন বাক্যালাপ পরাঙ্মুখ দেখি নাই ; যদিও কখন কখন দেখি কিন্তু সে অল্পক্ষণের জন্য। রাত্রি কাটিয়া গেল ; দুই চারি দণ্ড আছে, স্বভাবের বশে তাঁহাদিগের চক্ষু মুদিয়া আসিল, একটু নিদ্রা হইল। ভোরের সময় একটী স্ত্রীলোক দেবালয়ের দৈনিক সংকার কার্য্যের জন্য দেবমন্দিরে প্রবেশকালে সপুত্র বণিতা সুধারামকে আটচালায় নিদ্রিত দেখিয়া তাঁহাদিগের নিকটস্থা হইলেন, দেবালয়াধিকারিণী স্ত্রীলোকটির বয়স আনুমানিক কুড়ি কি বাইশ ;—শেষ যৌবনা ; তিনি আসিয়া দেখিলেন প্রাচীন ব্রাহ্মণ, তৎপার্শ্বে বিগতযৌবনা এক কামিনী ;—তাঁহার হস্তে সাধব্য সূচক লৌহ কঙ্কণ ও শঙ্খবলয়, ললাটে সিন্দূর বিন্দু ;—অযত্ন রক্ষিত ;— সরলতার উপর দুঃখের কালিমাবর্ণ মুখ অন্ধকারময় করিয়া রহিয়াছে ;—কিন্তু সরলতার জ্যোতি তাহা ভেদ করিয়া বিকাশ পাইতেছে। তাঁহার ক্রোড় আলোকিত করিয়া বার তের বৎসরের একটি বালক প্রদোষ মুদিত কমল কুসুমের ন্যায় নিদ্রা যাইতেছে ; গলায় যজ্ঞোপবীত, দেখিয়াই ব্রাহ্মণ কুমার বলিয়া চিনিতে পারা যায়, আগন্তুক স্ত্রীলোক দেখিয়াই তাঁহাদিগের তিনজনের পরস্পর পারিবারিক সম্বন্ধ বুঝিয়া লইতে পারিয়া ছিলেন। স্ত্রীলোক অপর স্ত্রীলোককে অসাবধানে স্বামীপাশে নিদ্রা যাইতে দেখিলে লজ্জা বোধ করে, এজন্য তিনি সুধারাম জায়ার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন। আমাদিগের দরিদ্র ব্রাহ্মণ পত্নী আচম্বিত করস্পর্শে চকিত হইয়া জাগ্রত

হইলেন—সলজ্জভাবে উঠিয়া বসিলেন, আগন্তুক স্ত্রীলোকের ইঙ্গিত মাত্র উঠিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বসন্ত তাঁহার অঞ্চল শয্যায় নিদ্রিত ;—তাহাকে জাগ্রত করিতে পারিলেন না, অত্যন্ত ব্যস্তা হইলেন ; সে সময়ে কর্ত্তব্য বিমূঢ়া হইয়া পড়িলেন। তখনও দিবালোক প্রকাশিত হয় নাই ;—দেবালয়াধিকারিণী কিছুদূরে দণ্ডায়মানা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ;——

"ছেলেটী আপনার ?"

"হ্যাঁ !"

"পুরুষটী আপনার স্বামী ?"

"হ্যাঁ।"

"আপনাদের ঘর কোথায় ?"

"মায়াপুরে !"

"এইটী কি বড় ?"

"না মা এটি সব ছোট !"

"এর কোলে কি আর ছেলে পিলে হয় নাই ?"

"না——!"

"বড়টীর বয়স কত ?"

"আর সে দুঃখের কথা কও কেন মা, বড়টীকে ভগবান রাখলে আজ ছেলের বাপ হ'তো ! পাঁচ ছেলের মা—সব বেঁচে থাকলে আজ রাজার মা ! তা'হলে কি আর দুটি ভাতের তরে এদেশ সেদেশ ক'রে বেড়াতে হয় ?"

"কোথা যাবেন ?"—

"উনিই জানেন, আমাকে ত কিছু বলেন না।

"কুটুম্ব সজ্জন কেহ আছে।"

"না মা—কে আছে !"

"তবে ?"

"একদিন দুহাতে অন্ন বস্ত্র দিয়ে, আজ আপনি এক মুঠোর জন্য লোকের দ্বারস্থ হবেন, এই লজ্জায় দেশ ছেড়ে, পরমেশ্বর যেখানে কূল দেন, সেই খানেই যাবেন !"

"কি ক'রে আপনাদের চল্‌তো?"

"উনি একটি দোকানে লেখা পড়া কত্তেন তা'তেই সংসার চল্‌তো!"

"এখন?"

"সেই অল্প আয়ে, সংসারের খরচ কুলায় না!"

"বরাবর এইরূপ?"

"আগে জমি জায়গা, বিষয় আঁশয় খুব ছিল!"

"কিসে গেল?"

"যিনি দিয়েছিলেন, তিনিই নিলেন।"

"আপনার বাপের বাড়ী কোথায়?"

"অনেক দূর, তুমি জান্‌বে না, তাঁদের ও কেহ নাই, যে সেখানে গিয়ে দুদিন জুড়াই। আর এ বয়সে এঁকেই বা কোথা একা রেখে যাবো।"

"কোথায় যাবেন তারও ঠিক নাই?"

"কেমন করে জানবো?"

"আপনার স্বামীর সঙ্গে কোন কথা হয় নাই?"

"তিনি বলেন, ভগবান্ যেখানে কূল দিবেন!"

"তাই ত-উনি পুরুষ মানুষ:——মেয়ের বাড়ীতে:——"

"কেন মা? অমন কথা কেন বল্লে?"

"না—না,——তাই বল্‌চি——বলি উনি পুরুষ মানুষ, না হ'লে আপনি আর ছেলেটী না হয়————"

"না মা, এ বৃদ্ধ বয়সে উনি কোথায় যাবেন?"

তাঁহাদিগের পরস্পরে এই কথা বার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় আমাদিগের সুধারামের নিদ্রার ঘোর ভাঙ্গিল; তিনি চক্ষু মিলিত করিবা মাত্র আগন্তুক স্ত্রীলোকটী উঠিয়া গিয়া দেবালয়ে আপন কাজ করিতে প্রবেশ করিলেন। সুধারাম তাঁহাদিগের শেষ কথাগুলি শুনিতে পাইয়া ছিলেন;—আপন সহধর্ম্মিণীকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি আনুপূর্ব্বিক সকলই তাঁহাকে জানাইয়া কহিলেন "তা কখন হইবে না!"

"এমন সুবিধা ছাড়িতে নাই। এরূপ আশ্রয়লাভ দৈবানুগ্রহের ফল, তাহার সন্দেহ নাই;—আমাদিগের বিপদে "আহা" বলিতে কেহ নাই.

তোমাদিগের দুজনের উপায় হইলে আমি মুষ্টি ভিক্ষা করিয়াও দিন কাটাইতে পারিব, তাই বা কেন করিতে হইবে ;—দুর্ভিক্ষ চিরস্থায়ী নয় ; এ দুঃসময়ে জীবন রক্ষা করিতে পারিলে, অনেক উপায় হবে।"

"তা হবে না। নিরাহারে বসে থাকি, সেও ভাল।"

"তুমি পারলে, কিন্তু বসন্তর ?"

"দুজনে ভিক্ষা ক'রে বসন্তকে উপবাসী থাকৃতে দিব না।"

"দেখ সে বড় কষ্ট ! দৈবাৎ একদিন অনশনে থাকিতে হইলে বসন্ত বাঁচিবে না। আমার কথা রাখ—এঁদের এখানে থাক।"

বসন্তর নিদ্রা ভাঙ্গিল ;—চক্ষু মুছিতে মুছিতে বসন্ত মাতার চক্ষে জল দেখিল, আর তাহার চক্ষু মুছা হইল না, মাতার মুখপানে চাহিয়া বসিয়া রহিল ;—মাতা তাঁহাকে কোলে লইলেন। সুধারাম দেবালয়ের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেবালয়াধিকারিণীকে কহিলেন "মা আপনি ব্রাহ্মণ কন্যা ?—বয়োবৃদ্ধ হলেও আমাকে আপন পুত্রবৎ বিবেচনায় স্ত্রীজাতি সুলভ লজ্জা পরিত্যাগ করে আমার কথার উত্তর দিন। আমি বিপন্ন ব্রাহ্মণ, অনুগ্রহ করে যদি আমার স্ত্রী ও পুত্রকে আশ্রয় দেন তবে জননীর কাজ করা হয়।"

এই কথায় স্ত্রীলোকটী দেবমন্দির হইতে বাহির হইয়া নিকটবর্ত্তী বাটীতে প্রবেশ করিলেন এবং বাটী হইতে একটী প্রাচীনাকে পাঠাইয়া দিলেন, আকার প্রকার অনুমানে বোধ হইল বৃদ্ধা তাঁহার শ্বশ্রূ। বৃদ্ধার সহিত কথা বার্ত্তায় সুধারাম পরিতোষ লাভ করিলেন। তিনি পরিচয়ে জানিলেন যিনি পূর্ব্বে আসিয়া দেবালয়ের সংস্কার কার্য্য করিতেছিলেন তিনি তাঁহার পুত্রবধূ ;—তাঁহার পুত্র ধরণীধর বাবু কলিকাতায় চাকরী করেন ;—বাড়ীতে জমি জায়গা পৈতৃক দেবকীর্ত্তি অধিক থাকায় মোটা বেতন পাইলেও দেশের মায়া ত্যাগ করিতে পারেন না ;—বৎসরান্তর পূজার সময় বাটীতে আসেন ; পূজার বন্ধ বাটীতে কাটাইয়া কলিকাতায় যান। সংসারে বৃদ্ধ মাতা, স্ত্রী, এবং চারি পাঁচ বৎসর বয়সের একটী কন্যা, এ ছাড়া মানুষের সময় ভাল হইলে যেমন দুই এক জন দূর সম্পর্কের কুটুম্ব আসিয়া আপনার হইয়া গৃহস্থের প্রিয় হয়, আত্মীয়তা করে, এমন ও দুই চারি জন লোক

ধরণীধরের গৃহস্থে ছিলেন। সময়ে সময়ে ধরণীধর আপন স্ত্রী, কন্যা এবং মাতাকে লইয়া কলিকাতায় থাকিতেন, সে সময় পরের উপর বাটি রক্ষার ভার থাকিত।

প্রাণদণ্ড।

তুমি আমি, রাজা প্রজা, ধনী নির্ধন, দীন, অনাথ, অন্ধ, খঞ্জ, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গাদি সকলেই ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনাপন জীবন সুখ উপভোগ করিতেছি। সকলেই আহার নিদ্রার বশীভূত—সকলেরই মনে সুখের আশা, জীবনের আশা আছে, সকলেই আপন সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভে ইহ জগতে দীর্ঘকাল থাকিবার বাসনা করে। জীবনের প্রতি মমতা, সকলেরই স্বতঃ সম্ভূত—বালক বিকটমূর্ত্তি দর্শনে ভীত হয়; যন্ত্রণাভোগে অস্থির হয়; যুবা কোনমতে সংসার সুখ পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা ভ্রমেও চিন্তা করে না; বৃদ্ধের কথাই নাই;—বৃদ্ধের জীবনাশা অধিকতর বলবতী; অন্ধ, খঞ্জ, স্থবিরদিগের জীবন বিড়ম্বনা মাত্র—কিন্তু তাহারাও আত্মজীবন পরিত্যাগে অসম্মত। পশু পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি সম্বন্ধেও ঐরূপ, মৃত্যুকে সকলেই ভয় করে, মৃত্যুর দারুণ ভয়ঙ্কর নাম শ্রবণ করিয়া সকলেই কম্পিত হয়;—মৃত্যুর নাম মুখে আনিতে আতঙ্ক বোধ করে। মৃত্যু ইহ জগতে কাহার বাঞ্ছনীয় নহে।

সুখের বল, দুঃখের বল, জীবমাত্রেরই জীবনের সহিত ইহ জগতের সম্বন্ধ—যতদিন জীব এই নানা চিত্রের এই মায়াময়ী ধরণীমণ্ডলে বিচরণ করে, যতদিন ইহার সুখ দুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, ভয় ভরসা, মায়া মোহের খেলা তাহার মনোমধ্যে প্রভুতা করিতে থাকে, যতদিন সে ইহ সংসারের দাস, ততদিন সে ইহলোকে দশজনের একজন—সে দরিদ্র হইলেও ধনেশ্বর হইবার ভরসা রাখে;—মূর্খ হইলে ও বিদ্বান হইবার আশা করে; দুঃখী হইলেও সুখের মুখ দেখিবার প্রত্যাশায় থাকে, চিররোগী হইলেও সুস্থ হইবার

প্রতিজ্ঞা করে। সমস্ত দুঃখের হইলেও এই পৃথিবী তাহার সুখময়ী—সে কোন মতে ইহাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। আশা তাহার অবস্থায় সম্পূর্ণ বিরোধী হইলেও তাহার অতিশয় প্রিয়। যে স্থানে জন্মগ্রহণ করি, যেখানে আজন্ম প্রতিপালিত হইয়া, যৌবনে কিছুদিনের তরে, অর্থোপার্জ্জনের জন্য বিদেশে অবস্থিতি করি, তাহার মধ্যে সময়ে সময়ে সেই যত্নের, সেই ভালবাসার জন্মভূমিকে দেখিয়া মনের ব্যাকুলতা, ঔৎসুক্য সকলই মিটাইতে পারি। অল্প সময়ের জন্য বিদেশবাসী হইয়া মনে কতই না জানি কষ্ট বোধ করি;—চিরনির্ব্বাসিত ব্যক্তির জীবনে আশ্বস্ত হইলেও, জন্মভূমি হইতে বিদায় লইবার কালে কত মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা ভোগ করে! কেন?—সে জানে যে তাহার সকল সুখের স্থানে বঞ্চিত হইয়া সে চিরকালের জন্য চলিয়া যাইতেছে, আর তাহার প্রত্যাগমনের আশা নাই! ইহাতেই এত!—কিন্তু যখন সে জানিতে পারে যে তাহার চির পরিচিত, চির সুখের, প্রিয়তম কর্ম্মক্ষেত্র হইতে সে এককালে বিদায় লইতেছে, কোন মতেই আর ফিরিতে পারিবে না, তখন তাহার কতদূর হৃদ্বিদারক বেদনা জন্মে! একমাত্র জীবনের সহিতই ইহলোকের সমস্ত কার্য্য-কলাপ ফুরাইয়া যায়, আর পর লোকের নিশ্চয়তা দেখিতে পাওয়া যায় না;—কি হইবে, কোথায় যাইব, কি করিব কিছুই নাকি স্থির থাকে না, কাজেই ইহজগতে জীবন লইয়া যতদিন থাকি, ততদিনই ভাল; কেমন করিয়া বলিব—এই পৃথিবী আমরি বাঞ্ছিত নহে—এখানে যতদিন থাকিব, ততদিনই আমাতে আমিত্ব থাকিবে, তদন্যথায় আমি কে? আমার সকলই ফুরাইবে। এরূপ ভাবিয়া কে মরিতে সাধ করে? কে উপস্থিত পরিত্যাগ করিয়া ভবিষ্যতের, সুতরাং অনিশ্চিতের প্রত্যাশা করিতে চাহে? ইহলোকে দুর্লভ মানব জন্ম গ্রহণ করিয়া আমি যে অমূল্য জ্ঞানরত্নে বিভূষিত হইয়াছি;—যাহার বলে আমি অনন্য সাধারণ জীবের উপর একাধিপত্য বিস্তার করিয়া মনুষ্য নামের গৌরব রক্ষা করিতেছি;—কত অদৃষ্টচর, অভূতপূর্ব্ব বিষয়ের আবিষ্কার করিতেছি;—সকল মঙ্গলধাম বিশ্বশিল্পী বিশ্ববিধাতার সত্বা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার প্রতি প্রীতি, ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া মনুষ্য জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছি;—আমার পঞ্চত্বের

সঙ্গেসঙ্গেই আমার এ সকলের পরিসমাপ্তি হইবে। নিয়মিতকাল অতিবাহিত করিয়াই আমি ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করি, বা শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনে দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি গ্রস্ত হইয়া অকালেই ইহলোকলীলা সমাপ্ত করি, সে পৃথক কথা ;—কিন্তু আমি নরহত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইলে, আমার প্রাণদণ্ড হওয়া কতদূর যুক্তি সঙ্গত ? জীবমাত্রেরই জীবনের কতদূর আবশ্যকতা তাহা আর অধিক বলিব না। বলিলেই তুমি রাজা, দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করা তোমার রাজধর্ম্ম—তুমি সে কথা শুনিবে কেন ? আমি অপরাধী, আমার উপযুক্ত দণ্ডবিধান না করিলে তোমার রাজ্যরক্ষা কিরূপে হইবে ; আমাকে—আমার মত শত শত অপরাধীকে অব্যাহতি দিলে তোমার রাজ্য দিনে দিনে অগণ্য নরঘাতকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে ;—তোমার রাজ্যের শান্তি নষ্ট হইবে ;—তাহা তুমি কি রূপে করিতে পারিবে ? একের দণ্ডবিধানে অপরকে উপদেশ না দিলে সাধারণ প্রজা মধ্যে নরহত্যার ভয় কি রূপে জন্মিবে ? তবে কি আমার জীবন লইলেই আমার উপযুক্ত দণ্ডবিধান হইবে ? তুমি আস্তিক হও, তোমার মতে পরকাল থাকুক, ইহলোককৃত দুষ্কৃতির দণ্ডবিধান পরজন্মে হউক ;—বা তুমি নাস্তিক হও, তোমার মতে পরলোক না থাকুক, ইহ জন্মেই জীবের সদসৎ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ পুণ্যের ফলাফল মিটিয়া যাউক, যাহাই হউক অপরকে জীবন ভোগে বঞ্চিত করিবার তোমার অধিকার কি ? সত্য বটে আমি অর্থলোভ, প্রতিহিংসা সাধন, বা আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য একজনকে হত্যা করি—আমার জীবনে যে রূপ মমতা, যে রূপ সুখ, যে রূপ স্বচ্ছন্দতা, যে রূপ প্রয়োজনীয়তা আমি তাহাকে সেই সকল হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহার সাধের জীবনসুখ মিটাইয়া দি ;—তুমি বলিবে আমিও সেইরূপ সুখের জীবনে বঞ্চিত হইলে আমার উপযুক্ত দণ্ডবিধান হয় ;—সে আমা কর্ত্তৃক তাহার আত্মজীবন পরিত্যাগের কালে যে দুঃসহ যাতনা, যে দুর্ব্বিসহ মর্ম্মান্তিকতা ভোগ করে ; তুমি রাজা, তুমি শান্তি বিধাতা, তুমি দণ্ডদাতা, সুতরাং তুমি আমার জীবন লইয়া আমাকে সেইরূপ যন্ত্রণা প্রদান করিলে তোমার রাজধর্ম্ম প্রতিপালিত হয় ! হতব্যক্তির পরিবার, আত্মীয় স্বজনেরা তাহার বিরহে যে রূপ ব্যথিত হয়, তুমিও আমাকে বিনষ্ট করিয়া,

আমার প্রিয়তম পুত্রকন্যা, পরিবারবর্গকে কাঁদাইয়া, হত ব্যক্তির আত্মীয় বর্গের চিত্তের শোকবেগ লাঘব কর; ইহাতে তোমার কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদন করা হয়; এবং অপর পক্ষে এক সম্প্রদায়ের প্রতিহিংসা সাধনের সহায়তা করিয়া তাহাদিগের সন্তোষভাজন হওয়াও হয়। যদি বল তুমি সাধারণ প্রজার প্রতিনিধি মাত্র—তুমি যাহা কর তাহা সাধারণ প্রজা, বা সমাজের উপকারের জন্য—যাহাই হউক, কিন্তু এই যে সে দিন রুষ তুর্কির যুদ্ধে শত শত এমন কি, সহস্র সহস্র নরহত্যা হইল, তাহার দণ্ডবিধান কে করিল? তাহাতে কি সাধারণের মঙ্গল হইল? তাহাতে কি রাজ্যের শান্তির ব্যাঘাত হইল না? তাহাতে কি ন্যায়ান্যায় বিচার হইল না? তাহাতে কি রাজনিয়ম, রাজ ধর্ম্মরক্ষা করিবার কোন উপায় হইল না? কেহই কি তাহাতে নরহত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইবার উপযুক্ত হইল না? তাহাতে কি একটী অঙ্গনাও বৈধব্য জনিত দুঃখ পাইল না? একটী পুত্র কন্যাও কি পিতৃহীন হইল না? তাহাদিগের শত্রু বিনাশে প্রতিহিংসা সাধন দ্বারা তাহাদিগের চিত্ত তুষ্টির কি কোন উপায় হইল না? যদি বল তাহারা স্বদেশ রক্ষার জন্য, সাধারণের উপকারের জন্য, জীবন বিসর্জন দিয়াছে, তাহাদিগের জীবনে সাধারণের অনেক উপকার হইয়াছে, তাহাদিগের জন্য আর দুঃখ কি? একথা বলিলে স্বার্থপরতার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করা হয়! আমার ভীরু বাঙ্গালী স্বভাবের পরিচয় দেওয়া হয় মাত্র!! যাহারা প্রাণত্যাগ করিল, তাহারা কোথায়? তাহাদিগের জন্মভূমি কোথায়? আর তাহাদিগের সহিত সাধারণের সম্বন্ধই বা কোথায়? তাহারা কাহার জন্য প্রাণ হারাইল? তাহাদিগের জীবনের সহিত কেবল সামান্য অর্থেরই নিকট সম্বন্ধ দেখিতে পাই! যদি বল রাজকোষ হইতে তাহাদিগের পরিবারদিগের ভরণ পোষণের উপায় অবধারিত করিয়া দেওয়া হয়; কিন্তু আমি ধনাঢ্য, আমার রাশি রাশি ধন আছে, আমি হত ব্যক্তির জীবনের শতগুণ মূল্য দিলেও প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাই না কেন? রুষ আপনার রাজ্য বিস্তৃতি লোভেই হউক বা খৃষ্টান প্রজা বিনাশের প্রতি হিংসা সাধনের তরেই হউক অথবা আপনার অন্য কোন অভিপ্রায় সাধনের জন্য হউক তুর্কিস্থান আক্রমণ করিল, তাহাতে

রুষসৈন্য ভিন্ন অনেক বিদেশীয় এবং বিজাতীয় সৈন্যও বিনষ্ট হইল। তুর্কি-স্থান আক্রমণে রুসেরও যে অভিপ্রায়, অপর একজনের হত্যাপরাধে আমার ও সেই অভিপ্রায়। রুষের একজন প্রজা বা এখানকার আমি, আমরা বিজিত, আর রুষরাজ জেতা, এই প্রভেদ। এইখানেই দণ্ডবিধির পক্ষপাতী-তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। আবার দেখিতে পাই কেহ হত্যাপরাধে রাজ নিয়মে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত বা চিরজীবনের জন্য নির্ব্বাসিত হয়, আবার দুইদিন পরেই রাজানুগ্রহে তাহার প্রাণ ভিক্ষা বা নির্ব্বাসন মুক্তি দেওয়া হয়। তুমি রাজা, তোমাকে আমরা দেবতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করি, তোমার ইচ্ছাতেই সকল হইতে পারে, তাহা হউক;—ক্ষমার তুল্য মহৎ গুণ আর নাই! তবে একবারে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত হওয়াই ভাল;—একটা গতজীবনের জন্য আর একটার অস্তিত্ব লোপ করায় লাভ কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না;—জীবন বড় প্রয়োজনীয়;—জীবনস্বত্ত্বে মনুষ্যের নিকট সমাজ কত প্রকার উপকার প্রত্যাশা করে, আমি একটা নরহত্যা করিয়া সমাজের বা সেই মনুষ্য জীবনের যত অনিষ্ট করি, আমি জীবিত থাকিলে হয়ত সেইরূপ শত সহস্র মনুষ্য জীবনের রক্ষাকর্ত্তা হইতে পারি এবং সেই হত্যারূপ মহাপাপের অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া হয়ত সকলকে সেই অব্যক্ত যাতনাকাহিনী বলিয়া অনেকের মনে নরহত্যার ভয় জন্মাইতে পারি। আমি যখন হত্যাপরাধে লিপ্ত হই তখন অবশ্য আমি গুরুতর দোষী, আমার সমুচিত দণ্ডবিধান হওয়া নিতান্ত আবশ্যক;—প্রাণদণ্ডে ক্ষণিক যাতনা বই আর কিছুই নাই, দণ্ডাজ্ঞার পরে প্রাণদণ্ডের সময় পর্য্যন্ত সুস্থ শরীরে থাকিয়া মৃত্যু চিন্তাতেই যতদূর কষ্ট হউক—মরিতে বড় অধিক বিলম্ব বা অধিক যাতনা হয় না; কিন্তু তাহা অপেক্ষাও ত নিদারুণ যন্ত্রণাজনক অনেক শাস্তি আছে! হত্যাপরাধীকে চিরজীবনের জন্য সেইরূপ দণ্ড প্রদান করিলে ত তাহার প্রাণনাশজনিত নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করা হয় না! ইউরোপ খণ্ডে ব্যাষ্টাইলের কথা শুনা যায়; ব্যাষ্টাইল অতিবড় কষ্টকর স্থান, সেইরূপ এদেশেও কেন অন্ধকারাগার স্থানে স্থানে বিনির্ম্মিত হউক না? হত্যাপরাধী প্রাণদণ্ডোপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সেই স্থানে আবদ্ধ রাখিয়া সেই নিদারুণ কারা যন্ত্রণার উপর কেন কঠিনতম পরিশ্রমের উপায় বিধান

করা হউক না? তাহাদিগের শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যে কেন তাহাদিগের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ হউক না? তাহা হইলে ত হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড অপেক্ষা অধিক শাস্তি হয়—যদিই হত্যাপরাধীর দ্বারা আমার পূর্ব্ব প্রস্তাবিত সমাজোপকার প্রত্যাশা করিতে না চাও, কোন প্রকারে তাহাকে প্রাণদণ্ড ক্লেশ দেওয়াই অভিপ্রেত হয়, তাহাও ত সিদ্ধ হইতে পারে? যে জীবন নর-জন্মের অতীব লাঞ্ছনীয়, ইহ জগতের উদ্দেশ্য সাধনের একমাত্র উপায়, তাহা হইলে উহা ত দেহ হারায় না? "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" যে শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য তাহাও ত রক্ষা পায়? তবে কেন প্রাণদণ্ডের সৃষ্টি? উহার তিরোধানই কি সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ নয়? তোমার রাজ্যে, তোমার রাজ নিয়মে যখন আত্মহত্যার উদ্যোগ করাকে অপরাধ বলিয়া গণ্য কর; সে জন্য সমুচিত দণ্ডবিধান করিতেও ক্রটী কর না; তখন প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা কি তদ্রূপ উদার রাজনীতির তুলনীয়? আত্মহত্যোদ্যোগী ত আপনার মনের বিরাগে, মর্ম্মযাতনার উপসংহার জন্যই অভিপ্সীত কার্য্যের চেষ্টা করে, তাহাতে সে আবার মানব সমাজের বা রাজ্যশাসনের কোনরূপ প্রতিকূল ব্যবহার করে না, সে ত আপনার জীবন নষ্ট করিয়া আপনারাই অনিষ্ট করিতে প্রস্তুত হয়, তবে তাহার দণ্ড কেন? তাহার দণ্ডবিধানেরই বা উদ্দেশ্য কি? তুমি বলিবে তুমি রাজা অনর্থক প্রজানাশে রাজ্যের অমঙ্গল—যে উদ্দেশ্য আত্মহত্যা প্রয়াসীর শাস্তি হওয়া যুক্তি যুক্ত বলে, সে উদ্দেশ্য কি অপরকে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিবার অনুকূলে বলিবে? আত্মঘাতীর দণ্ড নাই—কিন্তু যে ব্যক্তি আপনাকে হত্যা করিবার উদ্যোগ করে, আর যে ব্যক্তি অপরকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করে, তাহাদিগের দণ্ডের ইতর বিশেষই বা কেন? যদি বল প্রথমোক্ত ব্যক্তি স্বার্থত্যাগী অপরাধী ও শেষোক্ত ব্যক্তি স্বার্থযুক্ত অপরাধী এজন্য ইতর বিশেষ! অপরাধের আবার স্বার্থ পরার্থ কি? একজন স্বদেশানুরাগী সাধারণের উপকারের জন্য আপন জীবন তুচ্ছ করিয়া রাজবিরুদ্ধে অস্ত্র পরিচালন করিতে উদ্যত হইল—সে ব্যক্তিও ত স্বার্থত্যাগী—তাহার অপরাধের বিচারের সময় কেন তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর নির্ব্বাসনের আদেশ হওয়া উচিত হয়? মনুষ্য জীবন স্বাভাবিক বা ঐশ্বরিক নিয়ম, যাহারই অনুসারী বল না কেন, যখন তাহার গূঢ় তথ্য,

মহৎ উদ্দেশ্য আছে, তখন যে তাহা নষ্ট করে বা নষ্ট করিবার সহায়তা করে তাহার তাহাতে পাপ আছে। যদি বল আমাকে ব্যাস্টাইলের মত কোন অন্ধকারাগারে রাখিয়া আমার জীবনের সকল সুখে বঞ্চিত করিয়া, আমার শ্রমলব্ধ দ্রব্যে আমাকে প্রতিপালন করায় আমার প্রাণদণ্ড অপেক্ষা নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করা হয়, তদ্রূপ অবস্থায় অবস্থাপিত করা ও আমার জীবন দণ্ড করা তুল্য বিবেচনা কর, তাহাও ভ্রমসঙ্কুল ;—জান কণ্ঠাগত প্রাণ পর্য্যন্ত আমার আশা আমার সহায়তা করিতে থাকিবে ; আশাতেই লোক জীবিত আছে ; এমন দুঃস্থ ও বিপন্ন লোক এই জগতে অনেক আছে, যে তাহাদিগের জীবন, তুমি আমি আমরা সকলেই নিষ্প্রয়োজনীয় বলিয়া জানি, কিন্তু সে আপনি একদিন, এক মূহুর্ত্তের জন্যও সেরূপ ভাবে না ; তাহার জীবন সুখ, জীবনের প্রয়োজনীয়তা সেই বুঝিতে পারে, তুমি আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেও সে দেখিতে পায় না ; তাহাকে তাহার জীবনের অনাবশ্যকতা বুঝাইয়া দিলেও সে বুঝে না। দেখ জীবনে লোকের কতদূর মমতা! জীবন রক্ষার জন্য লোকের কতদূর আগ্রহ! তবে কেন এতাধিক যত্নের সামগ্রীতে তুমি এক জনকে বঞ্চিত করিয়া নিমিত্তের ভাগী হও ?

আমরা কেন এত হীনবল ও অল্পায়ু ?

পাণ্ডববংশাবতংশ মহারাজাধিরাজ জন্মেজয় মহর্ষি বেদব্যাস-উক্ত ভবিষ্যৎ-বিষয় শ্রবণ সময়ে কলিযুগের মনুষ্যগণের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, চেষ্টা চরিত, আকৃতি পরমায়ুসীমা ও কিরূপে পুনর্ব্বার সত্যযুগের উৎপত্তি হইবে ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, ভগবান্ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ পরাশর-সুত যে হরিবংশপর্ব্বের ত্রিনবত্যধিক শততম অধ্যায়ে বলিয়াছেন, অধর্ম্মসঙ্কর হইয়া উঠিলে প্রজা সকল অধার্ম্মিক হইয়া উঠিবে ; সুতরাং ক্রমশঃ তাহাদিগের পরমায়ুর হ্রাস হইবে। আয়ুর হ্রাস হইলে বলক্ষয়, বলক্ষয়ে বিবর্ণতা, বিবর্ণতায় ব্যাধিপীড়া, ব্যাধিপীড়নে নির্ব্বেদ এবং নির্ব্বেদ হইতে আত্মতত্ত্ব

বোধ হইবে। তখন পুনরায় ধর্ম্মজ্ঞানের উদয় হইয়া সময়ে সত্যধর্ম্মের উদয় হইবে। একথা মিথ্যা নহে, ইহা অনুলঙ্ঘনীয় বেদবাক্য স্বরূপ। বর্ত্তমান বঙ্গবাসী আর্য্যসন্তানগণ (আমরা) এই বেদবাক্যের সম্পূর্ণ যথার্থতা প্রমাণ করিয়া দিতেছেন। আমরা আয়ুক্ষয়কর বহুতর পাপময় আপাতমধুর প্রলোভন পরতন্ত্র হইয়া অল্পায়ু হইয়া পড়িয়াছি; এবং ক্রমে ক্রমে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নানাবিধ নূতন নূতন অশ্রুতপূর্ব্ব দেশব্যাপী দুশ্চিকিৎস্য রোগে দুর্ব্বল ও নির্ব্বীর্য্য হইয়া, পরিতাপ ও শেষে তৎপ্রতিকার করিতে যত্নবান্ হইয়াছি। এখন যাহাতে আমরা দীর্ঘায়ু, বীর্য্যবান ও নিরোগী হইয়া হংস-পুচ্ছ লইয়া সুখস্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করিতে পারি, তদ্বিষয়ে দুই একজন স্বদেশহিতৈষী তাঁহাদিগের গভীর মস্তিষ্ক সঞ্চালন ও অমূল্য সময় বিনিয়োজিত করিতে যত্নবান হইয়াছেন। ঈশ্বর করুণ, তাঁহাদিগের যত্ন ও পরিশ্রম যেন সফল হয়।

কিন্তু কথা এই, বঙ্গভূমি যেরূপ বিভিন্ন জাতীয় বহু জনের আবাসস্থল, তাহাতে তাঁহাদিগের দুই এক জনের এই সাধু উদ্যম ও চেষ্টা শীঘ্র যে ফলবতী হইবে, এ আশা একরূপ দুরাশা মাত্র! তবে যদি বর্ত্তমান সময়ের বিখ্যাত-বিখ্যাত সাপ্তাহিক, সাময়িক পত্র সম্পাদকেরা ও গ্রন্থকারগণ এককালে চতুর্দ্দিক হইতে সমস্বরে সকলকে বার বার এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতে ও কি কি অবশ্য প্রতিপাল্য নিয়ম উল্লঙ্ঘন করায় আমরা এই দারুণ শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছি, পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তৎসমুদয়ের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া দিতে এবং সকলকে সেই নিয়মানুসারে কার্য্য করাইতে সক্ষম হন, তবেই দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারা যায়, যে কালে আবার একদিন আমাদের হীনবল ও অল্পায়ু সন্তানগণ "দুর্ব্বল বাঙ্গালি" এই নাম দূরে নিক্ষেপ করিয়া সেই পূর্ব্বতন জগদারাধ্য দীর্ঘায়ু আর্য্যগণের প্রকৃত সন্তান বলিয়া জগতে পরিচয় দিতে সক্ষম হইবে। এ বিষয়ে যে সকলের মনোযোগী হওয়া সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য, একথা বলা বাহুল্য মাত্র। কেননা "ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষাণাংপ্রাণাঃ সংস্থিতিহেতবঃ" ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষের সংস্থিতি মূল প্রাণ। সেই প্রাণ রক্ষা হইলেই সকলই রক্ষা হয়। প্রাণ বিয়োগ হইলে বা দেহ ব্যাধি-মন্দির হইয়া দুর্ব্বলও কর্ম্মাক্ষম

হইলে কে পদ্মযোনির প্রিয়বাহন হংস দেবকে আরাধনা করিয়া অর্থ উপার্জ্জন পূর্ব্বক পরিবার প্রতিপালন করিবে? চক্ষু মুদ্রিত করিলে কাকস্য পরিবেদনা! সকলই যে অন্ধকার!!

এক্ষণে যে সকল কারণে আমরা এত হীনবল ও অল্পায়ু হইয়া পড়িয়াছি তৎসমুদয়ের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য হইতেছে। এ বিষয়ের সূক্ষ্ম মীমাংসা করা বড় সহজ বিষয় নহে; অনেকে অনেকরূপ কারণের উল্লেখ করিয়া থাকেন। কেহ বলেন, পরাধীনতাই আমাদের হীনবীর্য্য ও অল্পায়ু হইবার কারণ; আবার অন্যে বলেন বঙ্গদেশ শস্যশালিনী বলিয়া আমাদের এত দুরবস্থা। অন্যে আবার বাল্যবিবাহাদিকে কারণরূপে বিবেচনা করিয়া থাকেন। এইরূপ নানামুনির নানা মত।

পরাধীনতা যে দুর্ব্বল ও অল্পায়ু হইবার অন্যতর কারণ, একথা মিথ্যা নহে। কারণ স্বাধীন অবস্থাতে মনে যেরূপ উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তি থাকে, পরাধীন জীবনে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। দরিদ্র ব্যক্তি যেমন তাহার হৃদয়োত্থিত মনোভাবকে অনেক সময়ে হৃদয়েই বিলীন করিতে বাধ্য হয়, অধীনব্যক্তিকে প্রভুর আদেশ পালন করিতে গিয়া সেইরূপ অনেক সময়ে মনোভাব দমন করিতে হয়। কাযে কাযেই মন উন্নত না হইয়া বরং দিন দিন নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ হইয়া যায়। মন উৎসাহ হীন হইলে শরীরও তৎসঙ্গে অকর্ম্মণ্য ও দুর্ব্বল হইতে থাকে। শরীরের সহিত মনের যে অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। শরীর দুর্ব্বল হইলে তখন স্বাভাবিক নিয়মানুসারে চতুর্দ্দিক হইতে প্রবল শত্রুরা আসিয়া দুর্ব্বল দেহের উপর আধিপত্য প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করে। দেহ তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া অল্পদিনের মধ্যেই পৃথিবীর নিকট হইতে বিদায় প্রার্থনা করিতে বাধ্য হয়।

"বঙ্গদেশ শস্যশালিনী বলিয়া বাঙ্গালির এরূপ দুরবস্থা" যাঁহারা একথা বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের একথাও একদিন বিশ্বাস যোগ্য ও আদরনীয়। যে দেশে অতি অল্প পরিশ্রমে খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয়, সে দেশবাসিগণ যে অনুর্ব্বর দেশের অধিবাসীগণ হইতে অধিক আলস্য পরতন্ত্র ও বিলাসী হইয়া থাকে, ইহা একরূপ স্বাভাবিক নিয়ম বলিলেও হয়। কেন না যে

দেশ অনুর্ব্বর, সেখানে অধিক পরিশ্রম না করিলে খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে না। সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশের লোকেরা বহু পরিশ্রম করে বলিয়া তাহারা বলিষ্ঠ হয়। বাঙ্গালায় সেরূপ পরিশ্রম করিতে হয় না। তাই বাঙ্গালিরা অধিক আলস্য পরতন্ত্র। বাঙ্গালার কৃষকেরা যেমন হউক পরিশ্রম করে, কিন্তু বাঙ্গালার সম্ভ্রান্তবংশীয় বাবুরা পরিশ্রমকে ঘৃণার্হ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।

যেমন কোন দ্রব্য ব্যবহার না করিলে তাহা শ্যামিকাগ্রস্থ হইয়া ক্রমে ক্রমে জীর্ণ হইয়া থাকে; দেহস্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকেও সেইরূপ প্রত্যহ সঞ্চালন না করিলে তৎসমুদয় ক্রমে ক্রমে শিথিল হইয়া যায়। শিথিল হইয়া যাইলে, তত কার্য্য করিবার শক্তি থাকে না। অগত্যা শারীরিক বৃত্তিগুলি দুর্ব্বল হইয়া যায়।

এইরূপ বাল্যবিবাহাদিও এক একটী কারণ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা বলি শুদ্ধ এই গুলিই নয়, যেমন নানাবিধ স্বতন্ত্র পদার্থের সংযোগে এক একটী অভিনব পদার্থ উৎপন্ন হইয়া অভিনব গুণ ধারণ করে; তেমনি যে কারণে আমরা হীনবল ও অল্পায়ু হইতেছি, পরাধীনতা, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি তাহার এক একটী অঙ্গ। তদ্ভিন্ন আরও বহুতর কারণ আছে। আমরা সেই গুলিকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, সাধ্যানুসারে তাহার প্রত্যেকের স্থূল স্থূল বৃত্তান্ত নিম্নে নির্দ্দেশ করিতেছি।

১ম জলবায়ুর পরিবর্ত্তন।

জল বায়ুর সহিত স্বাস্থ্যের অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। যে দেশের জল বায়ু যত উত্তম বা অধম, সে দেশের অধিবাসীগণের স্বাস্থ্যও তত উত্তম বা অধম। পূর্ব্বে আমাদিগের দেশের জল বায়ু উত্তম ছিল, এক্ষণে জল বায়ুর পরিবর্ত্তন হওয়াতে ম্যালেরিয়া, বিসূচিকাদি নানা রোগ আসিয়া আমাদিগকে শীঘ্র শীঘ্র যমালয়ে পাঠাইয়া দিতেছে। মৃত রাজা দিগম্বর মিত্র বলিয়াছেন, রেলওয়ে ও বড় বড় রাস্তা হওয়াতে অথচ জল নির্গমের রীতিমত পয়ঃপ্রণালী না থাকায় অস্মদ্দেশের জলবায়ু অনেক স্থানে দূষিত হইয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে নদী সকল জলবাহী হইয়া অব্যাহত প্রভাবে সাগরে বা অন্য কোন

বৃহৎ জলাশয়ে গিয়া পতিত হইত। এ কারণ জলবায়ু দূষিত হইতে পারিত না। এক্ষণে চারিদিকেই প্রায় রাস্তা হওয়ায় জলস্রোতের গতি অনেকাংশে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। নদী সকল ক্রমশঃই মৃত্তিকা দ্বারা পুরিয়া উঠিতেছে; যেখানকার ময়লা সেই খানেই থাকিয়া জলকে দূষিত করিয়া তুলিতেছে। ম্যালেরিয়া বিসূচিকা এই দূষিত জল পানের ফল। ম্যালেরিয়াদি সংক্রামক পীড়া। কয়েক বৎসরের মধ্যে এই সংক্রামক পীড়াক্রান্ত হইয়া যে বাঙ্গালার কত গ্রাম অধিবাসী শূন্য হইয়া গিয়াছে, কত ব্যক্তি যে অস্থিকঙ্কাল বিশিষ্ট হইয়া জীবন্মৃতবৎ হইয়া আছেন তাহার সংখ্যা নাই। তাই বলি, জলবায়ুর উৎকর্ষ সাধন করা এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য হইয়াছে। গত বৎসর হইতে বঙ্গেশ্বর সার আসলি ইডেন্ যাহাতে পয়ঃপ্রণালী পরিষ্কৃত হয়; তজ্জন্য তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণকে বিশেষ মনোযোগী হইতে অনুমতি দিয়াছেন সত্য, কিন্তু আমাদিগের অদৃষ্ট যে সেরূপ সুপ্রসন্ন নহে। সে অনুমতি বুঝি কোন কার্য্যেরই হইল না! কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীই ত এ পর্য্যন্ত সে বিষয়ে মনোযোগী হইলেন না! হইবেন কিনা তাহাও বলা যায় না।

ক্রমশঃ

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

Bengal Miscellany—বেঙ্গল মিসলেনীর তৃতীয় সংখ্যা সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়া নিরতিশয় দুঃখিত হইলাম। উক্ত পত্রখানির উন্নতি না দেখিয়া বরং অবনতি দেখিতেছি। সম্পাদক মহাশয়ের অমনযোগিতাই এই অবনতির এক মাত্র কারণ। তিনি কি প্রবন্ধ না পড়িয়াই মুদ্রাঙ্কণ করিতে দেন? "প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ" পাঠ করিতে প্রকৃতই প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হইয়াছে। এরূপ ভ্রম সঙ্কুল প্রবন্ধ আমরা কখন পাঠ করি নাই। স্বর উচ্চৈস্বরে কি করিয়া চীৎকার করে? আর বুক পকেটে মুখ মুছিয়া রুমাল রাখা কি রূপ

তাহাত বুঝিলাম না! বেঙ্গল মিস্‌লেনীর মূল্য নিতান্ত কম নয়, সে স্থলে ছাপা খারাপ হওয়া দুঃখের বিষয়। ১৮ লাইনে পৃষ্ঠা পূর্ণ করিলে চলিবে কেন? এটি সম্ভবতঃ ছাপাখানার দোষ। কিন্তু কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় যে কেন ছাপা দেখিয়া লয়েন না বলিতে পারি না। আমরা নাকি বেঙ্গল মিস্‌লেনীর উন্নতি কামনা করি তাই এত কথা বলিলাম, নতুবা বলিতাম না। আশা করি মিস্‌লেনীর শুভাকাঙ্ক্ষীগণ আমাদের উপর বিরক্ত হইবেন না। এবং আমরা আরও আশা করি যে ভবিষ্যতে বেঙ্গল মিস্‌লেনীর অবনতি না দেখিয়া ক্রমশঃ উন্নতি দেখিয়া সুখী হইব।

সদানন্দ। বিদ্রূপ পূর্ণ মাসিক পত্র ও সমালোচন।

আমরা সদানন্দর ক্রমশঃ উন্নতি দেখিয়া আন্তরিক সুখী হইয়াছি। সদানন্দ যেন মাসান্তর নিয়মিত রূপে আমাদিগকে আনন্দিত করিতে থাকেন।

প্রণয়-পারিজাত বা মন্মথ মনোরমা। উষাহরণ প্রণেতা প্রণীত। ও শ্রীরামতারণ সান্ন্যাল কর্ত্তৃক সুরলয়ে গঠিত। ইণ্ডিয়ান ট্রেড্‌স্ এসোসিএসন্ প্রেস, কলিকাতা।

প্রণয়-পারিজাত সমালোচন করিবার পূর্ব্বে উষাহরণের সমালোচনা করা উচিত ছিল, তাহা হইলে হয়ত পাঠকগণ প্রণেতার পরিচয় পাইতেন, কিন্তু কার্য্য গতিকে তাহা হইয়া উঠিল না। প্রণয় পারিজাত সেক্‌সপীয়ার কৃত টেমপেষ্ট (Tempest) অবলম্বন করিয়া বিরচিত হইয়াছে, সচরাচর অনুকরণ যেরূপ হয়, ইহা তাহা অপেক্ষা কিছু ভাল হইয়াছে। গানগুলি মন্দ হয় নাই। আমরা নিম্নে একটী গীত উদ্ধৃত করিলাম।

সাহানা—খেম্‌টা

মনমথ মনোরমা মরি মরি মিলিল!
মিথুন মিলনে মন মহামোদে মাতিল!
মনোরমা মনোমথ, মিলিয়াছে মনোমত;
মধুমাখা মধুর মিলনে মন মজিল!
মানস মোহন মিলনেতে মনমোহিল।

ভালবাসা।

এই সসাগরা পৃথিবী মধ্যে মনুষ্যের জ্ঞান, বুদ্ধি, চিন্তা, আশা ও বাসনায় ভালবাসা অপেক্ষা মানস পরিতৃপ্তিকর বাক্য নাই। মনুষ্যের ভাষাতে ভালবাসা তুল্য শ্রুতি মধুর বাক্য এ পর্য্যন্ত সৃষ্ট হয় নাই। ইহ জগতে মানব মাত্রেই ভালবাসার দাস, ভালবাসার আকাঙ্ক্ষী এবং ভালবাসার তপস্বী। তুমি আমায় ভালবাস এ বিশ্বাসটী আমার হৃদয়ে জন্মিলে যে আনন্দ, সে আনন্দ আর কিছুতে হয় না। বুঝি ভালবাসায় যে সুখ সে সুখ আর কুত্রাপি নাই।

দেখিতে গেলে এক ভালবাসার দোহাই দিয়াই এই বিশ্ব সংসার পরিচালিত হইতেছে। এই দগ্ধময় সংসার মরুতে যদ্যপি ভালবাসারূপ অমৃতময়ী নির্ঝরিণী নিরন্তর প্রবাহিতা না হইত, তাহা হইলে একটী মনুষ্যের হৃদয়েও সুখ থাকিত না, একটী মানবকেও হাসিতে দেখিতে পাওয়া যাইত না।

অধিকাংশ মানবই গৃহী বা সংসারী, কিন্তু সেই সংসার, কে পরিচালিত করিতেছে? ভালবাসা। অতএব সেই ভালবাসাই সংসারের একমাত্র ভিত্তি, সংসারের একমাত্র পরিচালক। সংসারে তুমি আমায় ভালবাস আমিও তোমায় ভালবাসি। এই ভালবাসার দান ও প্রতিদান লইয়া সংসার অতিবাহিত হইতেছে। পিতা পুত্রকে ভালবাসে, পুত্র পিতাকে পূজা করে; স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসে, স্ত্রী স্বামীর মানস পরিতুষ্ট করে—দাসীর ন্যায়, সহচরীর ন্যায় সেবা করে। সুতরাং ভালবাসার আদান প্রদানই সংসারের সুখ। কিন্তু আমি তোমায় আমার ভালবাসা দান করিলাম, তুমি যদি তোমার ভালবাসা আমায় প্রতিদান না কর, তাহা হইলে তোমায় ভালবাসিয়া আমার হৃদয়ে বিন্দু মাত্র সুখ হইবে না। সংসারে ভালবাসা দান বা বিক্রয়ের পরিবর্ত্তে প্রতিগ্রহণ চাই, নতুবা ভালবাসায় সুখ নাই। পুত্র যদ্যপি পিতাকে ভক্তি না করে, তাহা

হইলে পিতা পুত্রকে ভাল বাসিয়া সুখী নহেন, বরং এমনও ঘটে যে পিতা পুত্রকে ত্যাগ ও করেন। স্ত্রী যদ্যপি স্বামীর মনোরঞ্জন করিতে না পারে তাহা হইলে দাম্পত্যপ্রণয় হয় না—বরং স্বামী অপর স্ত্রী লালসা করে। সুতরাং ভালবাসার বিনিময়ে ভালবাসা চাই, তদ্ব্যতীত ভাল বাসিয়া সুখ নাই। আমি তোমায় ভালবাসি তুমিও আমায় ভালবাস; তবেই ভালবাসা। নতুবা তুমি আমার নিদ্রার স্বপ্ন কিন্তু আমি তোমার চক্ষুঃশূল, সে ভালবাসায় কি সুখ? কেহ হয় ত বলিবেন "ভাল বাসার আদান প্রদান আবার কিরূপ? ভালবাসা মানসিক বৃত্তি, তাহা স্বেচ্ছাধীন নহে। উহা মনে উদয় মাত্রই স্থান লাভ করিবে, পাত্রী পাত্র লাভালাভ বিবেচনা করিবে না। তুমি যদ্যপি ভালবাসিতে না জান তবে ভাল বাসিবার বাসনা কেন? যদ্যপি ভালবাসার প্রতিদান ব্যতীত ভাল বাসিয়া তোমার সুখ নাই তবে ভালবাস কেন? যদি স্বার্থশূন্য হইয়া বনলতার ন্যায় মহীরুহগালে নিরন্তর দুলিতে না পার, তবে ভালবাস কেন? যদি বন ফুলের ন্যায় আপন মনে আপনি ফুটিয়া হাসিয়া হাসিয়া অনন্তে মিলিত হইতে না পারিলে, তবে ভালবাসিতে সাধ কেন? যদি আপন মনে অক্ষুণ্ণ হৃদয়ে সতেজে "ভালবাসা পাব বলে তারে ভাল নাহি বাসি।" গাহিতে না পারিবে, তবে ভালবাস কেন?" প্রিয় পাঠক! আমি তোমার এ কথায় সরল প্রাণে সহানুভূতি প্রকাশ করি। কিন্তু একটী কথা এই সংসারে সে হৃদয় কয় জনের? আয়েষার ন্যায় রমণী কটি আছে? তুমি পৃথিবী তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেও আর একটি শকুন্তলা দেখিতে পাইবে না, কিন্তু দুষ্মন্ত অনেক, জগৎসিংহ অনেক দেখিবে। অনুসন্ধান করিলে দুই চারিটি জুলিয়েট মিলে, কিন্তু মিরান্দার সাক্ষাৎ কোথায় পাইবে? ওথেলো ঘরে ঘরে পাইতে পার, কিন্তু দেসদিমোনা কোথায়?

"শুদ্ধান্ত দুর্লভমিদংবপু রাশ্রমবাসিনো যদি জনস্য।
দূরীকৃতাঃ খলুগুণৈরুদ্যানলতা বন লতাভিঃ॥"

এ কথা যাহার তাহার মুখে শুনিতে পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু

" ———By my modesty,
The jewel in my dower—I would not wish
Any Companion in the world but you;
Nor can imagination form a shape
Besides yourself to like of."

একথা যেখানে সেখানে শুনিতে পাইবে না। একথা অন্তরের সহিত বলে এমন লোক সংসারে অনেক অনুসন্ধানেও পাওয়া যায় না। তাই বলি ভালবাসার বিনিময়ে ভালবাসা চাই, এটি সাধারণ ভালবাসার অপরিহার্য্য নিয়ম।

প্রণয় স্বার্থ শূন্য হইতে পারে, কিন্তু প্রেমিক স্বার্থ শূন্য নহে। যদি ভালবাসায় স্বার্থ না থাকে তবে তুমি ভালবাস কেন? যদি ভালবাসায় স্বার্থ না থাকে তবে তুমি তোমার প্রণয়িনীকেই ভালবাস কেন? সকলকে সেইরূপ ভালবাসনা কেন? এক জনকে ভালবাসিয়া তোমার বড় সুখ, কেন অপরকে ভালবাসিয়া তোমার সে সুখ হয় না? অতএব ভালবাসা স্বার্থ শূন্য নহে। তুমি তাহাকে ভালবাসিয়া সুখ পাও সুতরাং তাহাকে ভালবাস, তাহা হইলেই তাহাতে স্বার্থ আছে। আয়েষা জগৎ সিংহের প্রণয়লাভ করিতে পারে নাই তথাপি তাহাকে ভালবাসিত, কেন না তাহাকে ভালবাসিয়া সে সুখী হইত। সুতরাং সেই সুখটুকুই আয়েষার স্বার্থ।

কে বলে ভালবাসা অন্ধ? যদি ভালবাসা অন্ধ তবে দর্শক কে? আমরা বলি প্রেমিক অন্ধ। অর্থাৎ যে চক্ষু মেলিয়া প্রেম না করিল তাহার প্রণয় পরিস্ফুট হইল না, কারণ তাহার ভালবাসার বিনিময় হইল না, সুতরাং সে অন্ধের ন্যায় কাজ করিল। কিন্তু ভালবাসা অন্ধ নয়, সে আপন কার্য্য বিস্মৃত হয় না—সে ভ্রমেও ফাঁদে পা দেয় না। সে একবার উঁকি মারিয়া দেখিল যে এখানে বিনিময় নাই, সে অঙ্গ সংকোচন আরম্ভ করিল। প্রেমিকের প্রাণ হাড়ে হাড়ে দগ্ধ হইতে লাগিল, অনুশোচনা হৃদয় ভস্ম করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার ভালবাসার কি? তুমি বলিবে যাহাতে এত স্বার্থ তাহাতে আবার সুখ কি? তাহা আবার পবিত্র

কোথায়? স্বার্থ শূন্য না হইতে পারিলে কি ভালবাসা হয়? কিন্তু আমরা একথা স্বীকার করিতে পারি না। স্বার্থ ব্যতীত কোন কার্য্যই নাই, শাধনা ব্যতীত সিদ্ধিও নাই। দেখ যে যেখানে যাহাকে ভাল বাসিয়াছে তাহাতেই তাহার স্বার্থ আছে, সে স্বার্থ কি? ভালবাসার বিনিময়। কিন্তু সে বিনিময় যে সকলে পায় তাহা নহে, যে পায় সে দেবতা, সেই সংসারে সুখী। যে না পায় তাহার ন্যায় দুঃখী এ সংসারে কে আছে? যদি তাহাই হয় তবে তাহাতে সুখ কোথায়? তুমি বলিবে যে তুমি আমায় ভালবাস আর না বাস আমি তোমায় ভালবাসিব, তোমায় দেখিয়া সুখী হইব। বাস্তবিক কি ইহা সম্ভব? কথনই নহে। দেখ আয়েষা এই গর্ব্বিত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, অতএব আমরা কি বলিব যে আয়েষা বড় সুখিনী ছিল, কখনই না। আয়েষা বড় মন্দভাগিনী। তবে একথা অবশ্য বলিতে হইবে যে আয়েষার হৃদয় অকলুষণীয়, পবিত্র, স্বর্গতুল্য। আয়েষা জগৎ সিংহের প্রণয়লাভে অসমর্থা হইয়াও, তাহাকে ভালবাসিত, কিন্তু সুখিনী হয় নাই। যদি তাহাই হইবে তাহা হইলে এত দীর্ঘনিশ্বাস কেন? অঙ্গুরীয় নিক্ষেপ কেন? সংসারে এমন হৃদয় অনেক থাকিতে পারে যাহারা একবার প্রাণ সমর্পণ করিয়া আর তাহা প্রতি গ্রহণ করিতে পারে না, যে হৃদয়ে একবার এক মূর্ত্তি গঠন করিয়া প্রীতি পুষ্প দিয়া পূজা করে, সে হৃদয়ে আর অন্য কোন মূর্ত্তির আরাধনা করিতে অভিলাষী হয় না। আমরা সেরূপ হৃদয় সম্পন্না রমণীকে দুর হইতে প্রণাম করি, ভক্তি করি, কিন্তু তাহাকে কি সুখিনী বলিতে পারি? যদি তাহাই না হইল তবে সে সংসারের ভালবাসা নহে। যে ভালবাসা লইয়া সংসারে সুখ পাইতে পারি, তাহা সে ভালবাসা নহে।

সংসারে অনেক প্রেমের জহরীও আছে, অনেক ভিখারীও আছে, এবং অনেক প্রেম ফলারে ভট্টাচার্য্যও আছে। অনেক রমণী প্রথম দর্শনে আত্ম সমর্পণ করেন, কেহ বা চিত্র দর্শনে আত্ম সমর্পণ করেন। প্রিয় পাঠক! সে সকল রমণীকে তোমরা কি বল? আমরা বলি ভিখারী। ভিখারী যেমন বস্তুর দোষ গুণ বিচার করে না, যাহা পায় তাহাই আদরে গ্রহণ করে, এবং যত্নে রক্ষা করে ইহারাও তদ্রূপ। সুখ উভয়ের কপালেই

নাই। আমরা এরূপ প্রেম দেখিয়া সুখী হই না, তবে তাহাদের আকাঙ্ক্ষা ও পরিতৃপ্তিকে ধন্যবাদ দি।

এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে সংসারে যদ্যপি কোন সুখ থাকে তাহা ভালবাসায় আছে। কিন্তু ভালবাসায় যদ্যপি কোন সুখ থাকে তাহা ভালবাসার প্রতিদানে আছে। নতুবা ভালবাসায় সুখ নাই। ভালবাসার সুখ অনন্ত ও অসীম, তাঁহা মিটে না, তাহার পরিতৃপ্তি হয় না, যদি উভয়ে উভয়কে প্রাণে প্রাণে, মনে মনে, মর্ম্মে মর্ম্মে ভালবাসিতে পারে, তবেই ভালবাসার সুখ, নতুবা ভালবাসায় সুখ নাই, তাহা ভয়ানক হৃদয় দগ্ধকারী, ভয়ানক আতঙ্কজনক। তাহার প্রদাহন বড় ভয়ানক, তাহা স্তরে স্তরে হৃদয় দগ্ধ করে, প্রাণ পুড়াইয়া মারে, মন অবস ও সুখহীন করে। তাহার পূর্ণাঙ্গ নাই, তাহার ইহ জনমে পরিতৃপ্তিও নাই। যাহার প্রেমের পথে এরূপ কাঁটা পড়িয়াছে সেই জানে এ প্রণয়ে কত সুখ! সেই জানে স্বার্থ শূন্য মনে "ভালবাসা পাব বলে তারে ভাল নাহি বাসি" কত সুখ কর!!

গঙ্গা-যমুনা।

১

ওই দেখ ভাগিরথী দক্ষিণ বাহিনী
বসিয়া যমুনা পাশে চলেছে রঙ্গিনী
নেচে নেচে চলে যায় আনন্দে ভাসায়ে কায়
অনন্ত উদ্দেশে ওই সুকল-নাদিনী
বিষ্ণুপদ হ'তে, নর কলুষনাশিনী।

২

কোথায় যমুনা ছিল কোথায় আসিল
কোথা হ'তে ভাগিরথী তারে দেখা দিল,

সেই দেখা সেই আসা, সেই চির সুখ আশা
অনন্ত প্রণয় ডোরে উভয়ে বাঁধিল
নাচিতে নাচিতে উভে অনন্তে ভাসিল।

৩

সুনীল আকাশ দেখ চাঁদ বুকে ধরি,
তারকার মালা পরি হাসিতেছে মরি ;
তটিনী সৈকত গায় মরি কিবা শোভা পায়
সুন্দর বালুকা রাশি ; হাসি মুখে করি—
দেয় তারা করতালি তরঙ্গেরে ধরি।

৪

সে শোভা দেখিয়া, চারু আকাশের গায়,
সুন্দর তারকা গুলি হেসে হেসে চায়,
সেই যমুনার তীরে সেই জাহ্নবীর নীরে
সেই শোভা সেই হাসি ধীরে ভেসে যায়
আনন্দে প্রকৃতি মন মানস মাতায়।

৫

যাক্ শোভা যাক্ হাসি চাহিনারে আর,
কাঁদিয়া উঠিল কেন পরাণ আমার ?
এই যে হাসিতে ছিল, কে তারে কাঁদায়ে দিল,
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত কেনরে আবার
হইল সহসা হৃদি কাঁদাতে আমার ?

৬

প্রেয়সী আনন্দময়ী প্রেমের আধার,
জীবনের সহচরী প্রীতি পারাবার,
কহলো অমৃত ভাষে কহ দেখি মৃদু হেসে
কি দুঃখে সহসা প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল
সে ভাবে এ ভাব কেন আসিয়া জুটিল ?

৭

বুঝেছ কি প্রিয়তমে? বুঝিবে কেমনে,
বুঝিবার নয় তাহা জানি মনে মনে,
যে প্রেম হৃদয়ে জাগে মনমত অনুরাগে
ভাব তুমি সেই প্রেম অনন্ত অক্ষয়,
তাই প্রিয়ে আজি হেন কাঁদিল হৃদয়।

৮

ক্ষুদ্র প্রাণী নর, যার ক্ষুদ্রই আশ্রয়
ক্ষুদ্র দেহে ক্ষুদ্র হৃদি যাহার নিশ্চয়;
কেমন করিয়া তবে সে ভাল বাসিবে ভবে
যেই ভালবাসা হবে অনন্ত অক্ষয়,
সে আশার পরিতোষ নাহিক নিশ্চয়।

৯

ওই ভাগিরথী ওই যমুনার মত
করিতে প্রণয় হায় শিখিবে কি চিত?
দুই প্রাণ এক হ'য়ে দুজনেতে যাব ব'য়ে
অনন্ত উদ্দেশে সেই ভালবাসা লয়ে,
বল ইন্দুনিভাননে অমৃত-আলয়ে?

১০

সেই প্রেম প্রিয়ে যদি করিবারে পার,
এস তবে উভয়েতে যুড়াই অন্তর,
ওই যমুনার মত ওই জাহ্নবীর মত
এক প্রবাহনে উভে হই প্রবাহন,
নতুবা বিফল আশা প্রেম আকিঞ্চন।

সুধারাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—000—

সেইদিন ধরণীধরের বাটীতে থাকিয়া পরদিন প্রাতেই আপন ব্রাহ্মণীর নিকট বিদায় লইয়া সুধারাম তথা হইতে যাত্রা করিলেন; তখন বসন্তর ঘুম ভাঙ্গেনাই বসন্তকে জাগাইলে পাছে সে কাঁদে, যাইতে না দেয় সেজন্য তিনি তাহাকে জাগাইলেন না। কিন্তু বসন্ত সেরূপ ছেলে নয়। বাপ মায়ের দুঃখ বুঝিত। সুধারাম স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করিয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিলেন জীবিকা নির্ব্বাহের কোন উপায় দেখিলেন না। চাকরী মিলা দূরে যাউক, তাঁহার উদরান্নের জন্য তাঁহাকে মুষ্টি ভিক্ষা পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছিল। একদিন রাণীগঞ্জের নিকট একটী গ্রামে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন, দেখিলেন একজন বাবু সামান্য শ্রমজীবি লোকের অন্বেষণ করিতেছেন, ৮।১০ টাকা বেতন দিবেন, স্বীকার করিতেছেন, অনেকেই তাঁহার নিকট উমেদার, সুধারাম এমন সুবিধা আর কোথায় পাইবেন, ছাড়িলেন না। দারিদ্রদুঃখযন্ত্রণায় মনুষ্যের বুদ্ধি শুদ্ধি লুপ্ত হয়; বৃদ্ধ বয়স;—অনাহার ক্লিষ্ট দেহ;—ইহাতেও শ্রামিকের কর্ম্ম তিনি সাগ্রহে গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বকার মান, স্বপদ, গৌরব, শ্রেষ্ঠবর্ণত্ব সকলই ভুলিয়া গেলেন। বাবুটী সুধারামের নাম লিখিয়া লইয়া বলিলেন দুইদিন পরে, সেই গ্রামে সেইস্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি রাণীগঞ্জের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট লইয়া যাইবেন; কিন্তু কেন যে সামান্য শ্রমজীবিকে মাজিষ্ট্রেটের কাছে যাইতে হইবে, সেখানে গিয়া কি করিতে হইবে, সুধারাম তাহার কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন না। নির্দ্দিষ্ট দিনে সুধারাম, আরও প্রায় তিন চারি শত লোক সমভিব্যবহারে পূর্ব্বদিনের বাবু রাণীগঞ্জে গিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট তাহাদিগের মন্তব্য লিখা-

ইয়া লইলেন। মাজিষ্ট্রেট একবার মাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাদিগকে কোথা যাইতে হইবে, কি করিতে হইবে, কতদিন থাকিতে হইবে জান?" সকলেই "হাঁ" দিয়া সারিল;—তাহাদিগের মধ্যে সকলেই নিরক্ষর ব্যক্তি; কিন্তু সুধারাম লেখাপড়া জানিতেন, তিনিও "হাঁ" দিতে অগ্র পশ্চাৎ ভাবিলেন না। তাহার পর বাবু আর তাহাদিগকে সেখানে রাখিলেন না, পরদিবসই রেলওয়ে ট্রেণে কলিকাতায় আনিয়া খিদিরপুরে রাখিলেম। তাহার পর বাবুটী অপর একটী বাবুর হস্তে সুধারাম ও তাঁহার সমান্যাদৃষ্ট-বান্ সহচরদিগকে সমর্পণ করিলেন, দ্বিতীয় বাবুটী ষ্টীমার যোগে পরদিন আসাম যাত্রা করিলেন। সুধারাম বাটী ছাড়িয়া যা দুই একবার কারবারোপ-লক্ষে ঘাটাল, আর গঙ্গা স্নান উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তদ্ব্যতীত তিনি কখন বিদেশবাস করেন নাই; সাধ মিটাইবার জন্য দুই একবার বৈদ্যবাটী হইতে রেল্ওয়েযান যোগে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, নতুবা প্রায়ই নৌকা করিয়া আসিতেন। ষ্টীমারে তিনি কখন পাদর্পণ ও করেন নাই, এই তাঁহার ষ্টীমারারোহণে প্রথম উদ্যম। দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁহার সহ্য হইল না, বহুদিন হইতে নিরাহার, কোনদিন বা অর্দ্ধাশন—শরীর দুর্ব্বল হইয়াছিল, কতকদূর ষ্টীমারে গিয়াই তাঁহার গা ঘুরিতে লাগিল; ষ্টীমারে যবন সংস্পর্শে তাঁহার পাকাদি কার্য্য চলিতে পারে না, সুতরাং সুধারামের অদৃষ্টে বিধাতা সে কয়েকদিন অন্ন মাপেন নাই। প্রতিদিন সন্ধ্যা হইলে অন্নাভাবে, যদি কিছু পাইতেন, খাইতেন; নতুবা উপবাস করিতেন; সামান্য শ্রম জীবির চাকরি এরূপ কষ্টের চাকরী লইয়াও তিনি দুবেলা দুমুষ্টি অন্নের মুখ দেখিতে পাইলেন না। ষ্টীমারে তাঁহার কোন কর্ম্ম ছিল না;—অন্যান্য কুলীগণ নানা প্রকার কথাবার্ত্তায়, হাসি গল্পে সময় কাটাইত, সুধারাম কেবল অন্য মনে বসিয়া ভাবিতেন—তাঁহার পূর্ব্বাবস্থার স্মৃতি আসিয়া তাঁহাকে মর্ম্মপীড়া প্রদান করিত; পূর্ব্বকৃত ক্রিয়াকলাপ যাগ যজ্ঞ, তদুপলক্ষে দিন দরিদ্রদিগকে অকাতরে প্রচুর অন্ন বস্ত্র দান; পুত্র কন্যা পরিবেষ্টিত পরিবার সহ অতুলানন্দ, তখন যে সকল কার্য্য নিত্য নৈমিত্তিকের মধ্যে মনে করিয়া তাহার সুখাস্বাদ অনুভব করিতে পারিতেন না; এখন সে অবস্থায়, সেই সকল ক্রিয়াকলাপ সংশ্রিত সুখের দুর্থত্ব প্রকৃতিতত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া-

ছিলেন ;—এটী মনুষ্যমনের স্বাভাবিকী বৃত্তি। মনুষ্য যখন যে অবস্থায় অবস্থিত হয়, তখন তাহার সুখানুভব করিতে পারে না; অবস্থান্তর হইলে পূর্ব্বাবস্থার সুখ বুঝিতে পারে, তখন তাহা পাইবার চেষ্টা করে, ইহ সংসারে যাহা একবার গত হয়, তাহা আর প্রায় পাওয়া যায় না;—মনুষ্যের শৈশবের পর বাল্য ; বাল্যের পর কৈশোর, কৈশোরের পর যৌবন ; যৌবনের পর প্রৌঢ়, প্রৌঢ়ের পর বার্দ্ধক্য। শৈশবের সুখ বাল্যে, বাল্যের সুখ কৈশোরে ; কৈশোরের সুখ যৌবনে, যৌবনের সুখ প্রৌঢ়ে; এবং প্রৌঢ়ের সুখ বার্দ্ধক্যে অনুভূত হয়। আর বার্দ্ধক্যে সকল হারাইয়া সকল অবস্থাই পুনঃ প্রাপ্তির কামনা করা মানবমনের সতঃপ্রকৃত ধর্ম্ম! সুধারামের পূর্ব্ব কথা যত মনে আসিতে লাগিল, তত তাঁহার নৈরাশ্য, আত্মভৎসনা, অদৃষ্টলাঞ্ছনা, আসিয়া উপস্থিত হইল। সুধারামের দুইটী দীর্ঘনিশ্বাস বহিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে দুই বিন্দু অশ্রু তাঁহার চক্ষু হইতে বাহির হইল;—পাছে কেহ সেই অশ্রু দেখিতে পায়, অমনি দুই হস্তে দুইটী চক্ষু মুছিয়া ফেলিলেন। আবার মনে হইল বসন্তকুমার ;— সেই সঙ্গে তাহার গর্ব্ভধারিণী ;—স্বয়ং কর্ত্রী হইয়া অপরের কর্ত্তৃত্ব সহ করা কতদূর অসঙ্গত, যাহাকে কখন করিতে হইয়াছে, সেই জানে, অপরে কেমন করিয়া জানিবে! সুধারামবনিতা পরাধীনতায় কিরূপে কাল কাটাইতেছেন, প্রিয়তম একমাত্র পুত্র বসন্তকুমার সেই বা কীদৃশ অবস্থায় কালক্ষেপ করিতেছে ; যে ব্রাহ্মণ পরিবারের আশ্রয়ে তাহাদিগকে রাখিয়া আসিয়াছেন, তাহাদিগের স্বভাব ভাল জানা নাই ;—নূতনত্বের পরিবর্ত্তনে তাহাদিগের যদি শ্রদ্ধা হানি হইয়া থাকে; তাহা হইলে কত মনঃপীড়া, কত কষ্টই হইতেছে। এই সকল ভাবিতে ভাবিতেই সুধারামের সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। নিয়মিত সময়ে সুধারামকে লইয়া ষ্টীমার কাছাড়ে পৌঁছিল। সেখানে কয়েকটী চা বাগান ভিন্ন মনুষ্যের বাসস্থান নাই ;— বড় বড় বাগান তাহারই মধ্যে কুলিদিগকে কাজ করিতে হয়; আহারাদি করিতে হয়, রাত্রিও যাপন করিতে হয়, বাহিরে যাইবার কোন আবশ্যকও নাই, যাইবার অনুমতিও নাই। এই দুঃখের শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া সুধারাম দিনপাত করিতে বসিলেন ;—প্রতিদিন এক কাজ

তাঁহার ভাল লাগিল না; কি করেন, উপায় নাই;—কাহার কাছে দুঃখের কান্না কাঁদেন; কেই বা শুনে, সেখানে যে সকল বাঙ্গালী বাবু আছেন, তাঁহারা এদেশীয় হইলেও এদেশের বলিয়া চিনিতে পারা সুকঠিন। তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার দেখিলে বাঙ্গালী বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহাদিগের সহিত সুধারামের মিশিবার উপায় ছিল না; তাঁহারা ইংরাজী শিখিয়াছেন, সাহেবের দাসত্ব ভালকরিয়া করিতে শিক্ষা করিয়াছেন, সাহেবের খাবার, সাহেবের পোসাক তাঁহাদিগের বেশ অভ্যস্ত হইয়াছে। আর সুধারাম হিন্দুতার প্রতিমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ, এরূপ পরাধীনতায় থাকিয়াও ত্রিসন্ধ্যাব্যতীত জলগ্রহণ করিতেন না;—একদিন চা বাগানের সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুধারামের গলদেশে উপবীত দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বড় বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন বাবু "এ কি আছে?" সাহেবকে বাবু উপবীতের প্রয়োজনীয়তা ও অর্থ বুঝাইয়া দিলেন, সাহেব "পৈতা আছে distinction of high caste ওঃ" বলিয়া চুরটের অগ্নি সংযোগে সুধারামের পৈতা দগ্ধ করিয়া দিলেন। সুধারাম কাঁদিতে কাঁদিতে আপন কুটীরে গেলেন, সুধারাম দিনান্তে স্নানাহ্নিক করিয়া সন্ধ্যার সময় আহার করিতেন, উপবীত দগ্ধ হওয়ায় সেদিন আহ্নিক ও হইল না, আহারও হইল না। সুধারামকে আহ্নিক ক্রিয়াকলাপানুরক্ত দেখিয়া একটী হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ জমাদার তাঁহাকে বড় ভক্তি করিত, আর সময়ে সময়ে আসিয়া সুধারামের নিকট ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা শুনিত, সে জন্য জমাদার সুধারামকে "গুরুজী" বলিয়া ডাকিত, অবকাশ কালে সুধারামের গৃহে আসিয়া তাঁহার আহারাদি ও দেখিত, বাঙ্গালা দেশের কথা শুনিত, নানা কথায় খানিক সময় কাটাইত। জমাদার দিন যেমন আসে, আজিও তেমন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "গুরুজী মহাশয়, কি করিতেছেন?" সুধারাম উপবীত সম্পর্কীয় কথা, সেই সঙ্গে বাঙ্গালী বাবুর ব্যবহার, সাহেবের চরিত্র সকলই বলিলেন। জমাদার তৎক্ষণাৎ আপন গৃহ হইতে উপবীত আনিয়া দিয়া আহারের জন্য অনেক উপরোধ অনুরোধ করিলে তিনি পাকাদি সমাপন করিয়া আহার করিলেন। সুধারাম এখন চা বাগানে প্রায় আট বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়াছেন, যদিও তিনি

তিন বৎসরের করারে আসিয়াছিলেন, কিন্তু সে কথা চা-কর সাহেবদিগের কাছে বলিলে সর্ব্বনাশ!

এতাধিক সময়ে দুঃখের সহিত সুধারামের সখ্যতা জন্মিয়া ছিল;—আমরা মিত্রদ্রোহী বন্ধুর সহবাস পরিত্যাগ করিতে চাহিলেও আমাদিগের তদ্রূপ বন্ধু স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য সহজে বন্ধুতা ছেদ করেনা। সেই উদ্দেশেই দুঃখ তাঁহাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিয়া থাকিত না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সুধারামের আট বৎসরের ও অধিক চা-বাগিচায় কাটিয়া গেল;—উপায় উপার্জ্জনের মধ্যে মাসিক তিন চারি টাকা খাবার জন্য পাইতেন;—তাহার এক পয়সাও বাঁচিত না; সাহেবদিগের কাছে কাঁদিলে তাহারা হাসিত, বাবুরা তাঁহার কথায় কান দিতেন না, এইরূপ করিয়া মায়াপুরের সুধারাম আসামের চা বাগানে বার্দ্ধক্য ক্ষেপণ করিতেছেন। যে জমাদারটীর সহিত সুধারামের গুরু শিষ্য সম্বন্ধ ছিল,তাহাকে একদিন তিনি তাঁহার সমস্ত দুঃখের কথা বলিলেন; সেই আসামের চাবাগানের নিষ্ঠুরকারা মধ্যে সুধারামের দুঃখ শুনিতে একমাত্র জমাদার ছিল, জমাদার তাঁহার পরিত্রাণে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইল;—অনেক যুক্তির পর অবধারিত হইল যে রাত্রিকালে পলায়ন ভিন্ন অন্য উপায় নাই। কিন্তু পলাইয়াই বা কোথায় যাইবেন! যে ষ্টীমারে কাছাড়ে আসিয়াছিলেন, সে ষ্টীমারে যাইতে হইলে ধরা পড়িতে হইবে সুতরাং সে যুক্তি খাটিল না; পদব্রজে যাওয়াই অবধারিত হইল; ফলতঃ যেন তেন প্রকারেণ চাবাগান হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেই তাঁহার আশা সফলা হয়, চাবাগানের বাহিরের বায়ুতে নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে পারিলেই তাঁহার পরম সৌভাগ্য। তিনি পরিশেষে পলায়নই শ্রেয় জ্ঞান করিলেন। জমাদারকেও তাহাই বলিলেন, কিন্তু হাতে একটি পয়সার ও সংস্থান ছিল না। জমাদার এত উপকার করিতেছে, আবার অর্থ সাহায্য

করিবে ইহা আশাতীত; সুতরাং বাহিরে যাইয়া যদি অনাহারেও তাঁহার জীবন যায় তাহাও ভাল বিবেচনা করিয়া তিনি জমাদারকে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তখন রাত্রি প্রায় আড়াই প্রহর, প্রকৃতি নিস্তব্ধ;—চাবাগান নিদ্রিত;—কেহ জাগ্রত নাই। সুধারাম আপন দুঃখের কুটীরের নিকট বিদায় লইয়া বাগানের নির্গম দ্বারে আসিয়া দেখিলেন জমাদার তাহার খাটিয়ায় পড়িয়া নিদ্রা যাইতেছে; একবার মনে করিলেন তাহাকে জাগ্রত না করিয়া প্রস্থান করেন, কিন্তু তাহা করিলে আর অধর্ম্ম রাখিতে স্থান থাকে না; ধর্ম্মের অনুরোধে পড়িয়াই সুধারামের এত দুর্দ্দশা; কিন্তু ধর্ম্মের প্রতি যাহাদিগের ঐকান্তিকতা আছে, ধর্ম্মের জন্য জীবন যাইলেও তাঁহারা অধর্ম্মের আশ্রয়লাভ শ্লাঘনীয় বিবেচনা করেন না। সুধারাম জমাদারকে জাগ্রত করিলেন, জমাদার উঠিয়া বসিল—বসিয়া বলিল, "এখন ও রাত্রি অনেক আছে, আপনি এ আঁধার রাত্রে কেমন করিয়া যাবে মশায়?"

সুধা। জমাদার! এ কাল বাগান হইতে বাহির হইলে যদি আমাকে বাঘ ভালুকে খায় সেও ভাল।

জমা। আপনি ত সে কথাটী বলিলেন, মশায়, আমি কেমন করে, আপনাকে বাঘের মুখে তুলিয়া দিই।

সুধা। এখান হইতে বাহির হইয়া আমি কোন গাছে উঠিয়া রাত্রি কাটাইব।

জমা। একটু বসেন।

সুধারাম অগত্যা স্বীকৃত হইলেন;—রাত্রি আন্দাজ চারি দণ্ড আছে, আকাশের ঘন বিন্যস্ত তারকা পুঞ্জের মধ্যে যে গুলি অতি ক্ষুদ্র সে গুলি আকাশের কোলে মিশিয়া গেল, বড় বড় গুলি সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর যেন মলিন মুখে মুদিত নেত্রে শয়ন স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিল; আকাশের গায়ে রাত্রির গাঢ় অন্ধকার রহিল না; পাখীগণ বৃক্ষ পল্লবের মধ্যে থাকিয়া শেষ রাত্রির ডাক ডাকিয়া উঠিল; সুধারাম দিবাগম নিকট বিবেচনায় বিলম্ব করিলেন না, বাগানের বাহিরে আসিতেছেন, এমন সময় জমাদার "গুরুজী একটু থামেন," বলিয়া নিকটে আসিয়া পাঁচটী টাকা

দিয়া বলিল আপনার সঙ্গে কিছু নাই এই টাকা কয়টী পথ খরচ করিয়া যাইবেন, হামার কাছে, বেশী নাই, থাকিলে দিতাম। ”

সুধা। জমাদার, তুমি যা উপকার করিলে, তার কাছে টাকা কি ছার! আমার যথেষ্ট উপকার হইল, আমি ইহ জন্মে তোমার উপকার ভুলিতে পারিব না।

জমা। বাটি পৌঁছিয়া সংবাদ ভেজবেন, পথে সতর্ক হয়ে যাবেন,—প্রণাম।

সুধারাম চাবাগান হইতে জমাদারের সাহায্যে মুক্তিলাভ করিলেন;—বাহির হইয়া তিনি দক্ষিণ পশ্চিম দিক্ লক্ষ করিয়া চলিতে লাগিলেন;—অনেক দিনের পর বাহিরের বাতাস তাঁহার গায়ে লাগিয়াছে, আট নয় বৎসরের পর আজি যেন নূতন দেহ; সুধারাম এখন প্রাচীন; কিন্তু আজি তাঁহার গায়ে যুবার বল! মনে যুবার উৎসাহ, যুবার সাহস;—আজি তাঁহার ব্রাহ্মণীর কথা মনে নূতন হইয়া আসিল;—বসন্তর স্নেহ, বসন্তর পিতৃ সম্ভাষণ, বসন্তর অল্প বয়সের পিতৃভক্তি সকলই তাঁহার নবীভূত হইয়া আসিতে লাগিল; সুধারাম যত শীঘ্র সেই ধরণীধর বাবুর বাটিতে পেঁাছেন দ্রুতপদে, ব্যথিত মনে তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু একমাসের পথ কি কখন একদিনে, কি এক রাত্রিতে পৌঁছান যায়? সকাল হইল সুধারাম ব্রহ্মপুত্রের তীরে পৌঁছিলেন; ব্রহ্মপুত্র পার হইতে তাঁহার সন্ধ্যা হইল। ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে লোকের বাস ছিল না;—যখন রাত্রি এক প্রহর তখন তিনি এক গ্রামে পৌঁছিলেন. গ্রামের লোকের কথা, সুধারাম সে কালের লোক ভাল বুঝিতে পারিলেন না; কিন্তু গৃহস্থের এ জ্ঞান ছিল, যে, অতিথি আসিলে তাহার অতিথ্য সৎকারের ক্রটী হইলে ধর্ম্মহানি হয়, তাঁহাকে যেরূপ খাদ্য আনিয়া দিল তাহার কতক হিন্দুধর্ম্ম-সম্মত, কতক বিধর্ম্মী দিগের গৃহীতব্য;—যাহা হিন্দুর খাদ্য সুধারাম তাহাই গ্রহণ করিলেন, অবশিষ্ট খাদ্য গ্রহণ করিলেন না। সুধারাম এইরূপে দুই মাস কাটাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে পূর্ণিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, অনেক বাঙ্গালী কার্য্যোপলক্ষে পূর্ণিয়ায় বাস করেন, তাঁহাদিগের নিকট জানিলেন, ভাগলপুর সেখান হইতে অধিকদূর নয়, ভাগলপুরে সুধারামের

স্বগ্রামবাসী একটী বাবু চাকরী করিতেন, তিনি তাহা জানিতেন। পূর্ণিয়া ছাড়িয়া চারিদিনের দিন সুধারাম ভাগলপুরে আসিলেন, ভাগলপুরে আসিয়া তিনি স্বদেশের লোকটীকে অনেক অনুসন্ধান করিলেন কোথাও পাইলেন না; বেলা শেষ হইল; শীতকালের সূর্য্য কাঁপিতে কাঁপিতে অস্ত গেল; অন্ধকারময়ী যামিনী মনুষ্যের দৃষ্টি পথ অবরোধ করিয়া আকাশ পৃথিবী সকলই অন্ধকারময় করিল। ভাগলপুর সহর;—সহরে অসৎ প্রকৃতির লোকের সুপ্রচুরতা হেতু, বিশেষ পরিচিত না হইলে কেহ কাহাকেও রাত্রি-কালে আশ্রয় দেয় না। বৃদ্ধ সুধারাম গৃহস্থদিগের দ্বারে দ্বারে বেড়াইলেন, কেহ তাঁহাকে আশ্রয় দিল না; প্রত্যুত তাঁহার দুর্দ্দশামলিনা মূর্ত্তি সাধারণের ঘৃণা এবং সন্দেহ প্রসবিনী হইয়াছিল। তাঁহার সেই মূর্ত্তি বৃদ্ধের উপেক্ষ-ণীয়া, যুবার ঘৃণনীয়া এবং বালকের উপহাসনীয়া হইল, কাহার করুণা বা সহানুভূতি উত্তেজিকা হইতে পারিল না। রাত্রির অন্ধকারে দৃষ্টি চলে না, ভাগলপুরের উত্তরে গিরিতনয়াগাঙ্গিনী উত্তরীয় শীতলবায়ুর বিমিশ্রনে প্রখরতর শীতলতা প্রাপ্ত হইয়া সন্ধ্যা না হইতেই মনুষ্যদিগকে কম্পিত করিতে লাগিল;—রাত্রি চারি পাঁচ দণ্ডেই নিশীথের নীরবতা উপস্থিত হইল। আমাদিগের দরিদ্র চীরপরিহিত সুধারাম কাঁপিতে কাঁপিতে যোগসারের একটি বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন;—তখন বাবু বৈটকখানার বাহিরে কোন কার্য্যোপলক্ষে আসিয়াছিলেন, সুধারামকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন "কে হে বাপু!"

সুধা। আজ্ঞা আমি ব্রাহ্মণ, আমার বাস হুগলী জেলায়।

বাবু। এখানে কেন?

সুধা। আজি রাত্রি মহাশয়ের আশ্রয়ে থাকিব।

বাবু। থাক তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু প্রত্যুপকার এই করিও যেন যাইবার সময় কিছু চুরি করিয়া লইয়া যাইও না।

সুধারাম কোন উত্তর করিলেন না;—এই সময় একবার আপনার অব-স্থাটা ভাবিলেন, ঈশ্বরকে ভাবিলেন, জগতের কর্ম্মসূত্র ভাবিলেন, মানবা-দৃষ্টের ক্ষণ ভঙ্গুরতা ভাবিলেন; ভাবিতে ভাবিতে বাবুর কথার উত্তর দিতে ভুলিয়া গেলেন, বাবু তিন চারিটি প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহার উত্তর দেন

নাই। বাবু বলিলেন "তুমি কি পাগল নাকি হে বাপু? কথা বলিলে উত্তর দাও না কেন? "পাগল নাকি?" এই কথাটি সুধারামের কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে, বলিলেন "আজ্ঞা না!"

বাবু। তবে, উত্তর দাও না যে?

সুধা। আজ্ঞা বহুদিন বাড়ী ছাড়া—বাড়ী যাইতেছি, ছেলেটিকে মনে পড়িল, তাই ভাবিতেছিলাম।

বাবু। এখানে তোমার থাকা হইতে পারে না।

সুধা। কেন মহাশয়?

বাবু। তুমি সন্ধিগ্ধ ব্যক্তি।

সুধা। আজ্ঞা না, কোন সন্দেহ করিবেন না।

বাবু। তোমায় আমার বিশ্বাস হইতেছে না, আমার বৈটকখানায় অনেক টাকার জিনিস পত্র আছে——

সুধা। আজ্ঞা—আমি এই বারাণ্ডায় থাকিব, পল্লীগ্রাম নয় যে গাছ তলায়; কি কোন দেবগৃহে আশ্রয় লইব।

বাবু। আচ্ছা আমার এই চাকরের কাছে থাকিও——তুমি কি জাতীয়?

সুধা। আজ্ঞা——ব্রাহ্মণ।

বাবু। কোন শ্রেণী?

সুধা। রাঢ়ী শ্রেণী।

বাবু। হুগলী জেলার কোন গ্রামে বাস?

সুধা। মায়াপুরে।

বাবু। খাওয়া দাওয়া হইয়াছে?

সুধা আজ্ঞা—রাত্রিতে কিছু খাইব না।

বাবু। তাও কি হয়? যখন অতিথি হইয়াছ, আহার করিতেই হইবে।

সুধা মহাশয়, রন্ধন করিতে পারিব না—যদি নিতান্তই না খাইলে নয়—জলখাবার কিঞ্চিৎ হইলেই যথেষ্ট হইবে।

বাবু। তাই ভাল।

বাবু চাকরকে দশটী পয়সা দিয়া সুধারামের খাবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে বলিলেন। সুধারামের জলযোগ হইতে হইতেই শীতকালের রাত্রির দশটা বাজিয়া গেল। বাবুও বাড়ীর ভিতর গেলেন। সুধারামপথশ্রান্ত—অনেক দিনের পর ভাল ঘরে গরম কাপড় গায়ে দিয়া শয়ন করেন নাই ;—বৃদ্ধ মানুষ—অঘোরে ঘুমাইলেন।

বঙ্গীয় বিবাহ।

এই বিশ্ব সংসারে প্রধান সুখ দাম্পত্য প্রণয়, এবং সেই প্রণয়ের আকর বিবাহ। পরিণয় প্রথা ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে, কিন্তু সেই পরিণয় বিধি যে সকল জাতির বা সকল সম্প্রদায়েরই সমান বা বিশুদ্ধ তাহা বলিতে পারি না। যখন স্ত্রী এ জীবনের একমাত্র সঙ্গিনী, যখন হর্ষে, বিষাদে, সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে, সকল অবস্থাতে ও সকল সময়েই স্ত্রী একমাত্র সঙ্গিনী, তখন সেই স্ত্রী নির্ব্বাচন করা যে সহজ নহে, তাহা কেনা স্বীকার করিবে? তুমি বিবাহ করিলে, উত্তম রূপবতী স্ত্রী পাইলে, কিন্তু তাহার অন্তর পাইলে না বা তাহার মনের সহিত তোমার মনের ঐক্য হইল না; তবে সে বিবাহে সুখ কি? সে স্ত্রী লইয়া তোমার ইহ জন্মে কোন ফল উৎপাদিত হইবে? পৃথিবীর অধিকাংশ ব্যক্তিই বিবাহিত; কিন্তু বিবাহিত ব্যক্তিমাত্রেই কি সুখী? সকলেই কি প্রণয় সাগরে ভাসমান? কখনই না।

আজ কাল প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, যে যুবকেরা বিবাহিত হইবামাত্র মনে করেন যে তাঁহারা কি অমূল্য নিধিই হস্তগত করিয়াছেন। পৌত্তলিকের উপাস্যের ন্যায় সতত তাহাকে ভক্তি দেখান, কিন্তু সে ভক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া যায়; ইহার কারণ কোন কোন লোকের সম্বন্ধে মানসিক চঞ্চলতামাত্র। কোন বস্তুই চিরকাল সমান ভাল লাগে না, তুমি নবকামিনীর প্রণয়লাভ লালসায় নানাপ্রকারে স্নেহ যত্ন বিনয় বাধ্যতা

দেখাইলে, তোমার এখন তাহা বড় ভাল লাগিল। ক্রমে তাহাকে হস্তগত করিলে, তাহাকে হাসাইলে, ক্রীড়া করাইলে, সেই কম্বুকণ্ঠীর অমৃত ভাষে হৃদয় পরিতৃপ্ত করিলে। কিছুদিন পরে পুরাতন হইল, সে স্নেহ যত্ন বিনয় প্রভৃতি আর তোমার তত ভাল লাগিল না; সুতরাং তাহার হ্রাস হইতে লাগিল। যেমন বন্যার জল থাকেনা, সেই মত রূপবতীর রূপভোগজনিত মৌখিক ভালবাসাও চিরকাল থাকে না। কিন্তু ঐরূপ ক্ষণিক পরিতৃপ্তি ও অতৃপ্তির ফল বড় বিষময়। বন্যার জল নদী ভাসাইল, দেশ প্লাবিত করিল, বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ, গৃহাদিস্রোতোবেগে বিধ্বংশ করিল কিন্তু দুই তিন দিনেই যেখানকার সেইখানে মিশিল. কেবল তৃণ শূন্য ভূমিখণ্ডে তাহার স্মৃতি-চিহ্নমাত্র রহিল। মৌখিক ভালবাসাতেও তদ্রূপ; তখন তোমার পরিণীত স্ত্রী এই বিসদৃশভাব দেখিয়া ভাবিলেন, যে তুমি আর তাহাকে যত্ন করনা বা ভাল বাসনা, যে টুকুও বাস তাহা মৌখিক বা লোকলজ্জাজনিত। ফলতঃ আন্তরিক স্নেহ বন্ধনের গ্রন্থি এক একটি করিয়া যতদূর খসিবার তাহা খসিতে লাগিল। আন্তরিক অনৈক্যতা অবিশ্বাস ও কলহের সূত্রপাত হইল। তুমি অগ্র পশ্চাৎ ভাবিলে না, অবাক্ হইলে। পরিণয়ে সুখ নাই বলিয়া স্থির করিলে; স্ত্রী স্বার্থ পরায়না, সুখের সঙ্গিনী হইতে পারে, কিন্তু দুঃখের সময়ে কেহই নহে, বলিয়া স্থির করিলে। কিন্তু তুমি এ কথা স্বীকার করিবে না যে তুমিই এই অনিষ্টপাতের একমাত্র কারণ। তাহাকে কোন কথা বুঝাইবে না, বরং সে কোন কথা জিজ্ঞাসু হইলে রাগ প্রকাশ করিবে। এইরূপে অনেকেই স্ত্রীর প্রণয়লাভ করিতে পারেন না. স্ত্রীর সহিত প্রকৃত বন্ধুত্ব হয় না। বন্ধুত্ব প্রভুত্বে হইতে পারে না। আমি স্বামী, সে স্ত্রী অতএব সে আমার একান্ত বশম্বদা ও বাধ্যা হইবে, ইহা ভাবিলে প্রণয় হয় না। প্রথমে বড় আড়ম্বর হইল, যুবাপ্রণয়িণীকে প্রণয় সাগরে ভাসাইলেন, ডুবাইলেন, তাহাকে তখন কতই সুখী করিলেন, কিন্তু কিছুদিন পরেই তাঁহার ভোগলালসা চরিতার্থ হইল, তাঁহার হৃদয়ের বেগ থামিল, আর সেই প্রণয়িণীকে তাঁহার ভাল লাগিল না। তাঁহার বন্যার-জলমত-প্রণয়-বেগ নব প্রণয়িণী হইতে যথাস্থানে বিলীন হইল; বন্যার জল অপসৃত

হইলে শূন্য ভূমিখণ্ডমত যুবতীর শূন্য হৃদয় শূন্যই রহিল। হয়ত যেমন শূন্য ভূমিতে কণ্টকাদি স্বতঃই উৎপন্ন হয় সেই মত তাঁহার সেই হৃদয়ে কুপ্রবৃত্তিরূপ কণ্ঠক জন্মিল।

কেহ কেহ বঙ্গের বিবাহ প্রণালীর কদর্য্যতাই প্রকৃত প্রণয় না হইবার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বিবাহের পূর্ব্বে স্বামী স্ত্রীকে, বা স্ত্রী স্বামীকে দেখিল না, আপন পিতামাতা বা অপর কর্ত্তৃপক্ষ যাহার সহিত যাহার পরিণয় দিলেন তাহাকেই বিবাহ করিতে হইল। এরূপ স্থলে কি করিয়া প্রকৃত প্রণয়ের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? যদিও অনেকে এমতের পক্ষপাতী তথাপি আমাদের ইহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বোধ হয় না। আন্তরিক মিল যে কাহার সহিত কাহার হইবে তাহার স্থিরতা নাই। আমি পরিণয়ের পূর্ব্বে স্বয়ং পাত্রী দেখিলাম কিন্তু হয়ত এই পর্য্যন্ত দেখিলাম যে কন্যাটি সুন্দরী কিনা। কিন্তু তাহার মানসিক ভাবের কি করিয়া সহসা পরীক্ষা করিতে সক্ষম হইব? দুই এক দিনে কাহারও অন্তরের ভাব জানা যায় না, তাহা জানিতে হইলে ঘনিষ্ঠতার আবশ্যক, কিন্তু সেরূপ ঘনিষ্ঠতা বাঙ্গালির নিকট প্রত্যাশা করা অন্যায় ও অসম্ভব।

উভয়ের অন্তর উভয়ের মত না হইলে মিল হয় না। যদি স্বামী উগ্র স্বভাবাপন্ন ব্যক্তি হন, তবে তাঁহার স্ত্রীর অত্যন্ত ধীর স্বভাব হওয়া উচিত, নতুবা স্ত্রী পুরুষে সতত ঘোরতর কলহ হইবার সম্ভাবনা।

আমাদের দেশে অধুনা বিবাহের যে প্রণালী প্রবর্ত্তিত, তাহাতে দেখা যায় যে পুরুষের বিবাহ পক্ষে কোন নির্দ্দিষ্ট সময় অবধারিত নাই, কিন্তু কন্যাপক্ষে অষ্টমবর্ষ অতীত হইবামাত্রই বিবাহের মুখ্য সময় উপস্থিত হইল। ইহার বিষময় ফল এই হয়, অষ্টম বা নবম বর্ষীয়া বালিকা ত্রিংশৎ, চত্বারিংশ বা ততোধিক বর্ষ বয়স্ক পুরুষের সহিত সচরাচর পরিণীতা হয়েন। অথবা ঐরূপ বালিকার সহিত দশম বা দ্বাদশবর্ষীয় বালক পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়। কিন্তু এই উভয়ই সংসারের অনিষ্টপাতের প্রধান হেতু। প্রথম কল্পে অপরিস্ফুটবাচা বালিকা পিতা বা পিতামহ তুল্য পতির হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়া চিরজীবন দগ্ধ হন; দ্বিতীয় কল্পে অপরিণত বয়স্কের অপরিপক্ক বীজে উৎপন্ন সন্তান অনতিদীর্ঘবয়সে

মৃত্যুর বশীভূত হইয়া অল্প বয়স্ক পিতামাতার শোকের হেতু হয়। যদিও তুল্য বয়স্কের সহিত প্রণয় সঞ্চারের কোন অসম্ভাবনা নাই, তথাপি বালক বালিকার বিবাহ যুক্তিসঙ্গত নহে। কিন্তু এ প্রবন্ধে আমাদিগের তাহা সমালোচ্য নহে, যাঁহারা বাল্য বিবাহের দোষ অবগত আছেন, তাঁহারা তাহা অনায়াসে বুঝিতে সক্ষম হইবেন।

বিবাহ প্রণালী ইংরাজ জাতির অনেক ভাল। বাঙ্গালীর ন্যায় অসংলগ্ন বয়সে তাহাদের প্রায় বিবাহ হয় না, এবং পরস্পরের অজ্ঞাতে কোন যুবক যুবতীরও বিবাহ হয় না। কিন্তু ইংরাজজাতি সকল বিষয়েই অধিকমাত্রায় যান, এবং তজ্জন্যই তাহাদের বৈবাহিক নিয়মেও অনেক দোষ লক্ষিত হয়।

ইংরাজদিগের মধ্যে বাল্য বিবাহ প্রচলিত নাই বটে, তবে তাঁহাদিগের যেরূপ বয়ক্রমে বিবাহ হয় সে বয়ক্রমে বাঙ্গালির বিবাহ হওয়া উচিত নহে। কারণ দেশ কাল ও ঋতু বিবেচনায় মনুষ্যের আনুসঙ্গিক কার্য্য কলাপের পরিবর্ত্তন হওয়া বিধেয়। সেই শীত প্রধান দেশের কামিনীরা ১৮, ১৯, ২০, বা ২৫ বৎসর বয়ক্রমে বিবাহ করে বলিয়া এই উষ্ণ প্রধান দেশস্থ কামিনীরাও যে তাহার অনুকরণ করিবে এমত নহে। এতদ্দেশে যেরূপ সময়ে বিবাহ হওয়া উচিত সেই সময়েই হইবে। কিন্তু যে বয়সে পাত্রকন্যা বিবাহের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে না, সে সময়ে তাহাদের বিবাহ দেওয়া অবিবেচকতার কার্য্য। ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত এদেশের কন্যাদিগের বিবাহের কাল হইতে পারে, কিন্তু বিংশতিবর্ষীয়া কামিনী অবিবাহিতা থাকিলে ভাল দেখায় না।

ইংরাজদিগের ষোড়শ বর্ষীয়া রমণী বালিকামাত্র, কিন্তু বঙ্গ-রমণী সে বয়সে পূর্ণ যৌবনা। অতএব ষোড়শবর্ষ অতিক্রম করিয়া বিবাহ দিলে যৌবন অতীত করিয়া বিবাহ দেওয়া হয়। বঙ্গীয় কামিনীগণের ষোড়শবর্ষে যৌবন ঢল ঢল করে, কিন্তু তাহার পর সে লাবণ্যের বা যৌবনের হ্রাস হইতে থাকে। এই নিমিত্ত ষোড়শ বৎসরের মধ্যেই বিবাহ কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়।

ইদানীন্তন বাঙ্গালীরা না হিন্দু, না মুসলমান, না ইংরাজ; তাহারা কি

করিবে স্থির করিয়া উঠিতে পারে না। প্রবল পবনে সরোবরস্থ মৃণালিনী যেমন হেলিতে দুলিতে নাচিতে থাকে ইহাদিগের মন ও সেইরূপ নৃত্যশীল, ও দোদুল্যমান। ইহারা না হিন্দুশাস্ত্র না কোরান না বাইবেল কিছুই মনোমত বোধ করে না। সুতরাং ইহারা শাস্ত্র বিশেষে শ্রদ্ধাশূন্য হইয়া কোন মতেরই মর্ম্মাবধারণ করিতে পারে না। পূর্ব্বকালে বাঙ্গালিদের হিন্দুশাস্ত্রে বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল, এবং শাস্ত্রানুযায়ী সমস্ত কার্য্য করিত। তৎকালে তাহাদের বৈবাহিক নিয়ম সমস্তও উত্তম ছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে শাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য করিলে সকল বিষয়েরই উত্তম হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা মূর্খের ন্যায় শাস্ত্র অবহেলা করিয়া সকল কার্য্য নষ্ট করি।

" বেদানধীত্য বিধিনা সমাবৃত্তোঽপ্লুত ব্রতঃ।
সমানা মুদ্বহেৎপত্নীং যশঃশীল বয়োগুণৈঃ ॥ "

আমরা এখন ইহার কি করি? কিছুই না, যশঃশীল বয়ঃগুণ প্রভৃতি কিছুরই প্রতি লক্ষ্য করি না, কেবল একমাত্র অর্থ পাইলেই সকল মিটিয়া যায়। বর—কন্যার রূপও দেখিতে পান না, কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইলেই গ্রহণ করা হয়। অতএব ইহা কি সামান্য দুঃখের বিষয়? ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপরাপর জাতিবর্গের বৈবাহিক নিয়মও মন্দ নহে।

" লব্ধাভ্যনুজ্ঞো গুরুতো দ্বিজো লক্ষণ সংযুতাম্।
বুদ্ধি শীল গুণোপেতাং কন্যামামন্যগোত্রজাম্।
আত্মনোঽবরবর্ষাঞ্চ বিবহেদ্বিধি পূর্ব্বকম্ ॥ "

আমরা ভ্রমেও তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করি না, আপনাদের ইচ্ছামত বিবাহ দি। বালক বালিকার বিবাহ দিয়া পুত্তলিকা ক্রীড়ার ন্যায় তাহাদের খেলিতে দেখিয়া আনন্দিত হই, কিন্তু পিতা মাতা হইয়া পুত্র কন্যার যে কি অশুভ কার্য্য করিলাম তৎপ্রতি ভ্রমেও চাহিয়া দেখি না।

স্বামীর যে স্ত্রী দেখিয়া বিবাহ করা উচিত তাহার বিশেষ উল্লেখ বাহুল্য-মাত্র। স্বামীর স্ত্রী নির্ব্বাচন সচরাচর ঘটিয়া উঠে না; পিতা মাতা কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত না হইলে এ কার্য্য করিতে সন্তান অন্ততঃ লজ্জা বোধও করে। কিন্তু পিতা মাতার তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

" কুলজাং সুমুখীং স্বঙ্গীং সুকেশীঞ্চ মনোহরাম্।
সুনেত্রাং সুভগাং কন্যাং নিরীক্ষ্য বরয়েদ্বুধঃ॥"

কিন্তু আমরা ইহার বিন্দুবিসর্গও অনুধাবন করি না। যখন

" Of all the blessings on Earth the best is a good wife,
A bad one is the bitterest curse of human life."

যখন

"নাস্তি ভার্য্যা সমোবন্ধু নাস্তি ভার্য্যা সমাগতিঃ,
নাস্তি ভার্য্যা সমোলোকে সহায় ধর্ম্ম সংগ্রহে।"

তখন সেই স্ত্রী বিশেষরূপে নির্ব্বাচন করা যে স্বামী মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তৎপ্রতি বঙ্গের অতি অল্প লোকেরই লক্ষ্য আছে।

স্ত্রীর সহিত আন্তরিক মিল থাকিলে সংসারে বহুল পরিমাণে ক্লেশ থাকিলেও তাহার অনেক যন্ত্রনার হ্রাস হয়। " Wife is the mystress of youth, companion of manhood, and the nurse of old age" কিন্তু প্রকৃত প্রেম না হইলে অনেককে সে সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। যদিও বঙ্গে স্ত্রী নির্ব্বাচন প্রথা কদর্য্য, তথাপি অনেকেই স্ত্রীর প্রেমে মুগ্ধ ও সুখী। বাঙ্গালীরা স্ত্রী নির্ব্বাচনের উন্নত সোপানে আরূঢ় হইলে সেই সুখসচ্ছন্দতা সমধিক বৃদ্ধি পাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। রেনল্ড্‌ড একস্থানে লিখিয়াছেন; " She was one of those fine creatures—one of those splendid specimens of female sex, which are alone seen in the cold climates of the north, for it appears to be a rule in nature that the flowers of our species expand into the most lucious loveliness in the least genial latitudes." কিন্তু ইহা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে সে বিষয়ে হিন্দুরাই সৌভাগ্যশালী। যদিও রেনল্ড্‌ডের উক্ত কথায় অত্যুক্তি দোষ আছে, তথাপি যেখানে স্ত্রী নির্ব্বাচন প্রণালী উন্নতির শেষ সোপানে আরূঢ় হইয়াছে, সেখানে অত্যল্প দোষও হৃদ্‌বিদারক। যে স্ত্রী স্বামীকে আন্তরিক ভালবাসে ও ভক্তি করে তাহার চরিত্রে দোষ স্পৃষ্ট না হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ইংরাজেরা

সেই ভালবাসা অনেকদিন আঁকোড়ে রাখিয়া বাজাইয়া দেন। অতএব তাঁহাদের মুখে উক্ত কথা ভাল শুনায় না।

এরূপ অনেক দেখা যায় যে অনেকে প্রথমত স্ত্রীকে আন্তরিক ভালবাসার চিহ্ন দেখান। পরে তাহার কণা মাত্রও থাকে না। আবার নব প্রণয়ে আশক্ত হন, অতএব ইহা কি প্রণয়? কখনই নয়, বরং তাহার ব্যভিচার বলা যাইতে পারে, ইহাতে প্রকৃত প্রণয় বা সামান্য ভালবাসারও অভাব। কুরূপা স্ত্রী হইলে যে ভালবাসা জন্মে না তাহা নহে, এবং কুরূপা স্ত্রী হইলেই অধিকাংশ লোক যে স্ত্রীকে ভালবাসেনা তাহা ও নহে। তবে মানসিক দুর্ব্বলতা এবং প্রেমের অজ্ঞতা তাহার নিদান কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

অনুরাগ অতি মধুর। অনুরাগের পরে যে বিরাগ জন্মিতে পারে না এমত নহে, এবং যাহাদের তাহা হয় সে হৃদয় সদতই চঞ্চল। যখন ফর্দ্দিনন্দ মিরন্দাকে প্রথম সন্দর্শন করিল, তখনই বলিল——

"————Ful many a lady
I have ey'd with best regard; and many a time
The harmony of their tongues hath into bondage
Brought my too diligent ear: for several virtues
Have I liked several woman; never any
With so ful soul, but some defect in her
Did quarrel with the noblest grace she ow'd,
And put it to the foil: But you O you,
So perfect and peerless, are created
Of every creatures best."

এবং সেই প্রথম অনুরাগের সঞ্চার হইতে কি বিমল প্রণয়কে হৃদয় মধ্যে প্রতিষ্ঠা, ও কি স্বর্গীয় ভালবাসায় হৃদয় আবরিত করিল। কিন্তু শতবার প্রণয়িণী সন্দর্শন করিয়া শতবার হৃদয় পরীক্ষা করিয়া কেহবা বিবাহ করিল, আবার সেই সুবর্ণ প্রতিমাকে অনলে আহুতি প্রদান করিয়া আনন্দিত হইল। হৃদয়ের এরূপ চঞ্চল পরিবর্ত্তন সত্বেও মনুষ্য যে কিরূপে প্রণয়লাভ

করে তাহা বলা নিতান্ত সহজ নহে। তবে সাধারণ অনুরাগ বিরাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারা যায় যে জীবনের চির সহচরীকে দেখিয়া বিবাহ করা উচিত। তাহার সহিত ঐক্য না হইলে যখন সংসারের গুরুতর সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, তখন তাহার সুন্দর রূপে নির্ব্বাচন করা সর্ব্ববাদি সম্মত।

যে হৃদয় সামান্য তরঙ্গের আঘাতও সহ্য করিতে পারে না, তাহাকে মনুষ্য পদবাচ্য না করিলে ক্ষতি কি? সে রূপব্যক্তি যে প্রকৃত প্রণয়লাভ করিতে অক্ষম তাহাতে সন্দেহ কি? নগেন্দ্রের সূর্য্যমুখীর স্বর্গীয় প্রণয় ভাল লাগিল না, সেই মধুর স্নেহে তাহার মন উঠিল না। আবার কুন্দনন্দিনীর অস্ফুট প্রণয়লাভ লালসায় হৃদয়ে অনন্ত অতৃপ্তিকে স্থান দিল। কুন্দের রূপ হৃদয়ে সদত জাগরূহ রহিল, কুন্দবিহনে জগৎ সংসার গাঢ় অন্ধকারময় বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। যাহার হৃদয় এত চঞ্চল, সে এ পৃথিবীতে কোথায় অমৃত পাইবে? যে কোনটি অমৃত, কোনটি গরল দেখাইয়া দিলেও বুঝিবে না সে আবার মনুষ্য কিসের? তাহার এ সংসারে সুখ কোথায়?

যদ্যপি জগতের অধিকাংশ ব্যক্তিরই ঐরূপ চরিত্র হয়, তাহা হইলে তাহাদের নিকট পরিণয়ে গরল ব্যতীত অমৃত নাই। তাহারা ভালবাসিতে জানে না, হৃদয় দমন করিতে শিখে নাই, তাহাদের কোথাও সুখ নাই। এই পৃথিবীর অমূল্য রত্ন স্ত্রীর যৌবনই তাহাদের প্রণয়, ভালবাসা ও আদর; এবং পাশব প্রবৃত্তির চরিতার্থই তাহাদের বিবাহের উদ্দেশ্য।

যে ভালবাসে সে ভালবাসা প্রায় দেখাইতে জানে না। হৃদয়ে বিরহের যাতনা উদিত হইলে নিভৃতে নয়ন আসারে তাহার যাতনা প্রশমিত করে, হৃদয়ের পরিতৃপ্তি সাধনা করে। কেহ দেখে না, কেহ শুনে না, অজ্ঞাতসারে কার্য্যে প্রকাশিত হইতে পারে। মহাকবি বায়রণ বলিয়াছেন,

"When Friendship or Love our sympathies move,
When Truth in a glance should appear,
The lips may beguile with a dimple or smile,
But the test of affection 's a Tear."

সেই প্রেম ও সহানুভূতি মনুষ্যের মৃত সঞ্জিবনীমাত্র সেই ভালবসাই মনুষ্যের সুখ। সে ভালবাসা বিহনে ভালবাসা ভ্রমাত্মক, ফলতঃ প্রকৃত ভালবাসা অন্ধ, সে দেখিতেও পায় না, বা দেখাইয়া দিলেও দেখে না।

অনেকে কতিপয় ঘৃণিত ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করাই বিবাহের উদ্দেশ্য জ্ঞান করেন, কিন্তু ইহা অপেক্ষা অধিক মূর্খতা আর কি হইতে পারে? যে স্ত্রীর স্পর্শে রামচন্দ্র কহিয়াছেন, ঃ——

"বিনিশ্চেতুংশক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখ মিতিবা,
প্রবোধোনিদ্রা বা কিমুবিষবিসর্পঃ কিমু মদঃ।
তব স্পর্শে স্পর্শে মমহি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো,
বিকার শ্চৈতনং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তিচ।"

সেই স্ত্রী কি শুদ্ধ একটি জঘন্যবৃত্তির সন্তোষের কারণ? যিনি ঐরূপ ভাবিবেন তিনি পরিণয়ের কি সুখ তাহা জানেন না, স্বামীর কি কর্ত্তব্য তাহা জানেন না, স্ত্রী হইতে কি সুখ তাহাও জানেন না। তাঁহার হৃদয়ে অনন্ত আতঙ্কজনক অন্ধকার। পতিব্রতা পতি পরায়ণা ও পতিগতাস্ত্রী এ জগতের একটি অমূল্য ধন। স্বামীর সুখে স্ত্রীর সুখ এবং স্বামীর দুঃখে স্ত্রীর দুঃখ। কিন্তু উক্ত সম্প্রদায়স্বামীগণ সে সুখ দুঃখ বোধে অপারগ। তাঁহারা স্ত্রীকে সামান্য পরিচারিকা জ্ঞান করেন, এবং তাঁহারাও স্ত্রীকে যেরূপ স্নেহ করেন ও ভালবাসেন, বোধহয় স্ত্রীরাও তাঁহাদিগকে সেইরূপ স্নেহ করে ও ভালবাসে বিবেচনা করেন।

যাঁহারা বহু বিবাহ ভক্ত তাহারাও ঐ দলভুক্ত। তাঁহারাও বিবাহের উদ্দেশ্য কি তাহা জানেন না বা বুঝেন না। প্রণয়ের সুখ তাহাদের অসপ্নকল্পিত। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ সভ্যতাস্রোতে আজ কাল সেই মহদানিষ্টদায়ক বিবাহ প্রথা অন্তর্হিত হইতেছে। এক স্ত্রী সত্ত্বে কি করিয়া মনুষ্যের বিবাহ করিতে ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি হয় তাহা ঈশ্বরই জানেন।

"ভার্য্যায়ৈ পূর্ব্বমারিণ্যৈ দাত্ত্বাগ্নীনন্ত্যকর্ম্মনি।
পুনর্দ্দার ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পুনরাধানমেবচ॥"

স্ত্রী বিয়োগে পুনর্দার পরিগ্রহ করা বস্তুতঃ তত দূশ্য নহে, কিন্তু স্ত্রী সত্ত্বে বিবাহ করা নিতান্ত অন্যায় অধার্ম্মিকের ও নিষ্ঠুরের কার্য্য।

"সুরাপী ব্যাধিতা ধূর্ত্তা বন্ধ্যার্থয়্যপ্রিয়ংবদা।
স্ত্রীপ্রসূশ্চাধিবেত্তব্যা পুরুষদ্বেষিনী তথা॥"

যদিও উক্ত দোষ সত্ত্বে পুনঃ পাণিগ্রহণ বিধি প্রচলিত আছে, তথাপি স্ত্রী-প্রসবিনী বা বন্ধ্যাস্ত্রী সত্ত্বে বিবাহ করা কিরূপ যুক্তিযোগ্য তাহা আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে আইসে না। বলিতে কি কণামাত্র মধুর প্রেম যদ্যপি সেই পুরুষের মনে থাকে তাহা হইলে সে কখন পুনরায় বিবাহ করিতে পারে না। যদিও "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্র পিণ্ড প্রয়োজনং" তথাপি বন্ধ্যা স্ত্রী সত্ত্বে বিবাহ করা প্রণয়রীতি বিরুদ্ধ। অকৃত অপরাধে স্ত্রীর মনে ক্লেশ দেওয়া উদারচেতা ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ ক্রমশঃ পিণ্ডলোলুপ লোকের সংখ্যা হ্রাস হইতেছে, এমত স্থলে পিণ্ডার্থ লোকের বিবাহ না করিবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ও অন্ততঃ তাহাই বাঞ্ছনীয়। তবে রুচি বিশেষে কার্য্য হইয়া থাকে।

সমান গোত্র ও সমান প্রবরাদিতে বাঙ্গালির বিবাহ হয় না, ইহা যে একটি উত্তম নিয়ম তাহাতে সন্দেহ নাই। সগোত্র ও সবংশোদ্ভব পুত্র কন্যার বিবাহ জাত সন্তানাদি বলিষ্ঠ ও দীর্ঘায়ু হয় না। যবনেরা উক্ত নিয়মানুযায়ী কার্য্য করেন না, বরং তাঁহাদের যত নিকট সম্বন্ধীয়ের সহিত বিবাহ হয় তত গৌরবান্বিত জ্ঞান করেন। কিন্তু ইহার বিষময় ফল কোথাও যায় না। ভদ্র ইংরাজদিগের মধ্যে এই বিরুদ্ধ বিবাহ নিষিদ্ধ আছে। তিন চারি পুরুষ পর্য্যন্ত তাঁহারা ত্যাগ করেন, এবং অতি নিকট সম্পর্কীয় সবংশোদ্ভব পুত্র কন্যার বিবাহ যে অনিষ্টদায়ক তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন। হুপার কহিয়াছেন "Marriages contracted too early or too late in life, or between parties too nearly allied in blood, or presenting great disparites of age, are open to this objection."

অযোগ্য পাত্রে কন্যাদান ও বিশেষ দুঃখের বিষয়, কিন্তু বঙ্গে আজ কাল তাহার বৃদ্ধি হইতেছে। পূর্ব্বে ভারতে স্বয়ম্বর প্রথা প্রচলিত ছিল, কন্যাগণ স্বয়ং মনোনীত পাত্রে আত্ম সমর্পণ করিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ

কালচক্রে সে নিয়ম অন্তর্হিত হইয়াছে বরং তাহার বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। মহাত্মা বল্লাল সেন এই মহানিষ্টদায়ক কার্য্যের প্রধান কারণ। যোগ্য মৌলিকপাত্রত্যাগ করিয়া লোক মূর্খ সও কুলিনকে কন্যা দান করে। লোকাচার দেশাচার ত্যাগ করা নিতান্ত সহজ নহে, সুতরাং উক্তমতের বিরোধি থাকিলেও সহসা সে বাসনা কার্য্যে পরিণত হয় না। এই কৌলিন্য প্রথা যে কত দিনে অন্তর্হিত হইয়া দেশের অশেষবিধ মঙ্গল সাধিত করিবে, তাহা কে নির্ণয় করিতে সক্ষম? পূর্ব্বে যাঁহারা ধার্ম্মিক ও বিবিধ গুণ সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন তাঁহাদিগকেই সম্মান সূচক কুলিন উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে।

আচরো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠাতীর্থ দর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তি তপোদানং নবধা কুল লক্ষণং॥

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই উপাধি কুলিন সন্তানেরা পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত হওয়াতেই বিশেষ অনিষ্টদায়ক হইয়া উঠিয়াছে।

উপসংহার কালে আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে বঙ্গীয় বিবাহ সম্বন্ধে যে সমস্ত দোষ প্রদর্শিত হইল তৎপ্রতি ব্যক্তি মাত্রেরই দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ভবিষ্যতে যাহাতে ঐ সমস্ত দোষ অপসারিত হয় ও বিবাহে ঘরে ঘরে সুফল ফলে তৎপক্ষে যত্ন করা উচিত। যে স্ত্রীকে লইয়া একদিন নহে যাবজ্জীবন কাটাইতে হইবে, যে স্ত্রীর উপর সংসারের সুখ সচ্ছন্দতা নির্ভর করে এবং যে স্ত্রী ইহ জীবনের একমাত্র সহচরী তাহার নির্ব্বাচন যে উত্তমরূপে করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

মায়াবতী। (Opera) শ্রীরাধানাথ মিত্র প্রণীত ও কাশীশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সুরলয়ে গঠিত। কর-প্রেস্ কলিকাতা।

মায়াবতী কবিবর কবিকঙ্কণের কালকেতু ও ফুল্লরাকে অবলম্বন করিয়া বিরচিত। নিবিড় কাননে ভগবতীর আবির্ভাব, জয়া ও বিজয়া কর্ত্তৃক তাঁহার তথায় আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা, এই অতিরিক্ত দৃশ্য ইহাতে সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে। সামান্য গীতিনাট্যের ন্যায় ইহাতে প্রেমমাখা কতকগুলি অনর্থক সঙ্গীত নাই, অধিকাংশ গীত গুলিই ভগবতীর স্তবে পূর্ণ। গানগুলি ভাবগ্রাহী ও সরল হইয়াছে, আমরা নিম্নে তন্মধ্য হইতে একটী গীত উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

গীত।

বেহাগ—পেস্‌টা।

মা আমার ভক্ত জনে ভুলে না কখন।
কিরাত-পতি হ'ল ভুপতি ভজি ও রাঙ্গাচরণ।
ভক্তিভাবে ডাকলে পরে,
মা কি তারে ভুল্‌তে পারে
মায়াবতী মায়ায় করে, চলিতেছে এ ভুবন।
দীন হীন ধনবান,
তাঁহার সর্ব্ব সমান,
অজ্ঞানের হয় জ্ঞান, ও পদ লয়ে স্মরণ।

প্রেমিকা ও মানিনী।

জাগতিক জীব সম্প্রদায় দুই ভাগে বিভক্ত, যথা স্ত্রী ও পুরুষ, সেই বিভিন্নতা প্রাকৃতিক নিয়মের একটী অখণ্ডনীয় ফল। আবার স্ত্রী পুরুষ মধ্যে আকৃতিগত বিভিন্নতা যেরূপ লক্ষিত হয়, প্রকৃতিগত বিভিন্নতাও তদ্রূপ। পুরুষহৃদয়ে যে সকল ভাব আধিপত্য লাভ করিয়াছে, নারীহৃদয়ে তাহা নাই; পক্ষান্তরে নারীহৃদয়স্থ ভাব সকলও পুরুষান্তঃকরণে স্থান প্রাপ্ত হয় না। এই বিভিন্নতা কেবল মনুষ্যজাতির নহে, উহা ইতর প্রাণী মধ্যেও বর্ত্তমান। কিন্তু এ কথা আমাদের আলোচ্য নহে, আমাদের উদ্দেশ্য মানবীহৃদয়স্থ দুই একটী ভাবের সমালোচন করা। শীলতা, সাংসারিক কার্য্য লিপ্ততা, রোগীর সেবা, ভয়শীলতা প্রভৃতি যে কতিপয় প্রবৃত্তি রমণীগণের প্রধান হৃদয়গত ভাব তাহা প্রায় সকল দেশের রমণীতেই আছে। যদিও দেশ ভেদে ও সুশিক্ষা ফলে কতিপয় রমণীদিগের স্বভাবগত ভাব সম্পূর্ণভাবে বিপরীত বলিয়া বোধ হয়, তথাপি সাধারণতঃ উহা নারী স্বভাব সুলভ। সে যাহাই হউক, অদ্য আমরা রমণীগণের অন্য বিষয় ত্যাগ করিয়া প্রেমিকা ও মানিনীর তুলনা করিব।

প্রণয় অনুরাগের একান্ত বশম্বদ অনুচর। যেখানে অনুরাগ সেই খানেই প্রণয়; প্রণয় অনুরাগকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, এবং অনুরাগও প্রণয়কে ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্ত থাকিতে পারে না। স্ত্রী পুরুষ উভয়ের অনুরাগ বিমিশ্রণে প্রণয়ের মাখামাখি, একথা সর্ব্ববাদি সম্মত। অবসাদ উত্তেজনার অবশ্যানুবর্ত্তী। অনুরাগের অবসাদকেই মান বলিব। অতএব অনুরাগে মান, প্রণয়ে মান অবশ্যম্ভাবী। আমাদিগের আদরিণীর সুরসিক পাঠক মহাশয়েরা বলিবেন যদি অনুরাগের অবসাদের নামই মান, তবে মানই কি প্রণয়ের পরিণাম? না—তা নয়, অনুরাগের অবসাদ মানকে ঘুচাইয়া অনুরাগকে দ্বিগুণ উত্তেজিত করিতে সোহাগ নামে এক প্রকার পীযূষ আছে। অনুরাগের অবসাদের পরই প্রেমিকে

যত্নসহকারে সেই সুধা পান করিয়া অনুরাগের উত্তেজনা বৃদ্ধি করেন। অতএব পাঠকগণ, উত্তেজনার অবসাদ আছেই আছে। তবে অনুরাগও প্রণয়ে মান কেন না থাকিবে। নারীস্বভাব পুরুষ অপেক্ষা লঘু, সুতরাং সহজেই উত্তেজিত, এবং সহজেই অবসাদিত হয়। তাহাতেই পুরুষ অপেক্ষা নারীর মান ক্ষণসম্ভাবী। যে যাহাতে বেশী অনুরক্ত সেই তাহার বিশেষণ তাহাতে সন্দেহ নাই, এই জন্যই নারী মানিনী।

কাহার কাহার মতে মানই প্রণয় উত্তেজনার মূল। তাঁহারা বলেন মানেই বিচ্ছেদ, এবং বিচ্ছেদান্তর মিলনেই অতুল সুখ। কিন্তু আমরা সেরূপ প্রণয়ের কথা বলিব না। আমাদের আদর্শ প্রথম শ্রেণীর প্রণয়; যাহা আদর্শ, তাহা যতদূর শ্রেষ্ঠ করা যায় করা উচিত, সুতরাং আমরা ঘরে ঘরে যেরূপ প্রেমিকা আছেন তাহাদের সহিত নহে;—প্রথম শ্রেণীর প্রেমিকাদের সহিত মানিনীগণের তুলনা করিব। যাঁহারা মানকে প্রণয়ের অঙ্গ বা শাখা বলেন,আমরা তাঁহাদের সম্পূর্ণ না হউক কতক বিরোধী। মান না থাকিলে কি প্রণয়ে জমাট হয় না? আলোকের পর অন্ধকার না থাকিলে কি আলোকের সুখানুভব হয় না? শীতের অভাবে বসন্তের সুখ কি অনুভবনীয় নহে? কেনই নহে?—তবে যে ইহলোক অন্তরে আমরা অনন্ত ধামের কথা শুনিতে পাই, সেখানে যে চিরবসন্ত,চির সুধাংশু বিরাজ করিতেছে। সে অনন্ত সুখ। মান বিহীন প্রণয়ে স্বর্গ সুখ।

স্ত্রীজাতির হৃদয়স্থ অন্যান্য বৃত্তির মধ্যে মানও একটী প্রধান বৃত্তি। মানিনী নহেন, এমন স্ত্রীলোক যে জন্মিয়াছেন তাহা এক প্রকার অসম্ভব। অল্প হউক অধিক হউক মান নারীহৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেই করিয়াছে। পৃথিবীর অনেক কবিগণ স্ত্রীজাতির এই বৃত্তি লইয়া অতুল্য কাব্য রত্নের সৃষ্টি করিয়াছেন। কবিবর জয়দেব গোস্বামী এই মানিনী চরিত্র যথার্থ বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার রাধিকা মানিনীর প্রধান আদর্শ। কিরূপে মানিনী হইতে হয়, রাধিকা তাহা সম্পূর্ণরূপে জানিতেন। রাধিকা প্রণয়িনীর পরাকাষ্ঠা, আবার মানিনী প্রধানা। কিন্তু মানের তরল তরঙ্গে রাধিকা যতবার সানন্দে দেহ ঢালিয়া দিয়াছেন, তাহার অর্দ্ধেক বারও হৃদয়গত জ্বলন্ত প্রণয়-বহ্নির উত্তাপ কাহাকেও দেখান নাই। বস্তুতঃ

আমরা রাধার প্রণয়ের উত্তপ্ততা অধিক দেখিতে পাই না, কিন্তু মানের দেদীপ্যমান মূর্ত্তি উত্তমরূপে দেখিতে পাই। কবিরা যাহাই বলুন "মানিনী যে প্রকৃত প্রেমিকা নহে" একথা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও সম্পূর্ণ মিথ্যাও নহে। যাহার কথায় কথায় মান, কথায় কথায় বিরক্তি তাহাকে কি বলিয়া প্রকৃত প্রেমিকা বলিব? শ্রীরাধা মানময়ী ও প্রেমময়ী। এই দুইটী বিশেষণ মধ্যে প্রথমটীই অধিক সঙ্গত। পাঠক! হয়ত তুমি বলিবে, যে সেই প্রেমোচ্ছাসিত নয়নে অর্দ্ধবঙ্কিম গ্রীবায় চারুঅঙ্গ মৃদু সঙ্কোচন করিয়া মান করিতে জানে না, সে আবার প্রেমিকা কি? হইতে পারে কাল স্রোতে সেরূপ মানের চারু পরিবর্ত্তন ক্ষণিক সুখপ্রদ, কিন্তু যে প্রেমিকারা কথায় কথায় স্বামীকে পদপ্রান্ত স্পর্শ করাইতে বাসনা করেন, তাঁহাদিগের চরণে আমরা দূর হইতে নমস্কার করি।

উচ্চ শ্রেণীর প্রণয়ে মান নাই, যাহাদের হৃদয়ে প্রেমের পরিতৃপ্তি নাই তাহাদিগের আবার মান কোথায়? বিতৃষ্ণার প্রণয়ে হয়ত মান আচার বিশেষ, যে সকল প্রেমিকার প্রণয় বিস্বাদকর হইয়াছে মান স্বরূপ রুচি প্রদায়ক বস্তু বুঝি তাহাতে কিয়ৎপরিমাণে স্বাদ সম্পাদন করে! কিন্তু যাহাদিগের ক্ষুধা মিটে নাই, তাহাদিগের আচারের আবশ্যকতা কি? আমাদের জনকনন্দিনী সীতার এ মান ছিল না, প্রকৃতই প্রণয় সমালোচনা করিলে রাধিকা অপেক্ষা সীতার প্রণয় অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। রাধার পদে পদে মান, কিন্তু সীতার মান দেখিতে পাই না। তুলনাতে সীতার প্রণয়ের অংশ রাধা অপেক্ষা অনেক গুরু।

আবার দেখা যায় যে মানের সহিত প্রণয়ের কোন সংস্রব নাই। বরং বিরাগের সহিত অনেকটা সংস্রব। দেখ দেস্‌দিমোনায় মান ছিল না, কিন্তু ওথেলোয় ছিল, তিলোত্তমার অতুলনীয় প্রেমে মান নাই, কিন্তু জগৎ সিংহের প্রণয়-ছায়ায় মানের দেদীপ্যমূর্ত্তি আছে। তিলোত্তমা জগৎ সিংহের নিকট শতাংশে নিগ্রহ সহ্য করিলেন, তথাপি কিছুমাত্র মান করেন নাই, এমন কি অভিমানও হৃদয়ে ক্ষণেক আধিপত্য বিস্তার করিতে সাহস করে নাই। মানিনীর হৃদয়ে প্রেমোদ্বেলন সতত বিলোড়িত হয় না, কিন্তু প্রেমিকার হৃদয়ে তাহা অনবরত ঘোর তরঙ্গমালা দ্বারা বিশোভিত

হইয়া থাকে। মান ত নিকৃষ্ট অন্তঃকরণের পরিচায়ক, যে প্রেমিকা মানে পরিতুষ্ট, তাহার প্রেমের গভীরতা কোথায়? তাহার প্রণয়ের স্থায়িত্ব থাকিলেও আমরা তাহাকে জলবুদ্বুদ বলিব। বুদ্বুদ স্বরূপ প্রণয় সম্পন্না যোষিদ্বর্গের মান থাকিতে পারে, কিন্তু যাহাদের প্রণয় সাগরসদৃশ, যাহা অকুল পাথার, যাহার পারাপার নির্ণয় হয় না তাহাতে মান নাই।

যখন সূর্য্যমুখী দেখিল যে নগেন্দ্রের হৃদয়ে আর তাহার ছবি জাগে না, কুন্দনন্দিনী তাঁহার হৃদয়াকাশের পূর্ণ শশধর, তখন সূর্য্যমুখীর হৃদয়ে অভিমান হইয়াছিল কি না, জানিনা,—কিন্তু মান ছিল না; আর মান ছিল না বলিয়াই পুনর্ব্বার সুখিনী হইয়াছিলেন। যখন নগেন্দ্র সূর্য্যমুখী প্রদত্ত ঔষধ নিক্ষেপ করিয়া বহির্ব্বাটীতে যাইয়া অন্যায় রূপে ভৃত্যকে প্রহার করিলেন, তখন সূর্য্যমুখী মনে করিলে একটি উত্তম মান করিতে পারিতেন। কিন্তু সূর্য্যমুখী প্রেমিকা, মানিনী নহেন, সুতরাং মান করিলেন না। সূর্য্যমুখীর প্রণয় যদ্যপি অর্দ্ধবিকশিত হইত, তাহা হইলে তিনি আমাদিগের মানিনীবর্গের মান রাখিতে পারিতেন, কিন্তু সূর্য্যমুখী তাহা পারিলেন না। সূর্য্যমুখীর হৃদয়ের অনেক স্থান অসম্পূর্ণ ছিল; সূর্য্যমুখী তাহাই প্রণয়ে পূর্ণ করিতে পাগল, তাঁহার মান করিবার অবকাশ কই?

প্রকৃতই মানিনী,—প্রকৃত প্রেমিকার আদর্শ নহে, ভালবাসিয়া প্রাণকে উন্মত্ত করিলে যে সুখ তাহা মানিনীতে নাই, মানব যে প্রণয় লইয়া পাগল, যে প্রণয় মানবের মৃতসঞ্জীবনী, যে প্রণয় মনুষ্যকে পৃথিবীতে স্বর্গের পূর্ব্বাস্বাদ প্রদান করে, সে সুখ মানিনীকে ভালবাসিয়া পাইবার প্রত্যাশা বিন্দুমাত্র করা যায় না। তবে রাধিকার ন্যায় মানিনী রমনীর, শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় চরণে বিলম্বিত প্রেমিক হইয়া শ্রীচরণে অনন্ত প্রেম দেখাইতে পারিলে কতকটা হইতে পারে।

"স্থল কমল গঞ্জনং, মম হৃদয় রঞ্জনং,
জনিত রতিরঙ্গ পরভাগং।
ঘন মসৃণ বাণি, করবাণি চরণদ্বয়ং,
সরসল সদলক্তক রাগং।"

যিনি ঐ চরিত্রের লোক, ঐরূপ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার নিকট মানিনীর প্রতি-

পত্নি হইতে পারে, প্রেমিকা বলিয়া গননীয়া হইতে পারেন, কিন্তু অন্যত্রে নহে, মানিনীকে কে প্রকৃত প্রেমিকার গৌরব প্রদান করিবে ?

বিধবা রমণী।

১

আঁধার নিশিতে আঁধার গগণ,
তারাকারা ফুল শোভিছে কেমন,
নিথর রজনী নিথর ভুবন,
নিরবে জাহ্নবী বহিতেছে ধীরে।

২

ঘুমায় দম্পতী গৃহের ভিতর,
ঘুমায় নীরবে বিশ্ব চরাচর,
নিরিবিলি ঝিঁঝিঁ ডাকে নিরন্তর,
যোগে মগ্ন যোগী আপন কুটিরে।

৩

এ হেন সময়ে স্রোতস্বিনী তীরে,
কাঁদিতেছ বামা কে তুমি অধীরে,
কেন দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছ ধীরে,
গগণে, সলিলে হেরিছ কিবা ?

৪

নবীন জীবন, নবীন বয়সে,
কেন বসি আহা এমন বিরসে,
কমলিনী কেন ত্যজিয়া সরসে,
শীলায় যাপন করিছে দিবা ?

৫

আহা মরি মরি কি দেখিনু হায়,
আলুথালু কেশ মুখে শোভাপায়,
পূর্ণ শশী যেন কাদম্বিনী গায়,
অথবা কমলে ভ্রমর চয়।

৬

বসন ভূষণে নাহিক বিলাস,
সদত সুদীর্ঘ বহিছে নিশ্বাস,
নাহি মরি কোন সুখে অভিলাষ,
অনন্ত অতৃপ্তি হৃদয় ময়।

৭

পাগলিনী প্রায় বসি নিরজনে,
কাঁদিতেছে বামা আকুল নয়নে
ফেলে দীর্ঘশ্বাস কতই সঘনে
অভাগিনী দুঃখ কে করে গণনা ?

৮

কিছুক্ষণ পরে মুছি অশ্রুজল
মুছি শোক মাখা বদন কমল
বলিলা রমণী হইয়া বিহ্বল
আধ কাঁদস্বরে আকুল জীবনা।

৯

"কেন প্রাণনাথ অধীনীর ধন,
অভাগিনী প্রাণ প্রাণের রতন
কাঙ্গালিনী করি—ত্যজিলে এমন,
কঠিন পাষাণে বাঁধিয়া হিয়া ?"

১০

"তুমি না আমার সেই প্রাণেশ্বর,
বিরহে কাঁদিত যেই নিরন্তর,

তোমার কোমল প্রেমের অন্তর,
ভুলেছে আমায় কোথায় গিয়া।”

১১

বুঝেছিমা তব মনের বেদন,
অনাথিনী তুমি বঙ্গে একজন,
ক’রনা ক’রনা আরগো রোদন,
ভাসিয়া অনন্ত দুঃখের নীরে।

১২

কাঁদিলে এখন যাবে না যাতনা,
বিষাদে হৃদয় হইবে বিমনা,
অনাথিনী কর অনাথ সাধনা,
সে যাতনা ক্রমে যাইবে ধীরে।

১৩

আহা মরি বঙ্গ বিধবা রমণী,
তব সম দুখী না ধরে অবনী,
চির দুঃখময়ী বিষাদ আননী,
তুমি ভাগ্য দোষে ভারতে এবে।

১৪

চিরবৈরী তব পোড়া দেশাচার,
অবলা নিধনে নাহিক বিচার,
পরুষ পুরুষ বিদিত সংসার,
বিধবার দুঃখ কাঁদে না ভবে।

১৫

নিদ্রা দেবী তারে গাঢ় আলিঙ্গনে,
অনাথিনী ভাবি নাহিক যতনে,
সদা যায় নিশি স্বপনে স্বপনে,
নাথের মূরতি দেখিয়া তার।

১৬

উদিলে গগণে পূর্ণশশধর,
উথলিয়া উঠে যেমতি সাগর,
কেঁদে উঠে বেগে তেমতি অন্তর,
স্বপনে নেহারি প্রাণ আধার।

১৭

সতী দাহ যবে ছিল এ ধরায়,
একেবারে শান্তি পেত সমুদায়,
এখন সতত হৃদয় জ্বালায়,
জ্বলিয়া মরিছে বিধবাগণে।

১৮

ভাসিছে পুরুষ সুখের সাগরে,
রমণীর সুখ মুখেতে না করে,
আত্ম সুখেরত পুরুষ অন্তরে,
রমণীর সুখ জাগিবে কেমনে।

১৯

প্রণয়িনী হ'তে মন অভিলাষ,
নাহি পুরে,—পুন করিতে বিলাস,
বারনারী প্রেম কর সবে আশ,
লুকান পিরীতে মজাও মন।

২০

কিন্তু অভাগিনী বঙ্গের ললনা,
পতির নিধনে বিবাহ বাসনা,
কোন প্রাণে হায় করিতে পারে না,
সহিবে যাতনা যাবত জীবন?

২১

প্রণয়িনী গতে, পুরুষ যখন,
পুন প্রেমপাশে হয় নিবন্ধন,

অবলা রমণী কেন বা তখন,
পাবে না বিবাহ করিতে ভবে?

২২

কেন রে পুরুষ কেন রে তখন,
কতই অন্যায় দেখাও কারণ,
করি উচ্চরব কত অগণন,
বিধবার হৃদি ভাঙ্গরে তবে?

২৩

আপনার স্বার্থ বুঝবা যেমন,
রমণীর কেন বুঝনা তেমন,
কেন বা রমণী হইবে দহন,
কাতরে সদত পতির নিধনে?

২৪

তব যদি থাকে, সুখ অভিলাষ,
রমণীর কেন নাহিক সে আশ,
তুমি সুখে সদা করিবে বিলাস,
কেন রবে নারী বিষাদ মনে?

সুধারাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

রাত্রি আন্দাজ চারিটার আমল, সুধারাম নিদ্রা যাইতেছেন, একজন পুলিশ্‌ দারগা, দুজন জমাদার, আটজন পাহারাওলা সুধারামের শয়ন কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া সুধারামকে ঠেলা দিল; একসের আটা জলযোগী অন্যূন পাঁচ ফিট পাঁচ ইঞ্চ্‌ দেহী পুলিশ কনষ্টেবলের ঠেলা একজন

ষষ্ঠাবর্ষী পলিত দেহ বৃদ্ধের উপর কতদূর সাংঘাতিক, পাঠকবর্গ! একবার ভাবিয়া দেখিবেন ;—সুধারামের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল ; ঘুম ভাঙ্গিবামাত্র দারগা সাহেব সুধারামের হাতে হাতকড়ি দিয়া বাবুর অন্দর মহলে লইয়া গেল ;—অন্দরে বাবুর শয়নগৃহে বাবুর ছিন্নকণ্ঠ মৃতদেহ পতিত ;—বাবুর গৃহিনী নিকটে বসিয়া রোদন করিতেছেন ;—অবগুণ্ঠণে বদন আবৃত—দারগার জিজ্ঞাসামাত্র বলিলেন "হাঁ এই লোকটী, এঁর সঙ্গে আর একজন যেন ছিল। দুজনের পায়ের শব্দ পাইয়াছিলাম।"

দার। ভাল ক'রে দেখুন——

গৃহি। হাঁ—আমি ঠিক্ বলিতেছি, এই লোকটীই বটে।

দারগা সাহেব একজন জমাদারকে থানায় পাঠাইয়া দিয়া বলিয়া দিলেন "চাকরটাকে সংবাদ দাতা করিয়া ৩০২ ধারার অপরাধে প্রথম এত্তালা লিখ যাও, আর আমি যে কয়টা প্রমাণ পাই লইয়া যাইতেছি।" বাবুর চাকর দীননাথ দাস দারগার নিকট এজাহার দিল ;—"রাত্রি দশটার সময় বাবু বাটীতে শয়ন করিতে যাইলে, আমি ও অতিথি একত্র শয়ন করি, রাত্রি দুপ্রহর দুইটার সময় অতিথি বিছানা হইতে উঠিয়া বাটীর দিকে যাইতেছিল, আমার জিজ্ঞাসায় বলিল "তাহার পেটকামড়াইতেছে বাহিরে যাইবে। আমি বলিলাম বাড়ীর ভিতরের পথ, ওদিকে যাইও না। আমার কথায় বাহিরের দিকের দ্বারে গেল ;—আমি ঘুমাইয়া গেলাম, বলিতে পারি না তাহার কতক্ষণ পরে গিন্নি ঠাকরুণ চীৎকার করিয়া উঠিলেন, গিয়া দেখি বাবুর মাথা কাটা পড়িয়া আছে ;—দৌড়িয়া থানায় সংবাদ দিলাম। অতিথিকে সন্দেহ হয়।" দারগা সাহেব ডায়েরী লিখিবার জন্য সুধারামের নাম, ধাম জিজ্ঞাসা করায় সুধারাম নিরুত্তর—কনষ্টেবল প্রহার ক'রে, সুধারাম মাটিতে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করেন,—চক্ষুর জলে মাটি ভিজিল। সুধারাম কথা কহিলেন না। কিই বা বলিবেন? অনেক পীড়নে আপন নাম ধাম বলিলেন। রাত্রি শেষ হইয়াছে এমন সময় থানায় গেলেন ;—যে রাত্রিটুকু ছিল, হাজতে নিদ্রা গেলেন। যে মনে পাপ নাই, সে মনে ভয় থাকে না ; দৈবদুর্ঘটনায় দুশ্চিন্তা আইসে বটে কিন্তু প্রভুতাস্থাপন করিতে পারে না।

দারগা সাহেব ছয় ঘণ্টার মধ্যে একটা খুনী মোকর্দ্দমার তদারক সমাপ্ত করিয়া আসামী ও হরিচরণ বাবুর লাশ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট চালান দিল। সিবিল সার্জ্জন মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া রিপোর্ট দিলেন;—"মৃত ব্যক্তির গলদেশ ছুরিকা দ্বারা কর্ত্তিত; পুলিশের রিপোর্ট মত খড়্গাঘাতে নহে, যে খড়্গাখানি মৃতদেহের সহিত প্রেরিত হইয়াছিল তাহার আঘাতে মৃত্যু হইলে কখন এরূপ অল্পায়ত ক্ষত হইত না, অবশ্য অধিক প্রশস্ত হইত। অধিকন্তু কণ্ঠনালীর উপর ছুরিকা চাপিয়া বসাইলে ক্ষত যেরূপ বাম দিকে গভীর হয়, সেইরূপ আছে।" ডাক্তার সাহেবের রিপোর্ট পাঠ করিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব পুলিশকে বিশেষ সতর্কতা সহিত তদন্ত করিবার আদেশ দিলেন। এদিকে সংবাদ পত্রে সুধারামের নরহত্যার সংবাদ প্রচারিত হইল। সুধারাম কখন পুলিশের হস্তে, কখন জেল মধ্যে। পুলিশ যেদিন তদারক চূড়ান্ত করিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আসামীকে উপস্থিত করে, সে দিন একটী জাল মোকর্দ্দমায় হাইকোর্ট হইতে একটী উকিল আসিয়া সেই মোকর্দ্দমায় বক্তৃতা করিতেছিলেন। খুনী মোকর্দ্দমার অনুরোধে জালের মোকর্দ্দমা সে দিন মুলতুবী রহিল। মাজিষ্ট্রেট খুনী মোকর্দ্দমা আরম্ভ করিলেন;—আসামীকে দেখিবামাত্র যেন কোন রজনীর স্বপ্ন দৃষ্ট মূর্ত্তির স্মৃতি উকীল বাবুর মনে আসিল;—তখনই তিনি চিনিলেন। তাঁহার মনে এক অভূতপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল;—সে ভাব কে প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে? আমাদিগের মনে কখন সেরূপ ভাবের আবির্ভাব হয় না, আমরা কখন তদ্রূপ অবস্থায় অবস্থাপিত হই নাই; কেমন করিয়া বর্ণনা করিব, তবে এই মাত্র আমরা দেখিয়াছিলাম বলিতে পারি যে উকীল বাবুর ললাটে সেই শীতকালে নীহার কণিকার ন্যায় ঘর্ম্ম বিন্দু শোভা পাইয়াছিল, চক্ষুদ্বয় ক্ষণেক স্পন্দহীন হইয়া উঠিয়াছিল; সর্ব্বশরীর স্বেদসিক্ত ঈষৎ কম্পিত হইয়াছিল; দুর্দ্দম ঝটিকা প্রবাহ যেমন কোনমতেই বাধা মানে না, সেইরূপ তাঁহার নিশ্বাস বেগে বহিতেছিল; সেই ঝটিকা প্রবাহের সঙ্গেই অশ্রুবর্ষণ ও দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। তিনি অশ্রুমোচন করিয়াই আপন মোহরারকে ষ্ট্যাম্প আনিতে বলিলেন, মোহরার ষ্ট্যাম্প আনিল, তাহা দ্বারা ওকালত নামা লেখাইয়া

সুধারামকে এক কলম কালী দিয়া উকীল বাবু বলিলেন "মহাশয়! আপন দস্তখৎ করুন।"

সুধা। আমার এখন সামর্থ নাই যে মহাশয়ের বেতন দি!

উকী। (সাশ্রুনয়নে, অৰ্দ্ধস্ফুট স্বরে) মহাশয়ের এক পয়সা ব্যয় হইবে না।

সুধারাম আপন নাম স্বাক্ষর করিলেন, উকীল বাবু স্বাক্ষর দেখিয়া কোনমতে অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না। অতি কষ্টে ধৈৰ্য্যধারণ করিলেন, পুলিশ রিপোর্ট আদ্যোপান্ত দেখিলেন। প্রধান সাক্ষী হরিচরণ বাবুর স্ত্রীর এজেহার লওয়া হইল; ভৃত্য দীন "পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া" ইত্যাদি অঙ্গীকার বাক্য পাঠ করিয়াই শুকাইয়া গেল;—কাঁপিতে লাগিল—মুখে বাক্য স্ফূর্ত্তি নাই। দীন নাপিত প্রাচীন লোক, হরিচরণ বাবুর অনেক কালের চাকর, বড় ধৰ্ম্মভীরু।—উকীল বাবু বলিলেন "দেখ দীন, বোধহয় তোমার ছেলে পিলে আছে, সাংসারী লোক! কাহার শিখান মতে কোনমতে মিথ্যা বলিও না; উপরে ধৰ্ম্ম আছেন, সম্মুখে ধৰ্ম্মাবতার; মিথ্যা বলিয়া এখানে পরিত্রাণ পাইতে পার কিন্তু "তাঁহার" নিকট অব্যাহতি পাইবে না। কি জান—সত্য বল।" দীন হলফ লইয়া মিথ্যা বলিতে পারিল না;—বলিল "হরি বাবুকে কে খুন করিয়াছে আমি দেখি নাই;—বাড়ীর মধ্যে গোলমাল শুনিয়া গিয়া দেখিলাম বাবু খুন হইয়াছে, তাঁহার গলা কাটা, মাঠাকুরাণী কাঁদিতেছেন। অতিথি ব্রাহ্মণ আমার সঙ্গে এক বিছানায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিল, আমি জাগ্রেত ছিলাম; অতিথি ব্রাহ্মণ রাত্রির মধ্যে বিছানা ছাড়িয়া কোথাও যায় নাই।" প্রশ্ন করায় বলিল,—পুলিশের উপদেশ মতে আমি অন্যরূপ বলিয়াছিলাম, না বলিলে পুলিশ আমায় ছাড়ে না।"

উকী। তোমার গিন্নি ঠাকুরাণীর স্বভাব—চাল চলন কেমন?

দীন। হরি বাবুর অনেকদিন নেমক খেয়েছি ব'লে মিথ্যা কথা বলতে পারবো না। গিন্নি ঠাকরুণের স্বভাব ভাল ছিল না;—সিদ্ধেশ্বর বাবুর সঙ্গে কথা বার্ত্তা কহিতেন, হাসিতেন বলে বাবুর সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া হ'তো।

উকী। তার পর ;——

দীন। সন্ধ্যার পর বাবু বাহিরে আসেন, আমি বাড়ীতে তামাক আন্‌তে গিয়ে দেখি সিধু বাবু বাড়ীর মধ্যে।

উকী। সিধু বাবুর বাড়ীতে আসার কথা হরি বাবু জান্‌তেন ?

দীন। জান্‌তেন বোধহয়, একদিন সিধু বাবুর একখানা পত্র গিন্নি ঠাকরুণের নামে আসে, বাবু সেইখানা দেখে মাঠাকরুণকে বকেন ;—কত কি বলেন।

উকীল বাবু মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবকে স্বয়ং ঘটনা-ক্ষেত্রে যাইয়া তদন্ত করিবার জন্য নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিলে, সাহেব সম্মতি দিলেন। উকীল বাবুর সুধারাম সেদিন অব্যাহতি পাইলেন। সুধারাম আদালত হইতে বাহিরে আসিতেছেন, কোথায় যাইবেন, কাহার আশ্রয়ে থাকিবেন চিন্তা করিতেছেন ; একবার ভাবিতেছেন, কেনই বা উকীল আসিয়া আপত্তি করিল, যাহা হইবার আজই হইয়া যাইত। যাহা অদৃষ্টে আছে কেহ ঘুচাইতে পারিবে না। এমন সময় উকীল বাবু খুঁজিতে খুঁজিতে আসিয়া সুধারামকে ধরিয়া বলিলেন "মহাশয়, কোথায় ছিলেন? আপনাকে অন্বেষণ করিতেছিলাম।"

সুধা। মহাশয়, আমি অদ্য কোথায় থাকিব, কি খাইব, তাহার সংস্থান নাই। মহাশয় আমার জন্য এত করিলেন কিছুই না দিতে পারায় বড় লজ্জিত হইয়াছি, এজন্যই দেখা না করিয়া ভাবিতেছিলাম কি করিব।

উকী। মহাশয়কে ত তখনই বলিয়াছি একটী পয়সা আপনার খরচ হইবে না, তবে সঙ্কোচ করিতেছেন কেন ?

সুধা। মহাশয় দিগের ব্যবসায়—কিছু না দিলে চলিবে কেন ?

উকী। আমার সঙ্গে আসুন——

সুধা। বাবুর বাড়ী কোথায় ?

উকী। পরে বলিব——

সুধারাম উকীল বাবুর গাড়ী করিয়া একটী বাড়ীতে গেলেন, সে বাড়ীটী উকীল বাবুর নহে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল ; একটী মোকর্দ্দমার একজন জমীদারের পক্ষে বক্তৃতা

করিবার জন্য ভাগলপুরে গিয়াছিলেন। যে বাড়ীটীতে তিনি গেলেন সেটী সেই জমিদারের বাসা বাড়ী;—সেখানে জমীদারের অনেক চাকর খানসামা আছে, উকীল বাবুর নিজের সঙ্গেও একজন ব্রাহ্মণ একজন চাকর ছিল কিন্তু সুধারামকে সঙ্গে লইয়া গিয়া আপন হস্তে তাঁহার পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিলেন উকীল বাবু সুধারামের পাদ-স্পর্শ করিবামাত্র প্রাচীন ব্রাহ্মণ শতবার "বিষ্ণবেনমঃ" উচ্চারণ করিয়া বলিলেন "মহাশয়! আপনি ব্রাহ্মণ এরূপ করিলে আমার পাপ আছে, সকল শরীরেই ব্রাহ্মণ্য দেব আছেন। উকীল বাবু আর ধৈর্য্যধারণে সমর্থ হইলেন না, সেই ধৃত পদে পতিত হইয়া বলিলেন " পিতা আমি আপনার সেই বসন্ত, দারুণ দুর্ভিক্ষ-পীড়নে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যখন স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া আসেন, পথে ধরণীধর বাবুর বাটীতে জননীকে ও আমাকে রাখিয়া ছিলেন; তাঁহারই আশ্রয়ে থাকিয়া আমি লেখা পড়া শিখিয়া এক্ষণে ওকালতী কার্য্য করিতেছি, এ হতভাগ্যের উপার্জ্জিত অর্থ জননী দেখিতে পান নাই; তিনি আজি দুই বৎসর ইহলোক লীলা সমাপ্ত করিয়াছেন। মায়াপুরে আপনার পূর্ব্বনাম বজায় করিয়াছি; আপনার পৈতৃক কীর্ত্তি-কলাপ পূর্ব্ববৎ চলিতেছে;—দীন দরিদ্র বিপন্ন অনাথদিগকে পূর্ব্ববৎ অন্ন বস্ত্র দান করিতেছি। কিন্তু বিধাতা কয়জনকে জগতের সুখ পূর্ণ আশ্রয় ভোগ করিতেদেন? যে আমাকে দিবেন! আপনি যে ইহ সংসারে এখন আছেন, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই; কি শুভক্ষণেই ভাগলপুরে আসিয়াছিলাম যে আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিতে পাইলাম, না আসিলে হয়ত আরও কতদিন আপনাকে দুঃখের কুচক্রে পড়িয়া কালক্ষেপ করিতে হইত। আজি আমার জীবন সার্থক—জন্ম সার্থক—আমার অর্থোপার্জ্জন সার্থক! ধরণী বাবু উপলক্ষ মাত্র আপনার পুণ্য প্রভাবেই আমার যা কিছু হইয়াছে।" সুধারামের পত্নীবিয়োগ সংবাদ অন্তর্ভেদ করিল। কৃতিমান্ পুত্রের মুখাবলোকনে সে ক্ষতির অনেক পূরণ হইল।

পরদিবস মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বয়ং তদন্তে গিয়া জানিতে পারিলেন হরি বাবুর বণিতার সাহায্যে সিদ্ধেশ্বর বাবু হরিচরণকে হত্যা করিয়াছেন। সুতরাং সুধারাম নির্দ্দোষী—আমাদিগের পুলিসদারোগাও নির্দ্দোষী—

যত দোষ উকীল বসন্ত কুমারের—উকীল বাবু ভাগলপুরে গিয়া যথেষ্ট পুরস্কার পাইলেন। মক্কেলের মোকর্দ্দমায় জয়লাভ করিয়া পিতা পুত্রে স্বদেশে আসিলেন।

উপসংহারে আমাদিগের পাঠকবর্গকে অবগত করা উচিত যে ধরণী ধর বাবু বসন্তকে সুশীল ও সুশিক্ষিত দেখিয়া, আমাদিগের বসন্ত কুমারকে আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যাটী প্রদান করিয়াছিলেন।

আমরা কেন এত হীনবল ও অল্পায়ু?

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

২য়; পূর্ব্বতন সামাজিক রীতি-নীতির পরিবর্ত্তন। ইহা আবার কয় অংশে বিভাজিত হইল।

(ক) বাল্যবিবাহ।

বাল্যবিবাহ যে বলিষ্ঠ ও দীর্ঘায়ু হইবার একটী প্রধান প্রতিবন্ধক; ইহা অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন। অপক্ক-বীর্য্যোৎপন্ন সন্তান দীর্ঘায়ু ও বলিষ্ঠ হইবে কেন? তাহারা প্রায় চিররুগ্ন ও অল্পায়ু। তাহাদের পিতা মাতারাও প্রায় অল্পভোগী হইয়া থাকে। অল্প বয়সে অধিক সন্তানের পিতা হইলে ও তেমন সঙ্গতি না থাকিলে অতিরিক্ত পরিশ্রম হেতু যে শীঘ্র শীঘ্র দুর্ব্বল হইতে হয়, ইহা অনেক বাঙ্গালির রুগ্ন দেহ সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। যাহাতে এই অনিষ্টজনক প্রথা বঙ্গ-সমাজ হইতে অচিরাৎ উঠিয়া যায়; প্রত্যেক হিতচিকীর্ষু ব্যক্তির তদ্বিষয়ে মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। আর বিলম্ব করা উচিত নহে।

এই স্থলে কর্ত্তব্যানুরোধে অগত্যা আর একটী প্রবল কারণের কথা বলিতে হইল। ইহা বাল্যবিবাহের অপেক্ষাও বহু অনিষ্টজনক। বহু হতভাগ্য বালক এই কারণ বারিতে প্রগাঢ়ভাবে বিলীন হইয়া পরিণামের মাথা খাইয়া এক্ষণে হাহাকার করিতেছেন! পাঠক! ইহা আর অন্য

কিছু নহে। বালকগণের আয়ুক্ষয়কারক নির্জ্জন বিহার। অনেক পিতা মাতা শীঘ্র শীঘ্র সন্তানগণকে বি, এ, এম, এ, পাস করাইয়া যাহাতে বড়লোক হইতে পারেন, এই আশায় এমনি প্রলোভিত হইয়া থাকেন, যে সন্তানগণের ভাবী ইষ্টের বিষয় একবারে বিস্মৃত হইয়া দিবানিশি তাহাদিগকে পাঠাভ্যাস করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন। ভুলিয়াও তাহা-দিগকে নীতি বা ধর্ম্ম শিক্ষা দেন না। ইহাতে এই ফল হয়, অনেক বালক কুসংসর্গে পড়িয়া নির্জ্জন বিহার করিয়া যাবজ্জীবনের মত অধঃপাতে যাইয়া থাকে। এ কারণে প্রত্যেক পিতা মাতার উচিত, যাহাতে বিদ্যাশিক্ষার সহিত সন্তানগণের ধর্ম্ম বা নীতি শিক্ষা হয়; এবং যাহাতে তাহাদের জ্ঞানোদ্রেক হইলে ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার "জীবন রক্ষকের" ন্যায় দুই-একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইয়া সেরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার উপায় অবলম্বন করা, এবং সর্ব্বদা তাহাদিগকে চক্ষের উপরে রাখা হয়।

(খ) সুরাপান।

পূর্ব্বকালে আর্য্যগণ সোমরসোৎপন্ন এক প্রকার সুরা পান করিতেন। তাহাও বিশেষ পর্ব্বাহ ব্যতিরেকে পান করিতেন না। আর তাহার মাদ-কতা শক্তিও বহুপরিমাণে অল্প ছিল। কিন্তু এই বিজ্ঞানময়ী ঊনবিংশ শতাব্দীতে সে সোমরস অনেকদিন তামাদি হইয়া গিয়াছে; সে মধু মাধ্বীক প্রভৃতি মদিরার নাম গন্ধও এক্ষণে আর নাই। এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে বিষম গরলাধার এক্সা, ব্রাণ্ডি, সেরী, সেম্পেন্ প্রভৃতি বিদেশীয় মদ্য বিরাজ করিতেছে। এখন আর পর্ব্বাহের অপেক্ষা করে না। যথায় তথায় সকালে বিকালে সকল সময়েই সুরা দেবীর পূজা হইতেছে। এমন স্থান নাই, যেখানে মদ্যালয় দেখিতে পাওয়া যায় না। মদ্যাদিতেই দেশ উৎসন্ন হইল!

দেশ উৎসন্ন না হইবে কেন? যে দেশের লোকেরা শাকান্নভোজী নিরীহ শান্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট; যাহারা অনেকে মাসান্তে ও একবার মাংসের মুখ দেখিতে পান কিনা সন্দেহ, তাহাদের উদরে সুরার অসহ্য প্রকোপ সহ্য হইবে কেন? অল্পদিবসের মধ্যে সুরা তাহাদিগকে শ্বাস, কাশ,

প্লীহা যকৃতাদি রোগে আক্রান্ত করিয়া শমন সদনে পাঠাইয়া থাকে। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়; বৎসর বৎসর কত শত ব্যক্তি এই সকল রোগে আক্রান্ত হইয়া পিতা মাতা পরিজনবর্গকে অগাধ শোক-সমুদ্রে নিমগ্ন করিয়া অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে; ইহা দেখিয়া শুনিয়াও অবশিষ্ট সুরাপায়ীগণের চৈতন্য হইতেছে না। চৈতন্য হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহারা দিন দিন অধিকতর অচেতন হইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বে যেখানে একটীও মদ্যালয় ছিল না, এখন সেখানে ২।৩।৪ টি ভাঁটী হইয়াছে; মদ্য এখন ৵০।৶০ আনায় বোতল বিক্রীত হইতেছে (১) তথাপিও মদ্যপায়ীগণের সুরাপান প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইতেছে না। পতিত পাবনী ভাগিরথী যদি জলের পরিবর্ত্তে মদ্যে পরিপূর্ণা হন, তথাপিও সুরাপায়ীরা সন্তুষ্ট হয় কিনা সন্দেহ স্থল! রাজা এ বিষয়ে যত্ন না করিলে, বা লোকে সুশিক্ষা না পাইলে যে মদ্যের আমদানী বন্ধ হইয়া যাইবে এমত আশা নাই। কিন্তু রাজ পুরুষগণের এবিষয়ে যত্ন হওয়া দুষ্কর! মাদক দ্রব্যের বহু আয় কি তাঁহারা সহজে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন?

(গ) অশন বসনের পরিবর্ত্তন ও একটী কারণ। আমাদিগের দেশ উষ্ণ প্রধান। উষ্ণ প্রধান দেশে উষ্ণ পরিচ্ছদ পরিধান বা উষ্ণদ্রব্য ভোজন করিলে শরীর সুস্থ থাকিবে কেন? আমরা দেখিয়াছি, অনেক ব্যক্তি উষ্ণ-দ্রব্য ভোজন করিয়া নানাবিধ উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া দুর্ব্বল ও অল্পায়ু হইয়া পড়িয়াছেন। এবিষয়ে মনোযোগী হওয়াও আমাদের কর্ত্তব্য।

(ঘ) প্রাতঃকৃত্যাদি হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত নিত্য নৈমিত্তিক রীতি-নীতির পরিবর্ত্তন ও আমাদের শরীর অসুস্থ হইবার একটী কারণ। প্রাচীন হিন্দুরা অতি প্রত্যূষে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শয্যা হইতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক উদ্যানে উদ্যানে ভ্রমণ করিয়া পুষ্পচয়নকরতঃ নির্ম্মল সুশীতল স্রোতস্বিনীতে অবগাহন করিয়া অনন্যমনে স্বীয় স্বীয় অভিষ্টদেবতাকে লক্ষ্য করিয়া পরমব্রহ্মের আরাধনা করিতেন। তাঁহাদের সকল কার্য্যই ব্যায়া-

(১) ভাগলপুর প্রভৃতি সাঁওতাল পরগণার অনেক স্থানে ৩।৪ পয়সায় বোতল!

মের সহিত সংশ্রব থাকাতে তাঁহারা সবল ও নিরাময় হইতেন। এখন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করা দূরে থাকুক, অনেকে বেলা ৮ টার মধ্যে শয্যাত্যাগ করেন না। প্রভাত-নিদ্রায় যে আয়ুক্ষয় করে, তাহা আমাদের অনেকের ধারণা নাই।

(ঙ) অপরিষ্কৃত স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ স্বাস্থ্য নষ্ট হইবার আর একটী কারণ। ইহা এক্ষণে অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এবং যাহাতে পরিষ্কৃত স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করা হয়; যাহাতে গৃহে পরিষ্কৃত বায়ু সঞ্চালনের পথ থাকে; তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইতেছেন।

(চ) স্বাস্থ্য নষ্ট হইবার যতগুলি কারণ আছে, খাদ্যদ্রব্যের অপকর্ষতাই তাহার প্রধান কারণ। এই কারণটিকে সর্ব্বশেষে উল্লেখ না করিয়া আমাদের সর্ব্ব প্রথমেই উল্লেখ করা কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু গত ১২৮৭ সালের চৈত্রমাসের আদরিণীতে "বাঙ্গালী দুর্ব্বল কেন?" শীর্ষক প্রবন্ধ লেখক খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন বলিয়া আমরা আর এ সম্বন্ধে অধিক বলিতে অভিলাষী নহি। তথাপিও দুই একটী কথা বলা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া স্থানান্তরে তাহা বলিব। এস্থলে বলা কর্ত্তব্য, দিবানিদ্রা ও বহুবিবাহাদিও স্বাস্থ্যসুখ নষ্টের অন্যতর কারণ স্বরূপ।

৩য়; মানসিক পরিশ্রমের আধিক্য অথচ শারীরিক পরিশ্রমের এককালে অভাব; আবার শারীরিক পরিশ্রমের আধিক্য অথচ পুষ্টিকর খাদ্য দ্রব্যের অল্পতা বা অভাব।

পূর্ব্বতন হিন্দুরা যেরূপ মানসিক পরিশ্রম করিতেন, সেইরূপ শারীরিক পরিশ্রম করিতেন। ভৃত্যাদি সত্ত্বেও অনেকে বহু পরিশ্রম করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহারা এক মুহূর্ত্ত সময় ও বৃথা আলস্যে কালক্ষেপ করিতে ভাল বাসিতেন না। যাঁহারা বৃদ্ধগণের কার্য্য দেখিয়াছেন, তাঁহারা এই কথার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু কি কাল পড়িয়াছে, কি পাশ্চাত্য-সভ্যতার তরঙ্গ উঠিয়াছে, এখনকার অনেক ব্যক্তি শারীরিক পরিশ্রমে সম্পূর্ণ বিমুখ। শারীরিক পরিশ্রমকে অনেকে ঘৃণার্হ মনে করিয়া থাকেন। এমন কি অনেককে দেখা গিয়াছে, পাচক ব্রাহ্মণ বা স্ত্রীলোক অভাবে এক পক্ষ ফলাহার করিয়া দিনযাপন করিবেন সেও শ্রেয়ঃ তথাপি

স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আহার করিবেন না। ব্যায়াম চর্চ্চা আমাদের নাই বলিলেও হয়। একজন অশীতিবর্ষ বৃদ্ধ ইংরাজকে দেখ, তিনি কেমন প্রফুল্ল মনে অল্পবয়স্ক যুবক যুবতীর সহিত ব্যায়াম করিতেছেন; সমাজে কোনরূপ নিন্দনীয় হইতেছেন না; আর পাঠক! তুমি একবার দৌড়া-দৌড়ি কর দেখি, অমনি শত শত ব্যক্তি বলিতে থাকিবে "অমুক বৃদ্ধ বয়সে ক্ষেপিয়াছে।" তোমার আর ব্যায়াম চর্চ্চা হইল না। পূর্ব্বে এতদ্দেশে ব্যায়াম চর্চ্চা থাকাতে অনেক বীরপুরুষ হইতেন, এখন দুর্ব্বল পুরুষেই বাঙ্গলা পরিপূর্ণ! গবর্ণমেণ্ট দয়া করিয়া স্থানে স্থানে দুই একটী ব্যায়াম বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া দিতেছেন সত্য; কিন্তু উন্নতি ত কিছুই দেখিতে পাই না। অনেক স্থলে ব্যায়াম বিদ্যালয়ের নাম আছে এই মাত্র!

বাঙ্গালার মধ্যশ্রেণীর ও উচ্চশ্রেণীর লোকেরা যেমন ব্যায়াম চর্চ্চা বিমুখ, তেমনি আবার মধ্যশ্রেণীরা মানসিক শ্রমে তৎপর। (উচ্চ শ্রেণীরাও অনেকে মানসিক শ্রম করেন) বাঙ্গালি মানসিক শ্রমে অনেক জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, মনের সহিত শরীরের অতি নিকট সম্বন্ধ আছে। অতএব মানসিক শ্রমের আধিক্যে শরীরের অপকার হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। পাঠাভ্যাস নিযুক্ত বঙ্গ-বালক বা যুবকগণের শরীরই ইহার প্রমাণ স্থল, অনেকে পাঠ সমাপ্ত করিয়া অস্থিক-ঙ্কাল লইয়া বিদ্যালয় হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া থাকেন!

শারীরিক শ্রমের আধিক্যে ও পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্যের অভাবে আমরা এত দুর্ব্বল হইয়া এত শীঘ্র শীঘ্র বিদায় লইতেছি! সকলেই অবগত আছেন, শারীরিক অঙ্গ সঞ্চালনে শরীরস্থ রক্তের ক্ষয় হইয়া থাকে। সেই ক্ষতি পূরণের জন্য আহারের প্রয়োজন হয়। আমরা যাহা আহার করি, তাহার সারভাগ রক্তরূপে পরিণত হইয়া ক্ষয়াংশ রক্তের ভাগ পূর্ণ করে ও অসা-রাংশ মলরূপে পরিণত হয়। যদি খাদ্য দ্রব্যে কোন পুষ্টিকর পদার্থ না থাকে, তবে শরীর বলবান্ হইবে কিরূপে? তাহাতে শরীর বরং ক্রমশঃ দুর্ব্বল হয় ও শেষে রোগগ্রস্থ হইয়া থাকে। আমরা যাহা আহার করি, যে মৌরলা মৎস্যের ঝোল্‌কে পুষ্টিকর খাদ্য মনে করি, তাহাতে কত

সারাংশ আছে? অধিকাংশ ব্যক্তি দরিদ্র। দরিদ্র কোথায় উৎকৃষ্ট দ্রব্য পাইবে? উৎকৃষ্ট দ্রব্যের অভাব হেতু আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি, ইহাতে সন্দেহ নাই।

আমাদের যেমন অর্থের অভাব, ও অর্থাভাব-জনিত যেমন উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্যের অপ্রতুলতা; তেমনি আবার জীবন রক্ষার জন্য সেই অপকৃষ্ট দ্রব্য সংগ্রহেও বিস্তর পরিশ্রম! হনুমন্ত পরিশ্রম না থাকিলে আমাদের অনেককে উপবাসী থাকিতে হয়। কঠিন পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করি, তাহাতে পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ হয় না। এমত অবস্থায় দেহ রক্ষা হইবে কিরূপে? আজ কাল বঙ্গদেশের জেল সমূহে যে বহুতর কয়েদীর মৃত্যু হইতেছে, অনেক ডাক্তারে বলিতেছেন, কয়েদীদিগের অতিরিক্ত পরিশ্রম অথচ খাদ্যদ্রব্যের অপ্রতুলতাই তাহার একমাত্র কারণ। এই বিষয় লইয়া আজ কাল সর্ব্বত্রই মহা আন্দোলন হইতেছে। দেখা যাউক, পরিণামে কি হয়।

এক্ষণে দেখা গেল, আমাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হইবার অনেকগুলি কারণ আছে। আমরা যে গুলির উল্লেখ করিলাম এতদ্ব্যতীত আরও অনেক কারণ থাকিতে পারে। খাদ্যদ্রব্যের অভাব যত অনিষ্টকর, তত আর কিছুই নহে। উপসংহারে বক্তব্য, যদি কেহ বলবান্ ও দীর্ঘায়ু হইতে ইচ্ছা করেন, তবে এই সকল বিষয়ে মনোযোগী হউন; আমাদের বাক্য সত্য কিনা তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখুন; এবং প্রকৃত হইলে সেইরূপ কার্য্য করুন ও আপন আপন সন্তানগণকে প্রতিবেশীগণকে শিক্ষা দিউন ও তাহাদের অবস্থা উন্নত করিতে যত্নবান্ হউন, নতুবা অন্য উপায় আর নাই। বিষয় কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিবার সময়ও যেন এই কথা স্মরণ থাকে, "ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষণাং প্রাণাঃ সংস্থিতি হেতবঃ।" প্রিয় পাঠক! আমরা ত অনেকদিন অধঃপাতে গিয়াছি, কিন্তু দেখিবেন, আমাদের ন্যায় আপনাদের সন্তানগণ আর যেন অধঃপাতে না যায়।

শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।

ফুলের বাগান।

প্রকৃতির বিহার ক্ষেত্র নিবিড় নির্জ্জন কানন, জন সমাগম শূন্য নিভৃত উপত্যকা; দুরারোহ তুষার মণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ; অচল উৎসঙ্গ বাহিনী তরঙ্গিনী। যে বনে নানা জাতীয় হরিতাঙ্গ মহীরুহ নানা বর্ণের সুকুমার প্রসূন নিকরে মস্তক সাজাইয়া তাহাদিগের সৌরভামোদে আরণ্য সমীরকে মাতোয়ারা করে, সেখানে বিলাসী মানবের সাক্ষাৎ বিরল;—তাহাদিগের পবিত্র পরিমল মানব নাসিকার তৃপ্তি সাধন জন্য বিকীরিত নহে; তাহাতেই স্পষ্ট প্রমাণ, যে কেবল মাত্র প্রকৃতি সন্তোষণার্থেই তৎ প্রদেশের কুসুম বিকাশ এবং সুরভি বিকীরণ সেই স্থলে প্রকৃতি আপন বিলাস বাসনা পরিপূরণের মানসেই যেন চিরবিরাজিতা, চির প্রফুল্লমুখী, অতুল সুখ বিহারিণী—সে এক চিত্ত প্রসাদিনী শোভা। যে উপত্যকায় নবীন শ্যামল শষ্পবসনে মনোমোহিনী নীল, পীত লোহিতাদি কুসুম কিরীটী তরুনিচয়ে শোভাবতী, যাহার ক্রমোন্নত বক্ষে হীরক নির্ম্মলা তটিনী মেখলাকারে বেষ্টিতা, সেই স্থলে প্রকৃতি অনূঢ়া বালার ন্যায় চঞ্চল, ক্রীড়া পরায়ণা; যেন নিরন্তর নাচিতে নাচিতে অপরূপ খেলায় হাসি খুসী করিয়া বেড়াইতেছে, সে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য। যে দুরারোহ ভূধর মস্তক তুষার সন্নিবেশে গাঢ়তর শুভ্র, নিরন্তর তুহীন পাতে তরুলতিকাদি বিরহিত, শরীরীমাত্রের অগম্য সেই নিস্তব্ধ, নিস্পন্দ প্রদেশে প্রকৃতি যোগ নিয়তা যোগিনী বেশে মুদিত নেত্রা—সে এক চিত্তাকর্ষিণী সুষমা। যে সুদূর ব্যাপিনী তৃণাদি পরিশূন্যা বালুকাময়ী প্রতপ্তা মরুভূমি প্রখর মার্ত্তণ্ড কিরণে ভীষণা সেই স্থানে প্রকৃতি যেন রণমত্তা উগ্রচণ্ডিকা বেশে ঘোর আতঙ্কদা। যে নিবীড় নিলীম অত্যুচ্চ তরঙ্গবক্ষে প্রমত্ত জলনিধি ধৌত কাপাস বস্ত্রের ন্যায় শুভ্র-ফেনপুঞ্জ নাচাইতে নাচাইতে সমুদ্রযাত্রী পথিককে ভয় প্রদর্শন করিতেছে সেখানে প্রকৃতি উন্মাদিনী। আর অমাবস্যার ঘোর আঁধার মলিনা ত্রিযামা সহযোগে যে স্থানে সুষুপ্তি

বৈলৌন্য জীবগণকে নীরব নিস্পন্দ করিয়া রাখে, সেখানে প্রকৃতি অতীত যৌবনা ললনার ন্যায় গম্ভীরা; অথবা যেখানে সচেনতা কৌমুদী বসনা সুহাসিনী নিশীথিনীকে অবলম্বন করিয়া কেবল মাত্র বিহগ কণ্ঠে মৃদু বিহার করিতে থাকে সেখানে প্রকৃতি যৌবন গর্ব্বিতা মানিনী; এইরূপে নানা সময় প্রকৃতির নানা মূর্ত্তি দেখিতে পাই। লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া কোন বিরল স্থানে থাকিলেই প্রকৃতির রূপ ও ভাব বৈচিত্র দেখিয়া বিহ্বল হই। এই নরজগতে, মানব প্রকৃতির প্রধানতম প্রজা। মানব অরণ্যের অরণ্যত্ব ঘুচাইয়া নগর করিতেছে, নগরের নগরত্ব ঘুচাইয়া অরণ্য করিতেছে, আবশ্যক হইলে পর্ব্বত কাটিয়া সমভূম করিতেছে, নদীবেগ ফিরাইয়া কৃষিক্ষেত্র করিতেছে; আবশ্যক হইলে যতদূর সাধ্য ক্ষমতার অপচয় করিতে না পারিলে ও আপন বিলাস বাসনা পরিতোষণে প্রকৃতির অঙ্গ বৈকল্য জন্মাইতে ক্রুটী করে না। লোকালয়ে থাকিয়া প্রকৃতির অপূর্ব্ব আরণ্য শোভা, মনোহর ভূধর বৈচিত্র্য, তরঙ্গিনীর লহরী লীলা অবলোকন সুখ প্রত্যাশা অভাবনীয়! সুখব্রতাচারী স্বার্থদর্শী মানব প্রকৃতির বিভিন্ন স্থানীয় সৌন্দর্য্য সমাহার দেখিবার জন্যই বাগানের সৃষ্টি করিয়াছেন। বাগানে পর্ব্বত, ভূধর, কানন, সমুদ্র, নদী সকলেরই আদর্শ এবং অনুকল্প আছে। পাঠকবর্গ মনে করিবেন না যে সচরাচর দুই চারিটী ফুলগাছ লইয়া যে এক একটী ক্ষুদ্র বাগান গঠিত হয় এ সেরূপ বাগান নহে। আমরা যে বাগানের কথা বলিতেছি তাহাতে নানা জাতীয় কুসুম নিবাস, কৃত্রিম সরিৎ ও শৈল সকলেরই সমাবেশ আছে; যেমন আজি কালিকার মহানগরী কলিকাতাস্থ ইডেন উদ্যান। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সহিত তুলনায় আমাদিগের নিবাস-ভূতা ধরিত্রী ইডেন এবং সংসার তদভ্যন্তরীণ কুসুম নিবাস। এই সংসারই আমাদিগের প্রবন্ধেতে ফুলের বাগান। এই সংসার উদ্যানে মনুষ্যই কুসুম। কুসুমোদ্যানে যেমন নানা জাতীয় কুসুম আছে, কোনটার বাহ্যদৃশ্য অতীব সুন্দর, দর্শনেই মন কাড়িয়া লয় সযত্ন আঘ্রাণেও গন্ধ উপলব্ধি হয় না, কোনটার বাহ্যাড়ম্বর নাই, দেখিলে মন মোহিত হয় না, কিন্তু গন্ধে মন কাড়িয়া লয়, কোনটা ছোট, কোনটা বড়, কোনটা মধ্যমাকৃতি। সংসার বাগানেও ঠিক তাই।

সংসার উদ্যানের শীর্ষস্থানীয় রাজাকে আমরা পদ্ম বলিব। পদ্ম ত্রিজাতীয়—শুভ্র, এবং লোহিতাভ এবং নীল, সৌরভ দিগন্তামোদী—বায়ু যতদূর লইয়া যাইতে পারে ততদূর ছুটিতে পারে, মকরন্দ পর্য্যন্ত ; রাশি রাশি মধুপ ভোরপুর পান করিয়া ও ফুরাইতে পারে না। পদ্ম সরোবর ভিন্ন অন্যত্র বিকশিত হয় না, সুতরাং কমল নিবাস সাধারণের অনায়াস-গম্য নহে। যাইতে হইলে কুম্ভীর নক্রাদি জলজন্তুর ভয় আছে। কমল মহাশক্তির পূজা ভিন্ন অন্য প্রয়োজনে বড় প্রয়োজিত হয় না। আমা-দিগের সংসার সরোজ রাজাও ত্রিজাতীয় ; যিনি ধীর তিনি শুভ্র, যিনি উগ্র তিনি লোহিতাভ, আর যিনি ধীরতা এবং উগ্রতার রাসায়নিক মিশ্রণে দুষ্টদামী শিষ্টপালী তিনিই নীল। রাজ্য শাসন প্রণালী যত উৎকৃষ্ট হইবে, রাজ্যের সুশৃঙ্খলা, প্রকৃতিবর্গের যত সুখসচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি অপকৃচ্ছ্রতা যত অল্প হইবে, রাজ্যমধ্যে যেমন শান্তি স্থাপিত হইবে রাজার যশোসৌরভ তত সুদূরব্যাপী হইবে। রাজ ভাণ্ডারের ধনই কুসুমের মকরন্দ ; দেওয়া-নজী, খাঁতাঞ্চী, মহরার, মসাহেব আশা মিটাইয়া পান করিয়া ও শেষ করিতে পারিতেছেন না। রাজপ্রাসাদ সাধারণ সীমা বহির্ভূত, সকলে মনে করিলেই যাইতে পারে না, গমনের বাধা দ্বারবান্ জমাদার ইত্যাদি। রাজ্যের মহতী শাসনশক্তির প্রয়োজনই রাজার প্রয়োজন। উল্লিখিত ত্রিজাতীয় রাজার রাজ্ঞীদিগকে কুমুদ, কহ্লার-ওরক্ত কমল বলিব। সকলেই সরোজা, সকলেই সৌন্দর্য্য এবং সৌরভে ত্রিজাতীয় কমলের অনুরূপ ; দিবাভাগে আপনাপন পতি বিকাশ শোভায় শোভিত হইয়া মধু বিতরণে মধুকরগণকে প্রতিপালন করেন ; তখন সেই রাজ প্রাসাদে কুমুদ কহ্লার রাজ্ঞীগণ বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কর্ম্মা ; সায়াহ্নে রাজা রাজকার্য্য, রাত্রিকালে রাজবেশ, পরিত্যাগ করিয়া বসিলেই রাজ্ঞীগণ বসন ভূষণে অঙ্গ সাজাইয়া পতিমনোরঞ্জনে প্রয়াসবতী হয়েন। রাজান্তপুর শোভা রাজললনাগণের যেমন রূপ, তেমনি রস, তেমনি গন্ধ। সংসারবাগানে রাজপুত্রগণ জবা এবং স্থলজ কমল জাতীয় ; তাঁহাদিগের সৌরভ নাই, রস নাই; আছে কেবল রূপ এবং রক্তিম রাগ ; কিন্তু মিষ্টকথার বশীভূত, একটু কোমলতা আছে। রাজপুত্র—কাজেই শক্তি পূজায় তাঁহাদিগের

প্রয়োজন হয়। সংসারে ধনীগণ নাগ-কেশর জাতীয়, ইহাদিগের সৌরভ দিল্গুণলোপ্রাসী,—মধু বেশ আছে, মধুকর প্রায়ই বঞ্চিত হয় না। রূপরস গন্ধে ইহাঁরা পদ্ম অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন না হইলেও শক্তিপূজায় প্রযুজ্য নহেন; এজন্যই রাজার নিম্নস্থানীয়। শাল্মলী কুসুম চাঁপা বড়মানুষের স্ত্রী বড় মানুষের ঘরের ছেলে; রূপ ও পরিচ্ছদের ছটায় চক্ষু ভুলিয়া যায়, গন্ধ একেবারেই নাই, জবার কোমলতাও নাই, মধু আছে বটে, কিন্তু তাহা কেবল মাত্র চাটুভাষী দাঁড় কাকের ভোজ্য; ভ্রমর মক্ষিকাদি উপযুক্ত পাত্রের জন্য বিন্দুমাত্রও নহে। পাঠক দেখিয়াছেন বিধাতার এমনই সৃজন এবং যোজনা কৌশল,যে শাল্মলী কুসুমে দাঁড় কাকের মিলন যেমন শোভনীয়, ভ্রমর মক্ষিকায় সেরূপ নহে। এ ফুল দেবতা পূজা, বালকের খেলা, বা স্ত্রীলোকের মালা কিছুরই যোগ্য নহে। কেবল নীচ লোকেরা রৌদ্রে শুকাইয়া দগ্ধ করে এবং সেই ক্ষারে ময়লা বস্ত্র ধৌত করিয়া থাকে। গোলাপ এই সংসারে বড় মানুষের বৌ, শাল্মলীর বনিতা। আমাদিগের পাঠকবর্গ বোধহয়, এই কথায় একটু বিরক্ত হইবেন, কি করিব ? ঈশ্বরের সৃষ্টি—এ সকল তাঁহার কৃত ঘটনা। কিন্তু তাঁহার সৃষ্টি, তাঁহার নিয়ম অভ্রান্ত বলিয়া জানিতে হইবে, আমাদিগের কথায় বিরক্ত হইবার পূর্ব্বে একটু ভাল করিয়া দেখুন দেখি গোলাপের রূপ মাধুর্য্যের প্রতিদ্বন্দ্বী নাই বলিলেও হয়, সৌরভে মন প্রাণ আকুল করে, কোমলতায় সকল কুসুম হারি মানে, মধুও আছে, না হইলে প্রজাপতি বসে কেন? আছে বই কি! কিন্তু ভাবিয়া দেখুন দেখি তথাপি শাল্মলীর পরিণীতা কিনা !!! যদি বড়মানুষের পৌত্রের কথা বলিতে হয় তবে আমরা গাঁদাকে পৌত্র বলিব ;—রূপ খুব আছে, রস নাই, গন্ধ নাই, বালক বলিয়া একটু কোমলতা আছে, রস এবং গন্ধ নাই বলিয়া ভ্রমর বা মক্ষিকা অনুগত নহে, তবে রূপ দেখিয়া কখন কখন মক্ষিকা বসিলেও প্রতারিত হইয়া তৎক্ষণাৎ উড়িয়া যায়। অপগুণে বেটা, ইনিই দেবতাপূজায় লাগেন না, যদি কখন ব্যবহার করেন সে সকল বড়মানুষের পৌত্র বলিয়া আদর করিয়া। নয়নতারা, সূর্য্যমুখী বড়মানুষের পৌত্রবধূ, তাহাদের রস নাই, গন্ধ নাই, কেবল আধ আধ ফুটন্ত একটু রূপ আছে, বালিকা বলিয়া তাহাদিগের

হাসিতে মনটা একটু আনন্দ পায়। কদম্ব সংসারের গৃহস্থ লোক—মস্তকে শুভ্র কেশ, কিন্তু ভিতর হইতে লোহিতের আভায় মন ভুলায়—সদাই হাসি হাসি মুখ, গন্ধ উগ্র নহে, মধুর মধুর—দেখিলেই বোধহয় সদাই প্রসন্নমনা। বক পুষ্পকে সংসারে গৃহস্থ গেহিনী বলিতে পারি, বার্দ্ধক্যবশতঃ লোল দেহ, আঁটুনি নাই, কিন্তু সেই বৃদ্ধ বয়সের একটু শ্রী আছে, বেশ মিষ্ট গন্ধও একটু আছে, মধু প্রচুর নাই সুতরাং ভিক্ষুকরূপী মক্ষিকাদি কখন খখন আসিয়া থাকে, কিন্তু আশানুরূপ না হউক, বঞ্চিত না হইয়া কিঞ্চিৎ লাভে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া যায়। টগর, গন্ধরাজ, সংসারে গৃহস্থ ঘরের ছেলে ;—আকার প্রকার, ভাবভঙ্গি সরল ;—অন্তর বাহ্য সাদা ধপ্ ধপে, রূপ মাঝা মাঝি, বুব কড়া না হইলেও গন্ধ আছে, সে গন্ধ বড় মিষ্ট। টগরে মধু বড় কম, নাই বলিলেও দোষ হয় না, সুতরাং তাহাতে মধুব্রতের আনুপত্য নাই। মল্লিকা, বেল, রজনীগন্ধা গৃহস্থের বধূ ; টগর গন্ধরাজের স্ত্রী, রূপ স্বাভাবিক, রস প্রচুর, সৌরভে জগৎ মোহিত ; ইহারা প্রদোষে বেশ ভূষায় ভূষিত হইয়া রাত্রিকালে বিকশিত হয়েন, ইহাঁদের যত হাসি যত স্ফূর্ত্তি রাত্রিকালে, প্রভাতে ম্লানমুখী,—যেন লজ্জাবতী। দেবতাদিগের পূজায় আইসে ; রঙ্গণ, কৃষ্ণকলি, গৃহস্থ ঘরের বওয়াটে ছেলে—বর্ণ লাল টকু টকে, মধু নাই, গন্ধ নাই—কোমলতা বা মাধুর্য্য কিছুমাত্র নাই, দর্শনই সার। সেফালিকা গৃহস্থের নবোঢ়া বধূ (কনে বৌ) রূপটী লালে সাদায়—বাল্যের চপলতার এবং গৃহস্থ সুলভ সরলতা মিশ্রণ। দিবাভাগে ইনি কাহার সাক্ষাতে বাহির হয়েন না,কেহ ইহাঁকে দেখিতে পান না। ইনি বড় লজ্জাবতী, সকলে নিদ্রিত হইলে তবে বাহির হয়েন এবং নিশীথ বায়ুকে বিভোর করিয়া আপন সৌরভ বিস্তার করেন। কনে বৌ গৃহস্থ, এমন কি পাড়া প্রতিবাসী সকলেরই প্রিয়। কনে বৌ এর মুখ দেখিতে সকলেই সোৎসুক, সেফালিকার এত মান যে মাটিতে পড়িলেও দেবগণের স্পৃহনীয়। সংসারে কনে বৌ এর বড় মান, বড় আদর !

অন্যান্য জাতীয় রূপ, রস, গন্ধ বিহীন ফুল মাত্রেই সংসারের নিম্ন ও দরিদ্র শ্রেণীর লোক। তাহার মধ্যে সজিনা এক জাতীয়! সজিনার বর্ণ সাদা, অন্তর ঘোলা, অতি অল্প মধুর মধুর একটু গন্ধ ও আছে। একুল

পথে ঘাটে যেখানে সেখানে ফুটে, অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এমন কি আত্মীয়ের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। ভুমুটী, নয়নতারা দিগকে আমরা দরিদ্র কুটীরের সাধারণ শ্রেণীর স্ত্রী বলিব। তাহাদিগের রূপ একটু আছে, মধুরতা বা গন্ধ কিছুই নাই। যেখানে সেখানে প্রস্ফুটিত হয়। আপনি ফুটিয়া আপনিই শুকাইয়া যায়। কাহার খবরে আইসে না, বা কাহার মনও টানিতে পারে না। বোধ হয় পাঠকবর্গ দেখিয়াছেন শষ্পরাশি মধ্যে মাটিতে মিশাইয়া মানব দৃষ্টির অগোচর এক জাতীয় ক্ষুদ্র কুসুম ফুটিয়া নাসিকার তৃপ্তি সাধন করে, আমরা সেই শ্রেণীর কুসুমকে সংসারের দরিদ্রাঙ্গনার শিরোভূষণ বলিব।

এই সংসার বাগানের রচয়িতার রচনা বৈচিত্র, অসাধারণ ভাবুকতার পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইতে হয়! তাঁহার সৃষ্টির অসামান্য উদ্দেশ্য পর্য্যালোচনা করিলে মন উদাস হয়, চিন্তার অকূল সাগরে ভাসিতে থাকে, কূল পায় না।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

বঙ্গবাসী। সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র। বরাট প্রেস, কলিকাতা।

আমরা এ সংবাদ পত্র খানি প্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। এত অল্প মূল্যে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সংবাদ পত্র আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বঙ্গবাসী যে অল্প মূল্যের উত্তম সপ্তাহিক সংবাদ পত্রের একটী বিশেষ অভাব মোচন করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

বঙ্গবাসীর ভাষা সম্বন্ধে আমরা কোন সমালোচনা করিলাম না।

বঙ্গবাসীর ভাষাগত যে দোষ দেখিতে পাই তাহা সংবাদ পত্র পক্ষে মার্জ্জনীয়। বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় সংবাদ পত্র লিখিত হইবার সময় এখনও আইসে নাই, অথবা ইহা নিশ্চয়, যে প্রসিদ্ধ "সাধারণী" ব্যতীত বিশুদ্ধ বঙ্গভাষা প্রসবিনী সংবাদ পত্রিকা আর নাই। যাহাই হউক আশীর্ব্বাদ করি বঙ্গবাসী দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গবাসীর শুভসাধনে নিরত থাকিয়া বঙ্গরাজ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করুন।

কাব্যহার। পদ্যময় সন্দর্ভ। শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী প্রণীত। চিকিৎসাতত্ত্ব যন্ত্র, কলিকাতা।

গ্রন্থকার নূতন কবি হইলেও তাঁহার দুই একটী কবিতা মধুর হইয়াছে। "ভুলনা আমায়" [For get me not] দুই ছাঁদে লিখিয়া ভাল করেন নাই, এবং সেই হেতু উহা মধ্যে মধ্যে শ্রুতি কঠোর হইয়াছে। যেরূপ আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেইরূপ সমাপ্ত করিলে ইহা বড় মধুর হইত। এক স্থানে "গর্গন" লিখিয়া তাহার ইংরাজীতে (A Fabled monster of Terrific aspect, the sight of which turned the beholder to stone) এইরূপ টিকা দিয়া গ্রন্থকার, যাঁহারা ইংরাজী অনভিজ্ঞ, তাঁহাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করিয়াছেন। "শ্রীমতী শরৎকুমারীর চিত্রদর্শনে" শীর্ষক পদ্যটী স্পষ্টতঃ বায়রনের অনুকরণে লিখিত।

কবি স্থানে স্থানে বিসর্গ দিয়া তাঁহার কাব্যকে আরও শ্রুতি কটু করিয়াছেন, যথা——

"সৌন্দর্য্যের খনি-আমি করিয়া খনন
যখন তোমার সেই সুতনুয়া খানি
বিরলে বসিয়া দেখি হইতাম মানী
চিত্র দেখি সেই ভাবে আজি পূর্ণ মনঃ।"

আবার——

"সেই চক্ষুঃ—চক্ষু আমি বলিব না তায়"

ইত্যাদি।

কবির "আমি কি উন্মাদিনী ?" বড় সরস হইয়াছে। মনে করিয়া ছিলাম পাঠকবর্গকে নমুনা স্বরূপ তাহার কতকটা উপহার দিব কিন্তু স্থানাভাব বশতঃ তাহাতে কৃতকার্য্য হইলাম না।

যাহাই হউক "কাব্যহার" ইদানিন্তন অনেক কাব্যগ্রন্থ অপেক্ষা ভাল, বেনোয়ারী বাবুর কবিতা লিখিবার কতকটা ক্ষমতা আছে, এইরূপ চর্চ্চা রাখিলে ভবিষ্যতে তিনি একজন কবি বলিয়া পরিচিত হইলেও হইতে পারিবেন।

কল্পতরু। মাসিক পত্র ও সমালোচন। শ্রীগোপন চন্দ্র বসু দ্বারা প্রকাশিত। বিষ্ণু যন্ত্র, কলিকাতা।

আমরা অনেক দিন হইতে আর কল্পতরু পাইনাই, সুতরাং ইহার জীবনের প্রতি আমাদের সন্দেহ হইয়াছে। সেই নিমিত্ত ইহার সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন বোধে, করা গেল না।

প্রতিভা। নবন্যাস পূর্ণ সমালোচনী মাসিক পত্রিকা। শ্রীঅনুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। বিষ্ণু যন্ত্র, কলিকাতা।

নবন্যাস পূর্ণ মাসিক পত্রিকার অভাব আছে কি না, বলিতে পারি না। দেখাযায় যে নবন্যাস প্রকাশই প্রতিভার উদ্দেশ্য? শুদ্ধ নবন্যাসে গা ঢালিয়া দিয়া মাসিক পত্রিকা চালাইলে কি তাহা স্থায়ী হইবে? সেই নিমিত্ত প্রতিভার জীবনেরর উপর আমাদের বিশেষ সন্দেহ আছে।

নৈশ বিহার।

গোলাপ বাগে।

একদা শারদ পৌর্ণিমা নিশিতে ভ্রমণ করিতে বাহির হইলাম। তখন রাত্রি দুই দণ্ড অতীত হইয়াছে। নীলাকাশে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া, কুমুদিনীনায়ক মৃদু মধুর আলোক বিকীরণ করিতে করিতে, হাসিতে হাসিতে—প্রকৃতি সতীকে মনমোহন বেশে সুসজ্জিত করিতে করিতে পরিভ্রমণ করিতেছিল। আমি একটি বিস্তৃত ক্ষেত্রমধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া সেই শোভা অভূতপূর্ব্ব বলিয়া বিবেচনা করিতে ছিলাম। চন্দ্রকিরণের বিপরীত দিকে বৃক্ষগণের ও গৃহসমূহের যে ছায়া পতিত হইয়াছিল, তাহা আমার মনের আরও আনন্দ বিধান করিতে লাগিল। কেন—তাহা জানি না। বাঙ্গালির তাপদগ্ধ হৃদয়ে শীতরশ্মির শীতল ছায়া আনন্দপ্রদ, বা চন্দ্রকর-কিরিটিনী ছায়া বলিয়া বড় সুন্দর বোধ হইতেছিল, তাহা স্থির করিতে পারিতেছিনা। যাহাই হউক আমি সেই ছায়া সকলের অপূর্ব্ব মধুরিমা বিলোকন করিতে করিতে ক্রমশঃ চলিলাম, যাইতে যাইতে একটী সুন্দর পরিখাসম্বলিত উদ্যান দেখিতে পাইলাম। তাহার চতুর্দ্দিকস্থ বৃক্ষসকলের ছায়া বড় সুন্দররূপে পতিত হইয়াছিল, আমার মন সে অপূর্ব্ব মাধুরী ভুলিতে পারিল না, জিজ্ঞাসায় জানিলাম, যে সে উদ্যানটীর নাম "গোলাপ বাগ।" আমি আশান্বিত প্রাণে কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

পাঠক! সেই পুর্ণিমা-রাত্রে আমি গোলাপবাগকে যে কি সুন্দর দেখিলাম তাহা আর তোমায় কি বলিব! সে সৌন্দর্য্য আমার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা পরিব্যক্ত করা আমার সাধ্যাতীত। আহা! কি ফুলের হাট রে! আমার চতুর্দ্দিকে যে কত ফুল খল খল করিয়া হাসিয়া হাসিয়া নাচিতেছিল তাহা আর তোমায় কি বলিব।

আমার বোধ হইল যে ফুলেরা বুঝি আমায় বিদ্রূপ করিতেছে। আমি কম্পিত হৃদয়ে মনে মনে জিজ্ঞাসা করিলাম "ফুল তোমরা হাসিতেছ কেন ?" ফুল যেন বলিল "তোমরা নাকি বড় হাসি ভালবাস, দুঃখের সময়েও হাসির লহরী তুল, তাই হাসিতেছি।" বাস্তবিক বলিতে কি কথাটি আমার বড় প্রাণে বাজিল ; আমরা দুঃখের সময়ে হাসি ?—হাসির প্রকৃত অর্থ আমরা জানি না ? ভাবিলাম তাহাই বটে ! এই উনবিংশ শতাব্দী হাসিরই সময়। যে দিন পাশ্চাত্য ভাষা বঙ্গীয় বালকের উপদেশার্থ রাজ পুরুষ কর্তৃক প্রথম মনোনীত হয়, সে দিন বঙ্গবাসীমাত্রেই একবার উচ্চ হাস্য করিয়াছিল। তাহার পর যখন পাশ্চাত্য সভ্যতা, পাশ্চাত্য জ্ঞান, পাশ্চাত্য রীতিনীতি কথঞ্চিৎ বঙ্গভূমে পদার্পণ করিল,তখন বঙ্গভূমে আরও উচ্চহাসির লহরী উঠিল। পরন্তু যে সময় প্রথম সমাজসংস্কারক বঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইলেন, তখনও বঙ্গভূমে হাসির সীমা রহিল না। তারপর বর্তমান বঙ্গীয় যুবকেরা শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত হইয়া জন্মভূমির বর্তমানাবস্থায় হাস্য করিতেছে, আমরাও তাঁহাদের দেখিয়া হাসিতেছি। আবার আমাদের হাসি দেখিয়া ফুল হাসে ! আমি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তথা হইতে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলাম। যে দিকে ফুল আছে সেদিকে আর যাইলাম না। পরিখার দিকে যাইলাম, দেখিলাম নিবাতনিষ্কম্পা পরিখানীর যেন কাল রঙ্গে বিষাদের চিহ্ন জ্ঞাপন করিতেছে, আমি অবাক্ হইলাম। মনে করিলাম জলের কাছেই বসিব, কারণ যাহার হৃদয়ে বিষাদ, তাহার উৎসবে আনন্দ নাই। জলের সহিত সখ্যতা করিতে স্বগত জিজ্ঞাসা করিলাম, "জল ! তুমি এত বিষাদিত কেন ?" জল যেন আমার কানে কানে বলিল "আমায় যে এত যত্ন করিয়া রাখিয়াছে তাহার হৃদয় সান্ত্বনা করিতে পারি না এই জন্যই আমি এত বিষণ্ন আর কে জানে কেমন মনুষ্যের প্রাণ, যে অনলে মনুষ্য দগ্ধ হয়, সে অনল আমি শান্ত করি, কিন্তু ঈশ্বর জানেন যে মানবহৃদয়ে কি আগুন আছে যে তাহা আমি নির্ব্বাপিত করিতে পারি না।" জলের একথা শুনিয়া আমার চক্ষে জল আসিল, সে জল গণ্ড বহিয়া সলিলে নিপতিত হইল। সলিল যেন চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তোমাদের চক্ষেও কি আগুন আছে,

নতুবা ইহা এত উত্তপ্ত কেন?" আমি কি উত্তর দিব স্থির করিতে না পারিয়া মৃদুস্বরে বলিলাম "ভাই জল, তুমি অপেক্ষা কর আমি আসিতেছি।" জলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া শপথ করিলাম যে তাহার নিকট আর যাইব না।

সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া কতকদূর যাইয়া একটী একতল গৃহ দেখিতে পাইলাম। তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখি যে তাহা নানা জাতীয় জীবদ্বারা পরিপূর্ণ, কোথাও ব্যাঘ্র, কোথাও সিংহ, কোথাও ভল্লুক, কোথাও বা জম্বুক, কিন্তু সকলেই বিমর্ষ, আজি যথা তথা এই বিমর্ষভাব অবলোকন করিয়া অধিকতর বিষণ্ণ হইলাম। অনেকক্ষণ ধরিয়া একটী সিংহকে দেখিতে লাগিলাম, সিংহটি একটি প্রকোষ্ঠের চতুর্দ্দিকে পরিক্রমণ করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছিল; ভাবে বোধ হইল আমাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছে "মনুষ্য! তুমি না সকল জীবের শ্রেষ্ঠ জীব? তোমরা যদি পরাধীনতা শিক্ষা দিবে তবে আর উপায় কি?" আবার যেন পদমধ্যে মস্তক লুক্কায়িত করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল "ভাল ভাই! জিজ্ঞাসা করি এই ভূমণ্ডলের কোন সম্ভ্রান্ত জীবের স্বাধীনতা হরণ করা কি তোমার জাতির উচিত? দেখ আমিও এক সময়ে তোমাদিগকে এইরূপ তুচ্ছজ্ঞান করিতাম। আমিও এক সময়ে হিমগিরির উচ্চ শৃঙ্গে সমাসীন হইয়া এই লাঙ্গুল বিস্ফোটন পূর্ব্বক কতই আত্ম গরিমা দেখাইয়াছি! ভাই বল দেখি, তখন তুমি আমাকে দেখিলে কি করিতে? তখন কি এইরূপ আমার নিকটে আসিয়া, এইরূপ বঙ্কগ্রীব হইয়া দাঁড়াইতে পারিতে? তাহা দূরে থাকুক তখন তুমি আবার আবাস স্থানের নাম মাত্র শ্রবণে সে পথে যাইতেও সাহসী হইতে না। সে কথা যাউক, তুমি কি বিবেচনা কর যে তুমি পরাক্রমে আমাকে এ অবস্থাপন্ন করিয়াছ? যদি তাহাই ভাবিয়া থাক, তবে ভাই একবার আমাকে ছাড়িয়া দিয়া দেখ। আরও ভাই ভাবিয়া দেখ, তোমারই চিরদিন কি এইরূপে যাইবে? এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে তুমি কি চিরদিন এই অবস্থায় থাকিতে পাইবে? তোমার সে রাম কোথায়? সে পাণ্ডব কোথায়? সে সাম্প্য ঋষিকুল কোথায়? অধিক কি এই যে তুমি আজি আমাকে দেখিবার নিমিত্ত এইস্থানে আসিয়া

মনের সন্তুষ্টি বিধান করিতেছ, আজি কি তুমিও আমার সমানাবস্থ নহ!” আমার হৃদয় দুর দুর করিয়া উঠিল, তীব্র বেগে ধমনীতে রক্তস্রোত প্রধাবিত হইল, লজ্জায় মস্তক অবনত হইয়া আসিল, পা আর উঠে না, পশু তাহাকে আবার লজ্জা কি? কে জানে আমার বড় লজ্জা হইল, আমি অনেক কষ্টে তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। বড় ধিক্কার হইল, মনে করিলাম, আর এ স্থানে থাকিয়া কাজ নাই চলিয়া যাই। কতকদূর যাইয়া একটী সুন্দর দৃশ্য দেখিতে পাইলাম। লতা বৃতি পরিবৃত সুন্দর বর্ত্মসমূহ; তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম,—দেখিলাম কত শত পথ রহিয়াছে, আবার কতকদূর যাইয়া দেখিলাম সে পথ বন্ধ। প্রত্যাবর্ত্ত হইলাম, পথ নাই, আবার অন্য দিকে যাইলাম, এইরূপে অনেকক্ষণ ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে তাহার মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলাম। পাঠক! এটী কি তাহা জান? “গোলক ধাঁধা।” এমন সুন্দর বস্তু আমি ইহ জন্মে দেখি নাই। মরি! মরি! কোন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি ইহার নির্ম্মাণ কর্ত্তা! যিনি এই ধাঁধা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাঁহার পদরেণু গ্রহণ করিবার বাসনা হয়, কারণ তিনি সংসারে যে কি প্রকারে ধাঁধা মানবকে ভ্রান্ত করে তাহা বুঝিয়া ছিলেন, সংসারে কত প্রকার ধাঁধা আছে তাহা জানিতেন। আহা! ইহার প্রত্যেক পথ সংসারচক্রের চঞ্চল পরিবর্ত্তনের সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু ধাঁধা লাগায় কে? আশা! বটেত, আশাই ত আমায় এখানেও ধাঁধা লাগাইয়া দিল। দেখিতে গেলে পৃথিবীর সকল কার্য্যের সহিত গোলক ধাঁধার তুলনা করা যায়। প্রথম দেখ—আশা। আমি এক আশা করিলাম, কিন্তু অন্য প্রকার ফল হইল। গোলক ধাঁধার এ পথে গেলাম দেখিলাম পথ বন্ধ। সংসারে জন্মগ্রহণ করিলাম, মাতা পিতা ভ্রাতা ভগিনী ভিন্ন আর কি জানিতাম? আনন্দময়ী জননীর ক্রোড়ে উঠিলে যত আনন্দ হইত তত আনন্দ আর কোথায় ছিল, পিতা সস্নেহে মুখচুম্বন করিলে আনন্দ রাখিবার স্থান থাকিত না। কিন্তু হায়রে, কাল! তুই কি না করিতে পারিস্? বয়ক্রম বাড়িল, যৌবনে পদার্পণ করিলাম, জীবনসঙ্গিনী প্রিয়তমাকে পাইলাম, কই আর ত জননীর সেই প্রীতিপ্রফুল্ল মুখারবিন্দ সদত অবলোকন না করিলেও মন সেরূপ বিষাদিত হয় না। যাঁহাকে

বাল্যাবস্থায় একদণ্ড না দেখিলে মস্তকে বজ্রাঘাত হইত, আকাশ পাতাল সমান দেখিতাম, কই এখন ত আর তাঁহার ক্ষণিক অদর্শনে সে হৃদয়বিদারী ব্যথা অনুভব করিতে হয় না। যে পিতাকে ক্ষণেক না দেখিলে কত ক্লেশ হইত এখন ত আর সেরূপ হয় না, এখন সন্তানের হাসি ভরা মুখ দেখিতে পাগল, সংসার তোরে বলিহারি! আর গোলক ধাঁধা নির্ম্মাণকর্ত্তা তোরেও বলিহারি!

সুধু তাই নয়,—সংসারের কার্য্যকারিতা দেখ, আর আমার এই সর্ব্বসন্তাপহারী গোলক ধাঁধার কার্য্যকারিতা দেখ। এত ক্লেশ করিয়া মধ্য স্থলে আসিয়াছি, আর কি, এবার নিমেষ মধ্যে বহির্গত হইব। আমি বিশেষ পটুতার সহিত না আসিতে পারিলে হয়ত আমায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া সারা হইতে হইত, কিন্তু আমার কপাল বড় জোর, আমার প্রতি দেবতাকুল বড় প্রসন্ন যে আমি এই শতবেষ্টনী পরিবৃত ভ্রান্তিবিধায়ক চক্রবৎ পথসমূহ অতিক্রম করিয়া এতদূর আসিয়াছি। এইবার বাহির হই, ওমা! এ আবার কি? আবার যে সেই ধাঁধা! সংসারেও এ ক্রীড়া বিরল নহে, ধোঁকার মজা সংসারে প্রচুর। যৌবনে কত শত বাধা চরণে বিদলিত করিয়া জীবনযাত্রা যেন তেন প্রকারেণ নির্ব্বাহ করিলে। মনে করিলে বার্দ্ধক্যে সুখী হইবে, কিন্তু তাহা কোথায়! আবার যে ধাঁধা সেই ধাঁধা। প্রথম জীবনে মাতা পিতা হারাইলে, যৌবনে তোমার দক্ষিণ হস্ত, বশম্বদ ভ্রাতা তোমায় ত্যাগ করিল, পুত্র উপযুক্ত হইয়া উঠিতেছে, আর চিন্তা নাই কিন্তু ঈশ্বর তোমায় আবার ধাঁধার আবর্ত্তে ফেলিয়া তাহাকেও আত্মসাৎ করিলেন, মনে করিলে তোমার কনিষ্ঠ পুত্র তোমার বার্দ্ধক্যের একমাত্র সহায় হইবে। হরি! হরি! সব গেল, তোমার সেই অন্তিমকালে, তোমার জীবন দীপের সেই স্তিমিতপ্রায় সময়ে, অর্থাৎ যখন বিভীষিকাময়ী সংসার তাহার সহস্র জিহ্বা বাহির করিয়া তোমার অস্থি লেহন করিতে উদ্যত হইয়াছে, সেই সময়ে তোমার একমাত্র সহায়, অন্ধের যষ্টি, আশার প্রদীপটীও নিবিল, এ দুঃখ কি রাখিবার স্থান আছে! কিন্তু উপায়ই বা কি? যাহাই হউক গোলক ধাঁধা তোরে বলিহারি, তুই সকলকে সকল বুদ্ধি প্রদান করিস্, যে তোমার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া একবার চক্ষু উন্মীলিত করিয়া তোমায়

দেখে, তাহার এক মুহূর্ত্তে সকল জ্ঞান জন্মে। তাহার সমস্ত অন্ধতা দূর হয়। অতএব গোলক ধাঁধা তোমার চরণে প্রণাম, আমি আজি হইতে দিবারাত্র তোমায় স্মরণ করিব ও সংসারের সকল চিত্রের সহিত তোমার তুলনা করিয়া মনে মনে আনন্দিত হইব। গোলক ধাধায় প্রবেশ করিয়া সংসার ধাঁধা আরও উজ্জ্বলতর বলিয়া বোধ হইল, আমি সেই চিন্তায় গাঢ়রূপে নিমগ্ন হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। তখন চন্দ্র আমার বিড়ম্বনা দেখিয়া হাসিতেছিল, অসংখ্য তারকারাজি বিদ্রূপ করিতেছিল, অগণ্য ঝিল্লীগণ আপন আপন স্বরে চীৎকার করিয়া পরিহাস করিতেছিল, আমার তাহা সহ্য হইল না, আমি মস্তক অবনত করিয়া ধীরে ধীরে তথা হইতে গৃহে প্রস্থান করিলাম।

প্রণয়িনী।

১

জীবনের স্রোত কেন এক ভাবে বয় না,
বিহীন তরঙ্গচয়, স্থির ভাব সমুদয়,
হাসিতে হাসিতে কেন ধীরে ধীরে ধায় না?
যথা হাসে পুরবধূ, পতি সুখে মৃদু মধু,
কুটিল প্রেমের ভাব মনে যবে হয় না,
তেমতি মাধুরীময়, মন প্রাণ এ হৃদয়,
শান্তির সুখের হ্রদে কেন মগ্ন রয় না?

২

কভু হাসে কভু কাঁদে কেন মন হেন রে,
এ জীবন সুখময়, কেন মনে নাহি হয়,
কভু বা সুখের ধরা, কভু সম কারা রে,

ওই যে বিমান ভালে, কি শোভা কৌমুদী জ্বালে
হাসি হাসি শশধর ক্রমে সরে যায় রে,
নিয়তি কালের করে, সে শোভায় ধ্বংশ করে,
মলিন অম্বরে ধরা বিষাদেতে রয় রে,
কালের চক্রের দেখ কত ফের হয় রে!

৩

নৈশমন্দ সমীরণ ধীরে ধীরে বহিছে,
রক্তিম বরণ ধরি, পশ্চিম রঞ্জিত করি,
প্রবীন তপন ওই শান্তি আশে ধাইছে,
কুলায় বিহগ দল, ধায় করি কোলাহল,
চক্রবাকী অভাগিনী ওই দেখ কাঁদিছে,
অপার আনন্দভরে, কুলবালা ঘরে ঘরে,
স্ফুরিত আননে ওই শঙ্খ ধ্বনি করিছে
অনন্ত সুখের স্রোতে ত্রিভুবন ভাসিছে।

৪

হাসিছে আজিকে যেই কালি পুন কাঁদিবে,
নিয়তির গতি হায়, কে খণ্ডিতে পারে তায়,
জীব জন্তু যত সদা সেই পথে ভ্রমিবে,
হেন সুখী কেবা আছে, দুঃখ হায় যার কাছে,
দেখাবেনা ভীমমূর্ত্তি স্থিরভাবে রহিবে,
বদন ব্যাদান করি, গ্রাসিবেনা আহা মরি—
তৃপ্তির অনন্ত সুখে চিরকাল রহিবে।
তাও কি কখন হয়, সে যে হইবার নয়,
কাঁদিতে জনম ভবে অবশ্যই কাঁদিবে;
আজি মুখ হাসি ভরা, কালিকে বিষাদ জরা,
বিধাতার লিপি হায় কে খণ্ডিতে পারিবে?

৫

পতি সুখে আদরিণী কেহ মৃদু হাসিছে,
কেহ বা জীয়ন্তে মরা, পতি সত্ত্বে পতি হারা,
নিঠুর স্বামীরে স্মরি ধীরে ধীরে কাঁদিছে,
কাহার বৈধব্য দায়, ভীষণ বড়বা প্রায়,
হৃদয়ের স্তরে স্তরে ভীম অগ্নি জ্বলিছে।
সুদীর্ঘ নিশ্বাস সহ, আঁখিনীরে অহরহ,
নিরজনে বসুধার বক্ষঃস্থল ধুইছে।
নিদ্রার কোমল কোলে, কত জ্বালা লোকে ভুলে,
কেবল অবলা প্রাণ বিষাদেতে দহিছে,
স্বপনে চমকি আহা ধীরে ধীরে কাঁদিছে।

৬

বিমল অম্বর দেশে, কাদম্বিনী যায় ভেসে,
ভাঙ্গা ভাঙ্গা গুঁড়ি গুঁড়ি কিবা শোভা ধরিল,
দেখিয়া মানস প্রাণ, হ'ল যেন ম্রিয়মান,
দেখাব এ শোভা কারে বলি প্রাণ কাঁদিল;
হৃদয় আকাশ প'রে, কি সুন্দর শোভা ক'রে,
প্রিয়ার বদন শশী ধীরে ধীরে উদিল।
'প্রেয়সী আমায়' ব'লে, ডাকিলাম কুতূহলে,
কেহ অভাগার স্বরে কথা নাহি কহিল,
বিষাদে বলিল মন, 'কোথা মোর প্রাণধন,'
সুতপ্ত নয়ন নীর ধরা প'রে পড়িল।

৭

কোথা প্রাণ প্রিয়তমে একবার এস না,
তোমার বিচ্ছেদে হৃদি, কাঁদিতেছে নিরবধি,
তাপিত পরাণ প্রিয়ে দেখা দিয়ে তোষ না?

হৃদয় অন্তর স্থল, দহিতেছে অবিরল,
প্রেমের প্রবাহ তাহে সযতনে ঢালনা,
সেই মত অনুরাগে, ভালবাসা প্রেমরাগে,
দেখাও ভবের সুখ, দূরে যাক্ ভাবনা।
আবার আনন্দে মাতি, কাটাই দিবস রাতি,
ভুলে যাই বিভীষণ বিরহের যাতনা।
আর প্রিয়ে কভু যেন, বিষাদিত করি হেন,
একাকী ফেলিয়া মোরে কোনস্থানে যেওনা,
জননী জনম-ভূমি দেখিবারে চেওনা।

বিজয় সিংহ।

(উপন্যাস।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—000—

কর্দ্দমে নলিনী।

জ্যৈষ্ঠমাস, পশ্চিমগগনে প্রবীণ তপন তাহার রূপের অপূর্ব্ব ছটা প্রদর্শন করিতেছে। সেই জ্যোতিতে গগনপট সমাচ্ছাদিত, তরুশাখা মৃদু সমীরণ সহকারে সূর্য্যরশ্মি মাখিয়া ধীরে ধীরে নর্ত্তিত। এমত সময়ে গোদাবরীর বক্ষস্থিত ক্ষুদ্র বিচীশ্রেণি ভগ্ন করিয়া একখানি ক্ষুদ্র তরণী

* আমরা পাঠকগণকে গুটিকত কথা বলিয়া এই উপন্যাস খানি আরম্ভ করিব। এখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস নহে, যদিও পাঠকালে অনেক সময় পাঠকগণের গ্রন্থখানিকে ঐতিহাসিক বলিয়া ভ্রম জন্মাইতে পারে, তথাপি ইহার কোন অংশ ঐতিহাসিক নহে। বস্তুত বলিতে কি

যাইতেছিল। তরণীখানি সাতিশয় পারিপাট্যের সহিত সুসজ্জিত, কর্ণধার ও তরণীবাহকদিগের পরিচ্ছদও অতি পরিপাটি এবং মূল্যবান্। তরণীর পশ্চাৎদিকে প্রায় দ্বাদশজন অস্ত্রধারী পুরুষ, মধ্যস্থলে একটি অতি রূপবান্ যুবক মনোহর বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছিলেন। কখন আকাশের রমণীয় শোভা, কখন বা সেই বিচীমালা-পরিশোভিনী স্রোতস্বিনীবক্ষে সূর্য্যকরজালের অপূর্ব্ব ক্রীড়া, কখন বা সেই তটস্থ বৃক্ষবল্লরীর আরণ্য প্রণয় দেখিয়া মনে মনে অননুভূত আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। ক্রমে সূর্য্যকিরণ স্তিমিত হইল, পূর্ব্বগগনে সহাস্য আননে কুমুদিনীনায়ক জগৎ সংসারকে হাসাইতে হাসাইতে সমুদিত হইল, গগনপটে সুধাংশুকে অবলোকন করিয়া যেন কলস্বনে কল্লোলিনী হাসিতে হাসিতে আবার নবীনবেশে বিভূষিতা হইয়া প্রধাবিত হইতে লাগিল, সে শোভা অপূর্ব্ব, জগজ্জন মনমোহনকারী। আমাদের পূর্ব্বপরিচিত যুবাটি এই সমস্ত প্রকৃতিশোভাবিমোহিত হইয়া যাইতে যাইতে সহসা তটে কি একটি পদার্থ অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ওটি কি?" পশ্চাদ্দেশ হইতে জনৈক অস্ত্রধারী পুরুষ করপুটে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল "ছায়া হইবে।"

"ছায়া? সম্পূর্ণ অসম্ভব, দেখিতেছ না যে উহা চন্দ্রকরে যেন প্রদীপ্ত হইতেছে।"

গ্রন্থকার প্রথমে গ্রন্থখানিতে ঐতিহাসিক উপন্যাস করিতে বাসনাকরেন এবং তদনুযায়ী লিখিতও হয়, পরে দেখিলেন যে বিজয় সিংহকে ঠিক ঐতিহাসিক উপন্যাস করিলে ইতিহাসের কুৎসিত অংশ গ্রহণ করিয়া এই পতনশীল ভারতের উর্দ্ধতন বিখ্যাত রাজপুতদিগের উজ্জ্বল নামে কলঙ্কারোপ করা হয়। ভারতমুখোজ্জলকারী জগৎপূজ্য বীরাগ্রগণ্য রাজপুতগণকে ত্যাগ করিয়া কতিপয় কাপুরুষের উল্লেখ করতঃ ইতিহাসের নিন্দা করিয়া আর্য্যবংশের অবমাননা করা হয়। ইহাতে যতদূর সাধ্য ইতিহাসের অংশ ত্যাগ করা হইয়াছে যাহা আছে, তাহা অতি সামান্য, সুতরাং বিজয় সিংহ সম্বন্ধে ইতিহাসের অংশ লুপ্ত হইল। ইহার আরঙ্গজেব, শিবজি, বিজয় সিংহ, প্রতাপ সিংহ প্রভৃতি কেহই প্রকৃত, উক্ত নামধারীগণের প্রকৃত চিত্র নহেন। যদিও স্থানে স্থানে তাহাদের সহিত ইহাদের চরিত্রগত ঐক্য দেখা যায় তথাপি তাহা কিছুই নহে বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। পাঠকগণ বিজয় সিংহের সহিত ঐতিহাসিক সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া পাঠ করিবেন, ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

অপর জনৈক ব্যক্তি কহিল " মহারাজ! উহা কোন পদার্থ বলিয়া বিবেচনা হইতেছে। "

যুবক কহিলেন " যাহাই হউক দেখা আবশ্যক। "

নাবিকেরা তৎক্ষণাৎ তদ্দিকে নৌকা চালনা করিল, ক্রমে তরণী তন্নিকটস্থ হইলে সকলেই দেখিলেন যে অৰ্দ্ধবিবসনা একটি সযৌবনা অপূৰ্ব্ব রমণী; তাঁহার কেশ বস্ত্র ও অঙ্গে গাঢ়রূপে কর্দ্দমরাশি বিলেপিত রহিয়াছে। দেখিবামাত্রই সকলের শব বলিয়া প্রতীতি জন্মিল, কিন্তু যুবকের মন তাহা বুঝিলনা তিনি তীরে নামিলেন, অনেকক্ষণ পরীক্ষাদ্বারা জানিলেন যে রমণী তখনও জীবিতা আছেন।

পাঠক! এ যুবকটির সহিত তোমার পরিচয় করিয়া দি। ইনি রাজপুতানার কোন এক প্রদেশের মহারাজা, নাম বিজয় সিংহ। বিজয় সিংহ সেই রমণীকে নৌকার উপরে তুলিবার জন্য সমভিব্যাহারী রক্ষিবর্গকে আদেশ করিলেন, নিমেষ মধ্যে আজ্ঞা প্রতিপালিত হইল। নৌকা ছাড়িতে বলিয়া বিজয় সিংহ জলদ্বারা স্বহস্তে রমণীর অঙ্গের কর্দ্দমরাশি মুছিয়া দিতে লাগিলেন। কর্দ্দমে নলিনী নিপতিতা হইলে কি তাহার মাধুৰ্য্য বিলুপ্ত হয়? সুতরাং এ অবস্থাতেও রমণীর রমণীয় সৌন্দৰ্য্যরাশি যেন উছলিয়া পড়িতে ছিল। রমণীর চারু অঙ্গ শীতল হইয়া গিয়াছে, দেখিয়া বিজয় সিংহ আপন বস্ত্রাদি দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত করিয়া মোহ অপনোদনের নিমিত্ত অশেষবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিজয় সিংহের সকল যত্ন, সকল ক্লেশ ব্যর্থ হইল না, ক্রমশঃ রমণীর দেহ উষ্ণ হইয়া আসিল, দেহের লাবণ্য সমুজ্জ্বল হইল, কমলিনীলাঞ্ছিত নিমিলিত নেত্রদ্বয় উন্মীলিত হইয়া বদনের আবার অন্যতর শ্রী সম্পাদন করিল। বিজয় সিংহ এরূপ অবস্থা দেখিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, তাঁহার যত্নে যে একজন রমণীর প্রাণরক্ষা হইল এ সন্তোষ আর তাঁহার হৃদয়ে ধরিতে ছিল না।

বিজয় সিংহ যুবতীর বদনে অল্পপরিমাণে দুগ্ধ দিলেন, রমণী তাহা গলাধঃকরণ করিল, বিজয় সিংহ তাহাকে ক্ষুধার্ত্তা বিবেচনা করিয়া আবার দুগ্ধ দিলেন; রমণী তাহাও পান করিল। এইরূপে কিয়ৎপরিমাণে দুগ্ধ উদরস্থ হইলে রমণীর যেন কিছু বলের সঞ্চার হইল, বোধ হইল যেন বলের সহিত

জ্ঞানেরও পরিপুষ্টি সংসাধিত হইয়া লজ্জার উদ্রেক হইল,—রমণী স্বীয় অবগুণ্ঠন সংস্থান করিবার চেষ্টা করিলেন। তদ্দৃষ্টে বিজয় সিংহ কহিলেন "ব্যস্ত হইবেন না, লজ্জার সময় আছে।"

রমণী কথা কহিবার চেষ্টা করিল কিন্তু কৃতকার্য্য হইয়া উঠিলেন না।

ক্রমে তরণী রাজধানীতে উপস্থিত হইল, রাজপ্রাসাদের ঘাটে আসিয়া তরণী লাগিল। চতুর্দ্দিকে মঙ্গলসূচক বাদ্য ও আনন্দসূচক ধ্বনি হইল। বিজয় সিংহ অতি সাবধানে রমণীকে শিবিকামধ্যে তুলিয়া দিয়া শিবিকা অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। রমণীর অন্তঃপুর মধ্যে পৌঁছিবার অনতিবিলম্বেই স্বয়ং মহারাজ বিজয় সিংহ একজন উপযুক্ত জীবক সমভিব্যবহারে তথায় উপনীত হইয়া যথাবিহিত চিকিৎসা ও শুশ্রুষা দ্বারা তাহাকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া তুলিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিধাতার বিড়ম্বনা।

পূর্ণিমা-রজনী, নীল নভস্তলে সহাস্য আননে কুমুদিনীনাথ বিহার করিতেছিল। সেই কৌমুদীরাশি প্রকৃতি সতীকে রজতাবরণে আচ্ছাদিত করিয়া হাসাইতেছিল। প্রকৃতি গম্ভীর অথচ শান্ত। সেই সময়ে প্রতাপ সিংহের দুর্গ সুধাধবলিত অঙ্গে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া নয়নানন্দ বিধান করিতেছিল। প্রতাপ সিংহ রাজপুত বংশোদ্ভব মহারাজ সত্ত্বেও একজন প্রকৃত কাপুরুষ ব্যতীত কিছুই ছিলেন না। যখন বাদসাহ জাহাঙ্গির দিল্লির সিংহাসনে সমাসীন, যখন তাহার ইঙ্গিতে সমগ্র ভারত বিকম্পিত হইত তখন প্রতাপ সিংহ একজন বৃদ্ধ ও জাহাঙ্গিরের অনুগ্রহপ্রার্থী করদ রাজা ছিলেন। বৃদ্ধ মহারাজ বিশেষরূপে বুঝিতেন যে জাহাঙ্গিরের অনুগ্রহ ব্যতীত কিছুই কিছু নহে, এই সম্মানসুচক রাজো-

পাধি সামান্য ছায়াবাজি মাত্র, দিল্লীশ্বরের এক কটাক্ষের উপর তাহার স্থিতি ও লয় সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করে।

প্রতাপ সিংহের উদয় সিংহ নামে এক পুত্র ও কমলা নাম্নী একটি কন্যা ব্যতীত অপর কেহ ছিল না। প্রতাপ সিংহ তাঁহার রাজধানীতে না থাকিয়া প্রায়শঃ তাঁহার মরিলার দুর্গে অবস্থান করিতেন। আজি সেই মরিলার দুর্গশিখরে দুইটি রমণী কি কথোপকথন করিতেছে। একটির বয়ঃক্রম অন্যূন পঞ্চদশ বৎসর। অবয়ব পূর্ণ, বর্ণ উজ্জ্বল গৌর—উন্নত নাসিকা, সুটানা নয়ন, যুগ্ম ভ্রূ, মনোহর রাজপুত বেশ পরিহিতা, তাহাতে কৌমুদীরাশি নিপতিত হইয়া সমধিক উজ্জ্বল ও শোভাময় করিয়াছে। অপর রমণীটী প্রায় পঞ্চবিংশ বর্ষীয়া, দেখিতেও মন্দ নহে, এটী অপরার দাসী সরমা—প্রথমা রমণীটী জয় সিংহের কন্যা কমলা।

কমলা সখীকে কহিলেন "সরমে! পুরুষে স্ত্রীলোকের অন্তঃকরণ কি এতই ক্ষুদ্র বিবেচনা করেন? তাঁহারা হিতাহিত যাহা বলিবেন তাহাই করিব? আমরা একেত অন্তঃপুরবাসিনী বন্দিনী মাত্র তাহাতে যদ্যপি মনোমত ধনে আত্মসমর্পণ করিতে না পাই তবে জীবনে প্রয়োজন?"

সখী ক্ষণেক অধোবদনে রহিয়া কহিল "মহারাজ মনে করিয়াছেন যে তোমায় জাহাঙ্গির তনয় জাফরের ক্রোড়ে সমর্পণ করিলেই জাহাঙ্গির সন্তুষ্ট হইবেন, ও তাঁহার সহিত বিশেষ সখ্যতা হইবে, কিন্তু জাহাঙ্গির সহজ লোক নহে।"——

কমলা। সে যাহা হউক,—কিন্তু বিবেচনা কর দেখি যে, পিতার কতদূর নিষ্ঠুরতা, যে আমি রাজপুতমহিলা বলিয়া দর্প করিয়া থাকি, বীর রাজপূত প্রসবিনী হইব বলিয়া, হৃদয়ে অনন্ত আশাকে স্থান দিয়াছি, আজি সেই আমি অস্পৃশ্যা যবনী হইব? হা বিধাতঃ! কমলা কি এই অপমান সহ্য করিতে প্রতাপসিংহের কন্যা হইয়াছিল? সিংহী শৃগাল সহবাস করিবে!

কমলা কাঁদিল, পরিচারিকা স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা নয়নবারি মুছাইয়া দিল। পরে আবার বলিতে লাগিল "সরমে! রাজা হওয়া কি পাপ!

স্বীয় উন্নতি অবনতির জন্য তাহারা কি না করে, সামান্য ব্যক্তিরা যে কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হয় একজন নরপতি অম্লানবদনে সে কার্য্য করিতে পারেন! সখি! আমি যদি রাজকন্যা না হইয়া একজন দরিদ্র রাজপুত বালা হইতাম তাহা হইলে আমার কত আনন্দ, কিন্তু আমি হতভাগিনী আমার কপালে সে সুখ হইবে কেন?

সরমা। সে কি সখি, রাজনন্দিনী হইলেই কি দুঃখিনী হয়, যাহার কপালে বিধাতা সুখ লিখেন নাই তাহার কোথাও সুখ নাই।

কমলা। না সখি, সাধারণ রমণী অপেক্ষা রাজপুত্রীরা মন্দভাগিনী।

সরমা। ঈশ্বর কখনই তোমায় মনকষ্ট সহ্য করিবার জন্য রাজনন্দিনী করেন নাই, তোমার পূর্ব্বজন্মকৃত সুকৃতির বলে রাজপুত্রী হইয়াছ, তুমি কখনই দুঃখিনী হইবে না।

কমলা ঈষৎ হাসিয়া কহিল "সখি! তুমি প্রলাপ বলিতেছ। ভাগ্যবতী কে? যে সুখী। কিন্তু আমি কি সুখিনী? আমার হৃদয়ে যেরূপ অসংখ্য বৃশ্চিক দংশন করিতেছে এমন আর কাহার করে?

সরমা। রাজপুত্রি, তুমি কেন মহারাজকে বললা যে আমি জাফর কে বিবাহ করিয়া জাতিভ্রষ্টা হইব না।

কমলা। সরমে! সংসারে যাহার মা নাই তাহার আর কে আছে? আজি যদি মা থাকিতেন তাহা হইলে কি পিতা একথা মুখে আনিতে পারিতেন?

সরমা। তুমি কেন বলিয়া দেখিলে না?

কমলা। পিতা ত বালক বা নির্ব্বোধ নহেন। সে দিবস দাদা কত নিষেধ করিয়া বলিলেন যে "আমার সুখ বা প্রতিপত্তির নিমিত্ত কমলার সুখের পথে কাঁটা দিবেন না। তাহাতে মহারাজ কত রাগান্বিত হইলেন, বলিলেন "আমার অপেক্ষা কি কমলা তোমার অধিক যত্নের সামগ্রী? আমি তাহার সুখ নষ্ট না করিয়া বরং বৃদ্ধির উপায় দেখিতেছি। কমলার রূপগুণে জাফর নিতান্ত বশ্য হইবে, তাহা হইলে আর কি বাকি রহিল? যে দিল্লীশ্বর জগদীশ্বরের সহিত তুলনীয় সেই দিল্লীশ্বর কমলার বশম্বদপতি হইল, ইহা কি সুখের কথা নহে।" দাদা বলিলেন "জাফর যে

বাদসাহ হইবে তাহা কিরূপে জানিলেন ?" পিতা উত্তর দিলেন "জাহাঙ্গির যে রূপে হইয়াছে।" দাদা কহিলেন "তাহার সহায়তা করিবার বিস্তর লোক ছিল, কিন্তু জাফরের সহায়তা কে করিবে ?" পিতা কহিলেন "আমরা করিব।" দাদা ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন "যদি এতদূর করিতে প্রস্তুত আছেন তবে কেন কোন রাজপুত্রের সহিত কমলার বিবাহ দিয়া তাহাকে দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় করিতে চেষ্টা করুন না ?" পিতা রাগ করিয়া কহিলেন "সে পরামর্শ তোমার সহিত করা যাইতেছে না।"

সরমা। মহারাজের বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পেয়েছে ?

কমলা। তাহাও আমার কপালগুণে।

সরমা। যাতে ভাল হয় তার উপায় দেখ, এ কথা শুনে অবধি তুমি স্নানাহার ত্যাগ করেছ। তেমন যে রূপ তাহা কালিমা প্রাপ্ত হয়েছে। এমন করিলে কদিন বাঁচিবে ?

কমলা। এ জন্মে আবার বাঁচিতে হইবে ? এখন ও যে বাঁচিয়া আছি ইহাই বিচিত্র। আর রূপের কথা কি কহিতেছ সখি ! ছি ! ছি ! ওকথা আর মুখে আনিও না। রূপের কথা শুনিলে কে যেন আমার শরীরে অনন্ত বিষপ্রবাহ ঢালিয়া দেয়। আমায় যদ্যপি ঈশ্বর অতি কুরূপা করিয়া স্বজন করিতেন তাহা হইলে ত আজি আমি সুখিনী হইতাম, কিন্তু আমি হতভাগিনী, ঈশ্বর আমার রূপস্বরূপ মহাপাপ দিয়া আমার সর্ব্বনাশের সকল পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন।

কমলা কাঁদিতে লাগিল, সরমা তাহার নয়ন মুছাইয়া দিয়া কহিল "সখি ! তুমি কাঁদিও না, ঈশ্বর দয়াময়, তিনি কখনই তোমায় এত দুঃখ দিবেন না।"

কমলা। তিনি ত দয়াময় কিন্তু আমি যে মহা পাতকিনী, আমি পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব, তিনি কি করিবেন !

সরমা। ওকথা কি বলিতে আছে ?

কমলা। কেন বলিব না, আমার কপাল যদি মন্দ না হইবে, তবে এত কথা হইবে কেন ?

সরমা। আমি ইহার উপায় করিতেছি।

কমলা। কি উপায়?

সরমা। মহারাজ বিজয় সিংহ দ্বারা মহারাজকে অনুরোধ করাইব, মহারাজ তাঁহার কথা বড় শুনেন, একথা কি শুনিবেন না? অবশ্যই শুনিবেন।

কমলার চক্ষে জল আসিল, সরমা বলিল "কাঁদিতেছ কেন সখি!"

কমলা। কই কাঁদি নাই!

সরমা। তোমার চক্ষুভরা জল তবু কাঁদ নাই?

কমলা নীরব হইয়া রহিল, অনেকক্ষণ পরে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

সরমা কমলার হাত ধরিয়া কহিল "রাত্রি হইয়াছে চল নিদ্রা যাইবে।

কমলা। আমার কি আর নিদ্রা আছে।

সরমা। আমি তোমায় ঘুম পাড়াইব।

কমলা। চল যাইতেছি।

এই বলিয়া উভয়ে ধীরে ধীরে দুর্গশৃঙ্গ হইতে অবতরণ করিল। তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর, প্রকৃতি পূর্ব্ববৎ কিন্তু আরও গম্ভীর।

বঙ্গীয় কৌলীন্য প্রথা।

এই ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গে কে না স্বীকার করিবে যে কৌলীন্য নিয়ম-ঘটিত অত্যাচারে সকল সম্প্রদায় ও জাতিই প্রপীড়িত। কাহার কন্যাভার,—জাতিমধ্যে অপদস্থ, সমাজ হইতে পতন প্রভৃতি অসংখ্য যন্ত্রণা ও অগণ্য মনোদুঃখের কারণের ভিত্তি বলিয়া গণ্য। এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত ভারতে কৌলীন্য প্রথা বড়ই কষ্ট দায়ক হইয়া উঠিয়াছে। মনুষ্যের দুঃখ ভার বৃদ্ধি করিতে কৌলিন্য প্রথা নিতান্ত কমপাত্র নহেন।

তুমি দরিদ্র অথচ কুলীন, কন্যাভারগ্রস্ত হইয়াছ আর রক্ষা নাই। তোমার মাথা ঘুরিতে আরম্ভ হইল। প্রথমতঃ কন্যার বিবাহ দিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ সুপাত্র চাই। কুলীনের পণ্ডিত সন্তানের সহিত বিবাহ দিতে স্বর্ণ ঘড়ি চাহিয়া বসিবে, তুমি তা কোথায় পাইবে! সুতরাং মূর্খ দরিদ্র-কুলীনে কন্যা সম্প্রদান করিয়া সমাজের স্বজাতির চিরগঞ্জনা হইতে পরিত্রাণ পাইলে, কিন্তু এ বিবাহে কি তোমার মনস্তুষ্টি হইল? কখনই না। তুমি অনায়াসে অল্পব্যয়ে উত্তম মৌলিক সন্তানকে কন্যা সম্প্রদান করিয়া সুখী হইতে পারিতে কিন্তু কি করিবে, দেশাচার তোমায় তদপেক্ষা অধিক ব্যয় করাইয়া অপাত্রে কন্যা সম্প্রদান করাইল।

বল্লাল সেন এই মহা অনিষ্টকর কৌলীন্যপ্রথা সৃজন করেন। তন্নিমিত্ত তাঁহার উপর অজস্র অভিশম্পাত প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে দেখিতে গেলে আমরা তাঁহার অপরাধ দেখিতে পাই না, বরং সুখ্যাতি করিতে বাধ্য হই।

আদিশূর কোন কর্ম্ম উপলক্ষে কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত করিয়া আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাদের দ্বারা নিজ ইপ্সিত কার্য্য সমাধা করান। ঐ পাঁচজন ব্রাহ্মণ বিদেশ হইতে আনয়ন করার একমাত্র কারণ এই যে তৎকালে এদেশে শাস্ত্রজ্ঞ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ছিলেন না। যাহাই হউক ঐ পাঁচজন ব্রাহ্মণ এ দেশে বাস করেন। ক্রমে তাঁহাদিগের বংশবৃদ্ধি হওয়ায় তৎকালে বঙ্গরাজ বল্লালসেন তাঁহাদিগের সম্মান বৃদ্ধি জন্য এই কৌলীন্য প্রথার সৃজন করেন। ইহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে চরিত্রের ঔৎকর্ষের জন্য রাজদত্ত সম্মান প্রাপ্ত হইলে সাধারণের আরও উন্নত চরিত্র হইবার বাসনা জন্মিবে। বস্তুতঃ বল্লালসেনের এ অভিলাষ কথঞ্চিৎ সফলও হইয়াছিল।

বল্লালসেনের এই মহদভিসন্ধি সূচক এই কৌলীন্য প্রথা প্রচালন হেতু তাঁহার প্রতি দোষারোপ করা অন্যায় ও অসঙ্গত, কিন্তু তথাপি এমন দিন নাই, যে দিন কেহ না কেহ বল্লালসেনকে অভিশম্পাত না করেন, এমন রজনী নাই যাহাতে অসহায়া বিরহবিধুরা কামিনীর মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস বল্লালের শিরায় শিরায় অস্থিতে অস্থিতে প্রবিষ্ট হয় না। ইহার একমাত্র

কারণ বল্লালসেন প্রদত্ত ঐ সম্মান সম্মানধারীদিগের বংশাবলী ক্রমে পাইয়া আসিতেছেন। যদি বল্লালের উত্তরাধিকারিগণ ঐ সম্মান হইতে অযোগ্য ব্যক্তিদিগকে নিরাশ করিতেন তাহা হইলে আজি বল্লালসেনের জন্য চক্ষুজলে ভারত ভাসিয়া যাইত না। অথবা কুলীন মহীলাগণের হৃদয় পুড়িয়া খাক হইত না।

" আয় আয় সহচরী ধরিগে ব্রিটনেশ্বরী
করিগে তাঁহার কাছে দুঃখের রোদন "

ইত্যাদি দুঃখময়ী কবিতা পাঠ করিয়া ভারতবাসীমাত্রেরই চক্ষু ছল ছল করিত না।

জ্ঞানী মাত্রই মনুষ্যকে তাহার উপযুক্ত সম্মান দান ও সম্বৰ্দ্ধনা করিতে অনিচ্ছুক নহেন, যাঁহারা প্রকৃতই সাধুব্যক্তি তাঁহারা কুলীনপদবাচ্য হইলে দুঃখ কি? কিন্তু এক সম্প্রদায় চিরকাল বৃথায় কুলীন বলিয়া অভিহিত হউক—সমাজের উপর প্রভুতা বিস্তার করিতে থাকুক এবং অপর সম্প্রদায় বৃথা ও নিষ্কারণে তাহাদের পদানত হইয়া থাকিবে ইহা কখনই সহ্য হয় না।

বল্লালসেনের উত্তরাধিকারীও বিশেষ দোষী নহেন, কারন রাজা লক্ষণ সেন কর্ত্তৃক কৌলীন্য প্রথা সংস্কারের জন্য এক মহতী সভা আহুত হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তাহাতে বর্ষণ অপেক্ষা গর্জ্জন অধিক পরিমাণে হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পরে বিখ্যাত দেবীবর ঘটক কর্ত্তৃক কৌলীন্য প্রথা কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হয়। তিনি কুলীনদিগকে ছত্রিশ ভাগে বিভক্ত করেন ইহাই বঙ্গের সর্ব্বনাশের হেতু।

ভারত মুসলমান কর্ত্তৃক জিত হওয়াই কুলীনদিগের অবনতির প্রধান কারণ হইয়া উঠিল। তাঁহারা হিন্দু রাজাদিগের নিকটে যেরূপ সম্মান, দয়া ও আদর প্রাপ্ত হইতেন মুসলমান ভূপতিদিগের নিকট আর সেরূপ সম্মাননা প্রাপ্ত হইবার কোন প্রত্যাশা ছিল না, সেই জন্য তাঁহারা পুনশ্চ অধঃপতনের সোপানে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এবং এখন সম্পূর্ণ অধঃপতিত হইয়াছেন।

বঙ্গে দুঃখের আর একটী কারণ এই যে, দেবীবরনির্দ্দিষ্ট মেলবদ্ধ কুলীনেরা

অত্যন্ত ঈর্ষ্যা পরবশ হইয়া উঠেন এবং ক্রমশঃ বৈবাহিক নিয়ম সমস্ত অত্যন্ত কঠিন করিয়া তুলেন। এখন সেই বৈবাহিক কার্য্যের নিয়ম বড়ই কষ্ট-দায়ক হইয়া উঠিয়াছে। দেবীবরের মেলবন্ধ করিবার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, সদ্বংশে কন্যা আদান প্রদান নিয়মবদ্ধ হইলে অর্থাৎ কন্যা পাত্র উভয়ই সদ্বংশজাত হইলে তাহাদিগের বংশপরম্পরা ক্রমশঃ সৎই হইবে কিন্তু ইহার বিষময় ফল এই যে কন্যা সম্প্রদানের পাত্রা ভাবে বহুবিবাহের ক্রমশঃ আধিক্য হইতে লাগিল এবং কুলীনেরা গুণ সকল বর্জ্জিত হইয়াও আপনা-দিগকে অসামান্য মানী বোধে বৃথা গর্ব্বিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু যাহাদের বিষ নাই তাহাদের কুলা প্রায় চক্র বাহির করিয়া আস্ফালন ভাল দেখায় না!

কৌলীন্য প্রথায় যত প্রকার অনিষ্ট ঘটিয়াছে তন্মধ্যে বহু বিবাহের ন্যায় অনিষ্টকারক আর দ্বিতীয় নাই। এই বহুবিবাহ প্রথা শুনিলে কাহার হৃদয় না চমকিয়া উঠে, কে না মুক্তকণ্ঠে ব্যথিত হৃদয়ে বহুবিবাহ-কারী-দিগকে হৃদয়হীন অপদার্থ ব্যক্তি বলিয়া ঘৃণা করে? বহুবিবাহ-কারীদিগের বিবাহ করা একপ্রকার ব্যবসায়। তাঁহারা সময়মত শ্বশুরালয়ে যাইয়া অর্থ সংগ্রহ করেন বিবাহের উদ্দেশ্য তাঁহাদের নিকট এই মাত্র। দুঃখের বিষয় আরও শ্রুত হওয়া যায় যে তাঁহারা পরিণেত্রী দুঃখিনী অভাগিনী পত্নীর নিকট হইতে অম্লানবদনে অর্থ প্রার্থনা করিতে কিছুমাত্র লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হন না। আহা, কি যাতনা, কি দুঃখ! অবলা বঙ্গবালা যাহারা বহু বিবাহকারী দিগের পত্নী তাহাদিগের ইহ জগতে কি সুখ? বামাগণের যদ্যপি সুখ থাকে তাহা স্বামিসহবাস এবং স্বামীর স্নেহ যত্ন প্রেম ও আদর। কিন্তু যদ্যপি তাহারা ঐ সমস্ত হইতে বঞ্চিত হইল তবে তাহাদিগের,আর সুখ কোথায়? এই মহানিষ্ট-দায়ক বহু বিবাহে কৌতুকাবহ ঘটনা অনেক ঘটিয়া থাকে। কখন বৃদ্ধা রমণীর বিবাহ হয় কখন অজ্ঞানা কুমারীর পরিণয় কার্য্য বৃদ্ধের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। এ নিমিত্ত যে কত কুলকামিনীদিগকে অকালে বিধবা হইতে হয় বা যৌবনের দুর্ব্বিসহ যাতনায় বা অরক্ষিত অবস্থার প্রলোভনে নিপতিত হইয়া তদপেক্ষা আরও অধিকতর হৃদয় বিদারক কার্য্যে

প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। বহুবিবাহকারী বা এক প্রকার হৃদয়হীন ব্যক্তি, তাঁহারা স্ত্রী পুত্রদিগের প্রতি ভ্রমেও দৃষ্টিপাত বা তাহার ভরণ পোষণ করেন না, কেবল মধ্যে মধ্যে শ্বশুরালয়ে গমন করেন, তাহাদের উদ্দেশ্য দাম্পত্যপ্রণয় উপভোগ করা নহে, কেবল মাত্র ভ্রমণের চাঁদা বা বাৎসরিক বা ষাণ্মাসিক বা অন্যতম টেক্স আদায় করা মাত্র। আমরা বলি মনুষ্যহৃদয় দ্বারা ইহা অপেক্ষা আর কি গুরুতর কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে! আহা! এ জগতে এমন পাষাণহৃদয় নাই যাহা বহুবিবাহকারী দিগের হতভাগিনী বিধবা পত্নীদিগকে দেখিলে বিদীর্ণ হয় না।

যখন মহামতী লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কং সহমরণ প্রথা সহস্র সহস্র অভিযোগে কর্ণপাত না করিয়া উঠাইয়া ছিলেন, তখন যদ্যপি এই অনিষ্টদায়ক হৃদি বিদারক কৌলীন্য প্রথা উঠাইয়া দিতেন, তাহা হইলে যে বঙ্গের সমধিক মঙ্গলসাধন হইত তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু বঙ্গের ভাগ্যে সে সুখ ঘটিল না। কতকালে যে তাহা ঘটিবে তাহারও ইয়ত্তা নাই

আমরা শ্রুত হইয়া ছিলাম যে ডক্‌টর ডফ্ এই প্রস্তাব লর্ড ডেলহাউসির নিকট উত্থাপিত করেন কিন্তু সহসা তাঁহাকে সিপাহি বিদ্রোহে বিব্রত হওন জন্য সে কার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হন নাই। যাহাই হউক উক্ত কার্য্যে এ পর্য্যন্ত যে কোন দয়ালু গভর্ণর কেন হস্তক্ষেপ করেন নাই তাহা বুঝিতে পারি না। আমাদের একান্ত আশা যে লর্ড রীপন বাহাদুর এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া ভারতের একটি মঙ্গল করিয়া যান। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে এ রূপ নিয়ম বিধি বদ্ধ হইলে অনেকের মঙ্গল এবং সে বিধির নিমিত্ত কাহারও আর্ত্তনাদ বা সকরুণ রোদন কাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইবে না।

মুকুন্দ চরিত।

এই ক্ষণপরিবর্ত্তন শীল জগতের অভিনয় কার্য্যে মনুষ্য, পশু, পক্ষী জীবমাত্রেই অভিনেতা। তাহারা সকলেই ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনাপন অভিনেয় কার্য্য সমাপন করিয়া চলিয়া যাইতেছে। এই সকল অভিনেতাদিগের সংসার নাট্যশালায় স্থায়ী কি? নাটকাভিনয়ে সকল অভিনেতাই কি দর্শকবৃন্দের মনে স্থায়ী ভাব জন্মাইয়া আপন অভিনয়-স্মৃতি বলবতী রাখিতে পারেন? অভিনয়ের উৎকর্ষ অনুসারেই অভিনেতার নাম দর্শকসম্প্রদায়ের স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকে। এই সংসার ক্ষেত্র একটী নাট্যশালা এবং অত্রস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিই ইহার এক একজন অভিনেতা। তবে এই জগৎনাটক অভিনয়েই বা কেন বৈষম্য থাকিবে? এই নাটকাভিনয়েও মনুষ্য যত দীর্ঘ পার্ট লইয়া সুন্দররূপ অভিনয় কার্য্য সম্পন্ন করিবে তিনি ইহজগতে সেই রূপ স্থায়ী নাম ক্রয় করিয়া যাইবেন। এখন কতকটা বুঝিতে পারা যাইতেছে এই পঞ্চভৌতিক দেহের বিশ্লেষণে এই ধরণীধামে মনুষ্যের কি স্থায়ী হয়। পরলোক গত ব্যক্তির বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন ও পরিচিত ব্যক্তিগণের শোক যতদিন প্রশমিত না হয়, যতদিন তাঁহার আবশ্যকতা তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও পরিচিতগণের বিষয় কার্য্যে বা অন্যান্য প্রয়োজনে প্রয়োজিত হয়, ততদিন তিনি ইহ জগতে স্মরণীয়। কর্ম্ম এবং প্রয়োজনীয়তা অনুসারেই পরলোক-বাসীর স্মৃতি মনুষ্য মনে অল্প বা অধিক পরিমাণে কার্য্য করিয়া থাকে। কর্ম্ম অনুসারেই মনুষ্যের প্রয়োজনীয়তা, সেই প্রয়োজনীয়তা হইতেই লোক-স্মৃতি স্বতঃ মানব মনে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহলোকে যিনি যেরূপ কার্য্য করিয়া যান, সেই কার্য্য যখনই তাঁহাকে প্রয়োজন হয়, তখনই তিনি আমাদিগের মানস-ক্ষেত্রে আসিয়া উদিত হয়েন। অথবা আমরা যখনই তাঁহার কৃত কার্য্য দেখিতে পাই তখনই তাঁহার বিষয় চিন্তা করি। বীররস অবতরণায় কেন কুরুক্ষেত্রের স্মৃতি, কেন সেই ভীমার্জ্জুন,

দ্রোণ, কর্ণ অশ্বত্থামাদি বীরগণের স্মৃতি আসিয়া চিত্ত কম্পিত করে? সমর কৌশলে কেন হানিবল, সেকেন্দর এবং বোনাপার্টিকে দেখিতে পাই? স্বার্থত্যাগ এবং প্রতিজ্ঞা পালনের কথায় কেন প্রাতঃস্মরণীয় বিপুলতেজা ভীষ্ম মহাশয়কে মনে পড়ে? প্রজারঞ্জন গুণের কথা হইলে পৃথিবী মধ্যে আর কাহার নাম মনে না আসিয়া সর্ব্বাগ্রে কেন রবিকুলকেতু মহাত্মা রামচন্দ্রের নাম আপনা হইতে উপস্থিত হয়? প্রতিবিধিৎসার কার্য্যে কেন ভুবন বিজয়ী ধনঞ্জয়কে ক্রোধে জ্বলিত ভীম-মূর্ত্তি গাণ্ডীব হস্তে পুত্রহন্তা সিন্ধুরাজ পুত্রের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান দেখিতে পাই! কুমন্ত্রণার প্ররোচনায় কেন হস্তিনাপতির রাজপ্রসাদে পাশ-ক্রীড়ানুরক্ত যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধনাদির পার্শ্বে কুচক্রী, কুমন্ত্রণারূপী শকুনির পিতা স্মৃতি পথের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়? বাণীপুত্র কালিদাসকে কে দেখিয়াছে? শুদ্ধমতি, পবিত্রমনা মহর্ষি বাল্মীকি ও ব্যাসদেব যে সময়ে এই লীলাভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া যাঁহাদিগের দর্শন চরিতার্থ করিয়াছেন সেই পরিচয় দিতে তাঁহাদিগের কয়জন এখন জীবিত আছেন? সকলেই অনন্ত কালস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। কালিদাসের শকুন্তলা, বাল্মীকির রামচরিত, ব্যাসদেবের ভারত ভাগবতাদি পুরাণ তাঁহা-দিগের নাম ইহ জগতে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। যতদিন এই চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রাদি আকাশে চলিবে, পৃথিবী মানবগণের অধিষ্ঠান-ভূতা থাকিবে ততদিন তাঁহাদিগের চিত্র স্মৃতিপট হইতে কিছুতেই মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না। তাঁহারা ইহলোকে অক্ষয় অমর থাকিবেন।

অদ্য আমরা শীর্ষোক্ত স্বর্গবাসী মহাত্মার জীবনী সম্বন্ধে কিছু পাঠক-বর্গের সুগোচর করিতেছি। বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজের তিনি একজন শীর্ষস্থানীয়; এবং উন্নত কবিকুলের তুলস্থ। সংস্কৃত যে সময়ে আমা-দিগের পবিত্র মাতৃভূমির চলিত ভাষা ছিল, সে সময়ে আবির্ভূত হইলে তিনি ভারবী এবং তাঁহার কাব্য কারিতার্জ্জুনীয়ের সমস্থানীয়, হইত। তাঁহার রচিত "চণ্ডী" কাব্য ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, কাশী-দাসের মহাভারত, এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণ অপেক্ষাও প্রাচীন।

আমাদিগের দেশে জীবনচরিত লিখিবার প্রথা বড় প্রচলিত ছিল না।

আমরা যে সময়ের কথা উল্লেখ করিতেছি সে সময়ে বাঙ্গালাভাষা দুই তিন বর্ষ বয়স্কা বালিকার ন্যায় অসম্পূর্ণাঙ্গী; মাতৃক্রোড়শায়িনী, কচিৎ দণ্ডায়মানা হইয়া, কাহারও সাহায্যে দুই এক পদ গমনে সমর্থা। তৎকালে কবিতা ভিন্ন গদ্যে উপন্যাসাদি লিখিবার প্রথাই ছিল না, জীবন চরিত ত অনেক পরের কথা। কিন্তু তৎকালে জীবনচরিত লিখিবার প্রথা না থাকিলেও তিনি আপন উপাদেয় কাব্যের স্থানে স্থানে যে আত্মপরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার অবস্থাঘটিত স্থলে স্থলে অনেকগুলি বিষয় অবগত হইতে পারা যায়। আবার সেই সকল বিষয়গুলির দুই একটীতে এতদূর অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয়, যে কেবল মাত্র তদবলম্বনে তাঁহার জীবনচরিত লিখিতে হইলে ঘোরতর ভ্রমান্ধকারে পতিত হইতে হয়। যে সময়ে তিনি ইহলোকে বিরাজমান ছিলেন সে অনেক দিনের কথা, সে সময়ের কেহ এখন জীবিত নাই; যে তাঁহার নিকট হইতে সঠিক বিবরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। তবে তিনি আমাদিগের প্রতিগ্রামবাসী এবং তাঁহার বংশধরদিগের সহিত আমাদিগের পরিচয় থাকা বংশপরম্পরায় তাঁহার ইহলোক লীলা সম্বন্ধে যে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের রাজদত্ত যে সকল ভূসম্পত্তি লাভের নিদর্শন পত্র আজি পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে; এবং কবি স্বয়ং যাহা লিখিয়া গিয়াছেন সেই সকলের সমতা রক্ষা করিয়া, যতদূর অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহাই অত্রস্থলে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ কবির স্বহস্তলিখিত একখানি পুস্তক অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। পুস্তকখানির অবস্থা অতিশয় মন্দ, যারপরনাই জীর্ণ, তেড়েট পত্রে লিখিত; সেখানি অতি যত্নসহকারে কবির প্রতিষ্ঠিত সিংহবাহিনী দেবী প্রতিমূর্ত্তির সহিত একত্র রক্ষিত, এবং সচন্দন পুষ্পযোগে দেবীর তুল্য রূপে পূজিত। সিন্দুর চন্দনাদি-চর্চ্চনে উহার উপরিভাগ সুন্দররূপে চিত্রিত, আমরা অত্যন্ত অনুরোধে সেই পুথিখানি কিয়দ্দিবসের জন্য লইয়া দেখিয়াছিলাম; এবং তাহার প্রাচীনত্ব প্রতিপাদনের জন্য সুযোগ্য সাধারণী সম্পাদক মহাশয় সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলাম। তিনি সেই

পুস্তকখানিকে কবিকঙ্কণের সমসাময়িক বলিতে সন্দিহান হয়েন নাই। সেই পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমরা আধুনিক মুদ্রিত "চণ্ডী"—কাব্যের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলাম যে উভয়ে এত প্রভেদ যে এক গ্রন্থকারের লিখিত বলিয়া বিশ্বাস করিতে অশ্রদ্ধা জন্মে। মূল গ্রন্থখানির সম্পূর্ণত্ব দেখিতে পাইলাম না ; বোধহয়, কোন প্রকারে শেষাংশটী নষ্ট হইয়া থাকিবে। "শ্রীমন্তের সিংহল যাত্রার" পর সমুদায় অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পাঠকবর্গের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য কাব্যাংশের যে যে বিষয় নূতন পাইয়াছি তাহা ক্রমশঃ উদ্ধৃত করিব। দ্বিতীয়তঃ কিম্বদন্তী। তৃতীয়তঃ একখানি ভূসম্পত্তি লাভজ্ঞাপক পত্র। উহাতে কবির পুত্র শিব রাম চক্রবর্তীকে "কুতুব খাঁ" নামা ব্যক্তি কর্ত্তৃক কয়েক বিঘা ভূসম্পত্তির অধিকার এবং দামুন্যা প্রভৃতি কয়েকখান গ্রামে তাঁহার সন্তানাপাত্তিত্যাধিকার ভোগ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা ১০৪৭ সালের ফাল্গুন মাসে লিখিত। প্রথিত আছে যে কবির জীবদ্দশাতে তাঁহার বার্দ্ধক্য হেতু তিনি আপন পুত্রের নামে ঐ সনন্দ খানি লিখাইয়া লয়েন।

ক্রমশঃ

মুদ্রা স্তোত্র।

হে মুদ্রে! হে সুগোল রজতখণ্ড রূপিণি—হে ভিক্‌টোরিয়া বদন বিশোভিনী তোমার চরণে কোটী কোটী প্রণাম করি। অধম বাঙ্গালির তুমিই সর্ব্বস্বধন, তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুত্র, তুমিই মাতা, তুমিই পিতা, তুমিই ভ্রাতা, তুমিই বন্ধু, তুমিই একমাত্র সহায়, এ সংসারে তোমা ব্যতীত আর কেহই নাই, এ সংসারে মনুষ্য আবার কে? তুমিই মনুষ্য, তোমার কৃপা কটাক্ষ ব্যতীত কেহই মনুষ্য হইতে পারে না। তোমার কৃপায় অপ্রেমিক প্রেমিক হয়, ক্রুর সরল হয়, মূর্খ বিদ্বান্ হয়। কিন্তু হে মা রজতচক্রাঙ্গিনি

তুমি যাহার প্রতি বিমুখ সে সংসারে মনুষ্য পদবাচ্য হইবার যোগ্য নহে। তোমার কৃপায় যাহা অস্বপ্রকল্পিত বলিয়া বোধ হয় তাহাও সম্পাদিত হয়। যে চিরশত্রু সেও মিত্র হয়। কিন্তু তোমার অনুগ্রহাভাবে মিত্রও শত্রু হয়। অতএব মা তোমার ক্ষমতা অসীম। তোমার চরণে কোটী কোটী প্রণাম করি।

তুমি সংসার রূপিণী, কেন না যাহাকে আমরা সংসার বলি তাহাদের অভাবে সংসার পরিচালিত হয়, কিন্তু তোমার অভাবে একদিনও সংসার চলে না, অতএব তুমি আমার প্রতি দায় কর, আমি তোমার চরণে প্রণাম করি।

তুমি প্রেমরূপিণী, কেন না, তোমা ব্যতিরেকে আবার প্রেম কোথায়? যদ্যপি তোমাকে প্রণয়িনীর সুকোমল করকমলে অর্পণ না করি তাহা হইলে কি সে হেমাহীরা হাসিয়া আমার কণ্ঠহার হইবে? অতএব হে মুদ্রে! তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও, আমি তোমার চরণাম্বুজে প্রণি-পাত করি।

তুমি শান্তিরূপিণী, কেন না তোমা ব্যতীত এ তাপদগ্ধ সংসারে শান্তি নাই, তুমি যাহাকে কৃপাকর তাহার সংসারই সুখের আস্পদ; নতুবা মাতা বল, পিতা বল, ভ্রাতা বল, ভগিনী বল, স্ত্রী বল কেহই চির শান্তি সম্পাদন করিতে পারে না।

তুমি ভয়রূপিণী, কেন না মনুষ্য সিংহ ব্যাঘ্রাদিকে যত না ভয় করে, তুমি যাহার গৃহসুশোভিনী তাহাকে তাহা অপেক্ষা শত গুণে ভয় করে; অতএব মা, তুমি আমার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করতঃ অভয় প্রদান করিয়া অপরের ভীতি সম্পাদন কর, আমি কৃতার্থ হইয়া তোমার চরণে প্রণত হই।

তুমি ধর্ম্মরূপিণী, কেন না দান ব্যতীত ধর্ম্ম নাই, অতএব হে মা তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও আমি ব্রাহ্মণদিগকে অবারিত দান করিয়া ধর্ম্মের জয়পাতাকা গগনমার্গে উড্ডীন করি।

তুমি যশ রূপিণী, কেন না দান ব্যতীত যশ নাই, পরোপকার করিবার প্রশস্ত পথ দান, আর পরোপকারেই যশ—অতএব মা তুমি আমার প্রতি কৃপাকর আমি যশের পতাকা উড়াইয়া তোমার পূজায় প্রবৃত্ত হই।

তুমি জ্ঞানরূপিণী, কেন না সংসারে ধনবান্‌ই জ্ঞানী—অনেকস্থানে দেখা যায় অনেক বৃহৎ লম্বোদর স্বাক্ষর কার্য্যে অক্ষম হইয়াও তোমার প্রসাদে মহা জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত; আরও দেখা যায় যে কোন কোন মহাত্মা পাঠে অক্ষম হইয়াও কোন প্রসিদ্ধ ইংরাজী সংবাদ পত্র সর্ব্বদা হস্তে রাখিয়া কেবল তোমারই গুণে ইংরাজীতে ব্যুৎপন্ন বলিয়া গণ্য এবং তিনি গ্রাহক বলিয়াই সেই সেই পত্রিকায় তাঁহার মহিমা সর্ব্বদা কীর্ত্তিত। অতএব হে মা, তুমি আমাকে দয়া কর আমি জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া জনসমাজে অদ্বিতীয় জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত হই।

তুমি বন্ধুত্ব রূপিণী, যে তোমার কৃপাভাজন তাহার বন্ধুর অভাব নাই। কেন না, যেমন বসন্তে ভ্রমরের আধিক্য, তোমার দয়া থাকিলে বন্ধুও তদ্রূপ, অতএব হে মা তুমি আমার প্রতি কৃপা কটাক্ষ বিতরণ কর, আমি পরিমল-পূরিত সুবাসিত মধুপূর্ণ পুষ্প স্বরূপ বিকশিত হইয়া থাকি আর আমার চতুর্দ্দিকে বসন্তের অনুচর মধুপ্রার্থী মধুকরগণ নিরন্তর গুণ গুণ রবে তাহাদের বন্ধুত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে থাকুক।

তুমি সত্য স্বরূপিণী, কেন না তোমা ব্যতিরেকে সংসারে সত্যতা নাই; দরিদ্র বাঙ্গালি পেটের জ্বালায় অস্থির, চাকরির বাজার তায় দারুণ গরম সুতরাং আমরা ঋণী হই, মহাজনের কাছে কথার ঠিক রাখিতে না পারিয়া অসত্যবাদী ও প্রবঞ্চক বলিয়া জনসমাজে পরিচিত হই, অতএব হে মা শ্বেতাঙ্গিনি চক্ররূপিণি মুদ্রে! তুমি আমার প্রতি দয়া কর আমি সংসারে অদ্ভুত সত্যবাদী বলিয়া পরিচিত হই।

তুমি চক্ষু রূপিণী, কেন না তোমা ব্যতিরেকে দেখিবার উপায় নাই, চক্ষু সকলেরই আছে, কিন্তু দেখিবে কি? তুমি যাহাকে দেখাইবে সে কত কি দেখিবে। দরিদ্র সংসার এক প্রকার দেখে আবার ধনী অন্য প্রকার দেখে, সে পার্থক্য অনেক, অতএব হে মুদ্রে তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর আমি প্রত্যহ নূতন চক্ষে পৃথিবীর নূতনত্ব দেখি। এ বিভীষিকা মূর্ত্তি আর ভাল লাগেনা।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

কৃষিতত্ত্ব। ইহা একখানি কৃষিবিষয়ক সচিত্র মাসিক পত্রিকা। শ্রীযুক্ত বাবু বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও শ্রীযুক্ত বাবু নৃত্য-গোপাল চট্টোপাধ্যায় দ্বারা পাইক পাড়া নর্শরি হইতে প্রকাশিত।

আমরা কৃষিতত্ত্বের ৪র্থ খণ্ডের ১ম সংখ্যা প্রাপ্ত হইলাম। ইহাতে কতিপয় আবশ্যকীয় বিষয় লিখিত হইয়াছে। কৃষিতত্ত্বের ভাষা অতি সরল। দেশমধ্যে এরূপ পত্রিকার যতই প্রচার বৃদ্ধি হয় ততই মঙ্গল। আমাদের দেশে যে সকল সংবাদ পত্র কিম্বা সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে কৃষি ও শিল্প সম্বন্ধীয় কোন পত্রিকা দেখা যায় না। যে কোন পত্রিকাদি ইউরোপে দেশ কাল বিবেচনা করিয়া লিখিত হইলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করা হয়। এক্ষণে যেরূপ সময় পড়িয়াছে দেশমধ্যে যেরূপ অন্ন-কষ্ট বৃদ্ধি হইতেছে তাহাতে কৃষি ও শিল্পাদির অনুশীলন হওয়া সর্ব্ব-তোভাবে কর্ত্তব্য। বাঙ্গালা কৃষিপ্রধান দেশ, অত্রস্থ কৃষিজাত দ্রব্য ইহার একমাত্র খ্যাতি ও প্রতিপত্তির কারণ। এমন কৃষিপ্রধান দেশে জন্ম-গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালী উদরান্নের জন্য লালায়িত হইয়া পড়িতেছেন, ইহা যার পর নাই আক্ষেপের বিষয়। কৃষিকার্য্যে উৎসাহ থাকিলে কখনই এরূপ অন্নকষ্ট হইত না। কি নিয়মে চাষ করিতে হয়, চাষের লাভালাভ কি প্রকার এই সকল বিষয় কৃষিতত্ত্বে পরিষ্কাররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। আমরা ১ম খণ্ড হইতে ৪র্থ খণ্ড পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া দেখিলাম, কৃষিতত্ত্ব যথার্থই দেশের মঙ্গল-উদ্দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। দেশী ও বিদেশী শাক সবজী রোপণপ্রণালী নানা প্রকার কলমাদির নিয়ম কৃষিতত্ত্বে লিখিত হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় এইরূপ পত্রিকা বিদ্যালয়ে পঠিত হইলে দেশের প্রকৃত উপকার সাধন হয়। বিদ্যালয় সমূহে যে সকল পাঠ্যপুস্তক অধীত হইয়া থাকে, তাহাতে জীবিকা নির্ব্বাহের স্বাধীন উপায় স্বরূপ কৃষি কিম্বা শিল্পাদি সম্বন্ধে কোন জ্ঞানলাভ হয় না। সুতরাং শিক্ষিতগণ বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহজন্য বিব্রত হইয়া পড়েন,

এবং সকলেই চাকুরীর নিমিত্ত অগ্রসর হইতে থাকেন। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ভিন্ন কেবল মাত্র চাকুরী দ্বারা স্বচ্ছলতা এবং দেশে ধনবৃদ্ধি হইতে পারে না। জগতে সর্ব্বত্র দেখ যে যে দেশে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের অনুশীলন বৃদ্ধি হইয়াছে, সেই সেই দেশে প্রজাসাধারণের ধনবৃদ্ধি ও অবস্থা উন্নত হইয়াছে। এ দেশে বৎসর বৎসর যেরূপ শিক্ষিত দলের বৃদ্ধি হইতেছে, কেবল মাত্র চাকুরী দ্বারা তাঁহাদিগের প্রতিপালন হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব, কারণ চাকুরীর সংখ্যা অপেক্ষা প্রার্থী সংখ্যা অধিক হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ স্থলে কৃষিকার্য্যে মনোযোগী হওয়াএকান্ত আবশ্যক। দেশীয় কৃষির বর্ত্তমান অবস্থা অতি শোচনীয়, যে নিয়মে চাষ করিলে উহার অবস্থা ভাল হইতে পারে কৃষিতত্ত্ব সম্পাদক তাহা বিশদরূপে দেখাইাছেন। কৃষিতত্ত্বের বিশেষ একটী গুণ এই উহা ইংরাজীর অনুবাদ নহে, যে নিয়মে এ দেশে কৃষিকার্য্য হইয়া থাকে এবং হইতে পারে, সম্পাদক তাহাই দেখাইয়াছেন।

কৃষিতত্ত্ব সম্বন্ধে বলিবার এখনও অনেক কথা আছে, কৃষিতত্ত্ব বাঙ্গালির পরম হিতৈষী তাহার উদ্দেশ্য মহৎ, কৃষিতত্ত্ব পতনশীল বাঙ্গালির মুখ চাহিয়া আশ্বাস বাক্য প্রদান করিতেছে। বলিতেছে, বঙ্গবাসি তোমরা উঠ এই বিস্তৃত স্বর্ণপ্রসূ বঙ্গদেশ তোমাদের সকল অভাব দূর করিবে। চাকুরী-প্রিয় অধঃপতন শীল বাঙ্গালির কলঙ্ক দূর কর। কিন্তু কৃষিতত্ত্বের সরল কথা বাঙ্গালি বুঝে না, যে দিন কৃষিতত্ত্বের সহস্র সহস্র গ্রাহক হইবে, যে দিন পাঠশালায় পাঠশালায় কৃষিতত্ত্ব পঠিত হইবে, জমীদারেরা ক্রয় করিয়া দরিদ্র প্রজাদিগকে পাঠ করিতে দিবেন, নিশিতে প্রতি গ্রামের মণ্ডলেরা পাঠ করিবে এবং গ্রামস্থ কৃষকেরা একত্রিত হইয়া তাহা শ্রবণ করিবে ও আপনাদের উন্নতির চেষ্টা করিবে, সেই দিন বঙ্গের অবস্থান্তর হইবে—বাঙ্গালির অন্নাভাব ঘুচিবে, দরিদ্রতা ঘুচিবে—বঙ্গের মুখোজ্জ্বল হইবে, কৃষ্ণগোপাল বাবুর অসাধারণ অধ্যবসায় ও যত্ন সফল হইবে, বিপ্রদাস বাবুর লেখনীর সার্থকতা হইবে। কিন্তু কি বিড়ম্বনা! বঙ্গবাসী নিদ্রিত; দরিদ্র কৃষক হীনবল; অজ্ঞ জমীদার অলস স্বার্থপর।

নরক।

নরক নামটি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে হৃদয় চমকিয়া উঠে, ধমনীমধ্যে তীব্র বেগে শোণিত স্রোত প্রধাবিত হয়, বক্ষস্থল দুর দুর করিতে থাকে। পৃথিবীর সকল জাতি সকল ধর্ম্মাবলম্বী মনুষ্য মাত্রই নরকের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, এবং নানা বর্ণে তাহার বিভৎস মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া আপনা আপনি স্তম্ভিত হয়েন। ইহ সংসারে এমন ব্যক্তি কে আছেন যিনি নরকের নাম শুনিয়া ভীত না হন, কে না নরকের ভয়ে সংসারের প্রতি সমধিক ধর্ম্ম চক্ষু উন্মীলন করেন? বস্তুতঃ সে স্থান আছে কি না তাহা নিশ্চয় করিয়া কেহই বলিতে সক্ষম নহেন, কিন্তু যদি থাকে তবে তথায় কাহারও নিস্তার নাই; তথাপি মনুষ্য! তোমার চক্ষু ফুটেনা, তুমি অন্ধের ন্যায় উন্মত্তের ন্যায় সেই ভয়াবহ স্থানকে উপেক্ষা করিয়া দিনপাত কর। ভ্রমেও চিন্তা করনা যে এমন একদিন আসিবে যে দিন এই ক্ষণস্থায়ী সংসার ও স্নেহময়ী মাতা পিতা পুত্র কন্যাদি পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত কালের জন্য অনন্তাশ্রয় করিতে হইবে, সেই দিন হয়ত তোমার সাংসারিক কার্য্যের জন্য ঈশ্বরের আদেশক্রমে সেই নরক আশ্রয় করিতে হইবে!

মানব চিন্তায় নরক অতি ভয়ানক স্থান! তথায় মরুৎ-হিল্লোল নাই, পাপিগণ দুর্ব্বিসহ গ্রীষ্মাতিশয্য সহ্য করে, পরিমলপূর্ণ কুসুমরাশি তথায় পুষ্পিত হয় না, পূতিগন্ধ নাসারন্ধ্রের ভয়াবহ পীড়া প্রদান করে। সেখানে সতত ঘোর অন্ধকার, মানসানন্দদায়ী সুধাকর তাহার মৃদু আলোক বিকীর্ণ করে না। সেই দুর্গন্ধময় অন্ধকার পুরে পাপীবিশেষের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নরক আছে; তাহারা আপনাপন কার্য্য ফলে বিশেষ বিশেষ নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। কেহ বা ভয়ানক অগ্নিমধ্যে দগ্ধ হইয়া চীৎকার করিতেছে, কেহ বা ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়াছে, যমদূতগণ তাহাদিগকে উত্তম আহারীয় দেখাইয়া প্রলোভন দিতেছে, কিন্তু আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি অভাবে আর্ত্তস্বরে রোরুদ্যমান, তাহাতে আবার মুহুর্মুহু অসংখ্য বৃশ্চিক-

দংশনজনিত ব্যথা। কেহ বা তৃষ্টাতুর হইয়া গলিত পুরীষ আহার করিতেছে বলিয়া, প্রহরিগণ অনবরত বেত্রাঘাত করিতেছে। এবং পাপী সকল আপন আপন কার্য্য স্মরণ করিয়া আপনাকে ধিৎকার দিতেছে। কামাতুরা কুলটা রমণীগণ নীরয় যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া "অল্প কালের জন্য অন্ধের ন্যায় পৃথিবীতে কেন এত পাপ করিয়াছিলাম" বলিয়া পরিতাপ করিতেছে। যমদূত কাহার কেশরাশি ছিঁড়িয়া বলিতেছে "পাপিষ্ঠা, এই কেশ বিনাইয়া ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া কামুকের মন ভুলাইতে!" কাহার বা বক্ষস্থল অস্ত্রদ্বারা ছিন্ন বিছিন্ন করিয়া কহিতেছে "পাপিয়সি সূক্ষ্ম আবরণে এই পয়োধরদ্বয় আবরিত করিয়া কত লোকের সহিত রঙ্গরস করিয়াছ এখন তাহার প্রতিফল ভোগ কর!" কাহার বা চক্ষুদ্বয়ে তপ্ত লৌহ সলাকা প্রবিষ্ট করাইয়া কহিতেছে "পাপিয়সি, এই চক্ষে কত লোকের হৃদয়ে ফুলশর হানিয়াছ কিন্তু এই তাহার প্রায়শ্চিত্ত!" কাহার বা উদর ছেদন করিয়া তন্মধ্যে উত্তপ্ত সীসক ঢালিয়া দিয়া বলিতেছে "সয়তানী কামান্ধতায় লোকলজ্জাপরবশ হইয়া ভ্রূণ হত্যা করিয়াছিলি, কিন্তু আমাদের কাছে তাহার নিস্তার কোথায়!" আবার তাহার আত্মীয় স্বজনের প্রেতাত্মা ডাকিয়া আনিয়া তাহাদিগকে পরস্পরের পাপ সকল বলিয়া দিতেছে, এবং পরস্পরে আপন আপন লজ্জায় মস্তক অবনত করিতেছে। কোথায় কেহ পুড়িতেছে, কেহ বেত্রাহত হইতেছে, কাহার চক্ষু গৃধিনী শকুনী ভক্ষণ করিতেছে, কাহার দেহ শৃগাল গলাধঃকরণ করিতেছে। সে স্থানের চিত্র অতি ভয়ানক; আপন আপন পাপ স্মরণ করিয়া সকলেই আপন আপন ভাবী কর্ম্মফল কতকটা স্থির করিতে পারেন।

মানব! সেই নরক অপেক্ষা বিভীষণ স্থান ইহ জগতে কি আছে? মানবের কল্পনাতেই বা কি হইতে পারে? কিন্তু মনুষ্য তথাপি অন্ধ, মনুষ্য তথাপি অবিবেচক, মানব মাত্রেই সমস্ত প্রত্যক্ষ করে, তথাপি তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়। দূর হউক এই ক্ষণস্থায়ী প্রাণ লইয়া আর নরক চিন্তায় সময় কাটাইব না। যে ঐহিক বুঝিতে পারে না, তাহার পারত্রিকের কথায় কাজ কি? নরক কেহ স্বীকার করুন বা না করুন, তদ্বিষয়ে আমাদের তর্ক আবশ্যক নাই, যাঁহার ইচ্ছা হইবে তিনি স্বীকার করিবেন,

যাঁহার ইচ্ছা না হইবে তাঁহার স্বীকার করিয়া এই মদমত্ত সংসারের অজ্ঞানতার ক্ষণিক সুখ হইতে বঞ্চিত হইবার আবশ্যক নাই। কিন্তু আমি বলি যে সংসারই নরক বা সংসার দ্বিতীয় নরক! পাঠক! তুমি এ কথা স্বীকার করিবে কি? তাহা করিলে, সেই শৈশবের একমাত্র সহায় এক মাত্র উপায় জগতের সার জননীকে বিস্মৃত হইয়া কি করিয়া তোমার সুখের প্রাণটিকে প্রিয়তমের অলক্তকরঞ্জিত চরণকমলে উপহার দিবে? তাহা হইলে কেমন করিয়া ছলে বলে কৌশলে সহোদরের সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়া তাহার অন্নকষ্ট দেখিয়া প্রিয়তমার সহিত অধর টিপিয়া হাসিবে? কেমন করিয়াই বা দরিদ্র প্রতিবেশিগণের শোণিত শুষ্ককারী শ্রমোপার্জ্জিত অর্থ আত্মসাৎ করিয়া আপন পুত্রের শুভাকাঙ্ক্ষা করিবে? কেমন করিয়াই বা ধনিনী ভগিনীর বৈধব্য কামনাকরতঃ তাহার বিষয়ের উপস্বত্ব ভোগ লালসা করিবে? তাই বলি এ কথা তুমি হয় ত স্বীকার করিতে পারিবে না, মৌখিক স্বীকার কর বা না কর, মনে মনে ভাবিয়া দেখ দেখি যে ইহা সংসার না নরক!

যে সংসারে প্রবঞ্চনা ব্যতীত কার্য্য নাই, যে সংসারের সকল কার্য্যে প্রবঞ্চনা একাধিপত্য বিস্তার করে, যেখানে, ভালবাসায়, ধর্ম্মে, দানে, সম্ভাষণে সকল কার্য্যেই প্রবঞ্চনা, তাহা নরক নয়ত কি? পাঠক! তুমি কি এ কথা স্বীকার করিবে না? করিবে বই কি, যদি তুমি সংসারের কার্য্যকলাপ সন্দর্শন করিতে তোমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া থাক তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করিবে যে জগতের প্রত্যেক কার্য্যে প্রবঞ্চনা বিজড়িত রহিয়াছে! আহা! সংসারের দুর্ল্লভ পদার্থ ভালবাসা তাহাতেও প্রবঞ্চনা? কেহ হয়ত বলিবেন ভালবাসায় প্রবঞ্চনা নাই। কিন্তু আমি বলি আছে। আমি সাধারণের কথা বলিতেছি না, বলিতেছি— যে মনুষ্য হইয়া কে না পিতা মাতাকে ভালবাসে? কিন্তু যদি তাহাতে প্রবঞ্চনা না থাকে তবে তোমার ভালবাসায় বিশেষ ফল দর্শিবেনা। নিশীথে প্রাণ খুলিয়া কাঁদিয়া মাতৃবিয়োগজনিত ভালবাসার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা আমি যথেষ্ট বলি, কিন্তু তাহাতে হইবে না, তোমার বুদ্ধিমান্ ভ্রাতা নির্জ্জল চক্ষে বসনাবৃত করিয়া তোমার পিতৃ সন্নিধানে মধ্যে মধ্যে

রোদন করিয়া যে সহানুভূতি প্রাপ্ত হইবে, যে ভালবাসা প্রকাশ করিবে সে ভালবাসা তোমার আজন্ম ক্রন্দনেও হইবে না। হয়ত সেই অপারগতা হেতু তুমি নির্দ্দয় হৃদয়সম্পন্ন বলিয়া জনসমাজে জ্ঞাত হইবে। তাই বলি ভালবাসায় প্রবঞ্চনা চাই, যদি সংসারের প্রকৃত পুরুষ হইতে চাও, তবে এই বেলা হইতে প্রবঞ্চনা শিক্ষা কর, নতুবা তুমি এই সংসারের কেহই হইবে না। অন্তরে যাহা আছে তাহা কে দেখে, বা তাহা দেখিতে পারে এমন লোক সংসারে কজন? আর যদি থাকিবে তবে সংসারকে নরক বলিব কেন? তাই বলি আন্তরিক যত্ন থাক না থাক মৌখিক ভাগ অধিক চাই। এ সংসারনরকে যদি তোমার পিতা না থাকেন, যদ্যপি মাতাই তোমার একমাত্র সংসার যাত্রার অবলম্বন হয়েন, তবে আরও সাবধান, বাঙ্গালির দারিদ্র্যানল হু হু শব্দে দিক্‌দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করিয়া প্রজ্বলিত হইতেছে, দুর্ব্বল বাঙ্গালি সে জ্বালায় অস্থির, অন্নচিন্তায়, সংসারের উন্নতি চিন্তায় তুমি প্রবাসী হইলে, কার্য্যব্যস্ততায় প্রতিনিয়ত মাতৃ সন্নিধানে যাইতে পার না, হয়ত তাহার উপর স্ত্রীপুত্র সন্নিকটে রাখিয়া মহা পাপ করিয়াছ; আর নিস্তার নাই, তোমার গুণের ভ্রাতা মাতার প্রিয় পুত্র হইবার আশায়, (অন্ততঃ অলঙ্কার গুলি আত্মসাৎ করিবার চিন্তায়,) তুমি স্ত্রী পুত্র লইয়া যে মাতাকে একেবারে বিস্মৃত হইয়াছ সে ধারণা জন্মাইতে আরম্ভ করিল, ভালবাসার উপর ভালবাসা দেখাইতে লাগিল. বলিল "মা ভিক্ষা করিব তথাপি তোমায় ছাড়িয়া বিদেশে যাইব না।" তাহাতে আবার তোমার ভ্রাতৃজায়া রসান দিলেন। তুমি তোমার স্ত্রী পুত্রকে বাটী পাঠাইলে, তোমার মাতা তাহাদিগকে অযত্ন করিলেন, তোমার স্ত্রীকে রাক্ষসী বলিয়া ধারণা করিলেন, তোমার সংসারের সুখ, সাধের হাট ভাঙ্গিয়া গেল, জগতের সার, জীবনের সার, জননী রত্নের স্নেহ হইতে তুমি বর্জ্জিত হইলে। তখন নয়নবারিই তোমার এক মাত্র অবলম্বন হইল, সংসার বিকট মুখব্যাদান করিয়া তোমায় গ্রাস করিতে উদ্যত হইল, তুমি মনে মনে ভাবিলে হায়! ইহা সংসার না নরক?

বাস্তবিকই অলক্ষিত ভাবে ধর্ম্ম দান প্রভৃতি সাংসারিক সকল কার্য্যেই

প্রবঞ্চনা আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। পাঠক! অনুসন্ধান কর, দেখিবে সকল কার্য্যই প্রবঞ্চনাপূর্ণ। যদ্যপি সংসার প্রবঞ্চনাময়, তবে তাহাকে নরক ব্যতীত কি বলিব? এই সংসারময়ী নরকে আমরা কীটস্বরূপ, প্রবঞ্চনা রূপ মহাস্রোতে নিপতিত হইয়া নিয়ত ভাসিতে ভাসিতে যে কোথায় যাইতেছি তাহার ইয়ত্তা নাই। হায় রে! তবে মানবজীবন কি দুঃখপ্রদ! বিধাতঃ! মানবগণকে জীবশ্রেষ্ঠ করিয়া কি এই অনন্ত নরক যন্ত্রণা সহ্য করাইতেছ? না না, কে বলে মানব জীব শ্রেষ্ঠ, মানব প্রাণিকুলাধম! মানব অপকৃষ্ট, অতি হেয়, কীট অপেক্ষাও অধম। অনন্তকাল কদর্য্য স্থানে কীট হইয়া জীবনাতিবাহিত করাও শ্রেয়, তথাপি এই চাকচিক্যময়ী সংসার রূপ নরকের মানব হওয়া অশেষ পাপের চিহ্ন! আহা! কি পরিতাপ, মানব তোমার ললাটে বিধাতা এত দুঃখ লিখিয়াছেন, জ্ঞান বুদ্ধি বিভূষিত করিয়া এই ভয়াবহ সংসার নরক নিক্ষেপ করিয়াছেন। ছি! ছি! সংসার—যাহা মানব মাত্রেরই বিলাস ক্ষেত্র, তাহা এত হেয়? তাহা নরক? আর কি হইবে, অতএব মনুষ্য তুমি আর শ্লাঘা করিও না, সংসারে আর আমার আমার করিয়া পাগল হইও না, সংসার সংসার করিয়া চীৎকার করিও না, ইহা তুমি যাহা ভাব, সে সংসার নয়, ধর্ম্মের বিলাস ক্ষেত্র নয়, পবিত্রতার রঙ্গভূমি নয়, শান্তির আশ্রম নয়,—তবে কি? ইহা হৃদয়দগ্ধকারী ভয়াবহ স্থান, আর্ত্তনাদের আবাস ভূমি, পাপের প্রশস্ত ক্ষেত্র, প্রবঞ্চনার রঙ্গস্থান, ইহা নরক!!!

দুঃখের আঁধারে কেন জোছনা উদয়!

১

নিবিড় নিলীমাকাশ, নাহি চন্দ্রিকার ভাস,
জ্বলিছে তারকা মালা আকাশের গায়,
নড়ে নাক বৃক্ষ বল্লী, ঝিঁ ঝিঁ রবে ডাকে ঝিল্লী,
নাহি নড়ে বৃক্ষপত্র মৃদুল মারুতে;

নাহি কাঁপে গঙ্গাজল, কাঁপে নাক ক্ষুদ্র ফল,
কাঁপে না কুসুমকলি এ ঘোর নিশীথে।
জগৎ ঘুমায়ে রয়, কাল স্রোত বহি যায়,
চুপে চুপে চুরি করি জীবের জীবন ;
বিষাদে আঁধার মুখ, প্রকৃতির যত দুখ,
রোদনে হইছে শষ্পে মুক্তা বরিষণ।

২

এ হেন সময়ে কবি দুঃখের আগারে,
আঁধারে বসিয়া একা, কিছু নাহি যায় দেখা,
চিন্তার চরণে মন করি সমর্পণ।
আকাশ পাতাল ভাবে, মজিয়া ভবের ভাবে,
গিরি চূড়া, সিন্ধু জল, গহন কানন,
গ্রহ, তারা, সূর্য্য, সোম, প্রাচীন অযোধ্যা রোম,
কালের কুটীল গতি, বিশ্বের নিয়তি,
রাজা, রাজ্য, ধন, জন, সুখী দুঃখী মহাজন,
বাল, বৃদ্ধ, যুবা, যুনী, মানব সমিতি;
মানব মনের আশা, প্রণয়ীর ভালবাসা,
শিশুর সারল্য, আর যুবার ভরসা,
কতই আসিছে মনে, মিলাইয়া যায় ক্ষণে,
জোছনা আঁকা তরুছায়া দেখিল সহসা।

৩

আঁধার নিশীথে এ কি জোছনা উদয়?
এ ত দেখি বড় ভ্রম, আঁধারে জোছনাগম,
অসম্ভব কথা এ যে স্বপ্নেও না সাজে,
কারে না বলিতে পারি, কি সুষমা বলিহারি,
চন্দ্র করে ছাপা ছায়া দে'য়ালে বিরাজে।
শাখা পত্র অবিকল, মৃদুবায় টল টল,
নানা ছাঁদে হেলি দুলি মানস ভুলায়,

বিধাতার একি সৃষ্টি, গেছে কি তাঁহার দৃষ্টি?
দুঃখের আগারে কেন জোছনা উদয়?
চারু চিত্র হর্ম্যশিরে, সুগন্ধ গোলাপ নীরে,
মলয় সমীরে সেবে প্রণয়ী যুগলে,
যথা ধন চিন্তা লেশ, নাহি দরিদ্রতা ক্লেশ,
বিরাজিতা শান্তি দেবী মনো কুতূহলে,
অসম্ভব চিত্র খানি, সেখানে থাকিলে মানি,
হলেও হতেও পারে অসম্ভব কিসে?
সুখীর সুখের তরে, বিধাতা যতন ক'রে,
অবহেলে অসম্ভবে করেন সম্ভব।

৪

বঙ্গীয় কবির ঘর দুঃখের আশ্রয়,
দরিদ্রতা সহচরী, দুশ্চিন্তা অনর্থকরী,
বিষাদে আঁধার করি ভ্রমিয়ে বেড়ায়,
সংসার বিপন্ন কবি, এখানে সুন্দর ছবি,
কে রাখিল, কে আনিল, কিছুই না জানি,
দুঃখ—নাহি সুখলেশ, দারুণ সংসার ক্লেশ,
বৃশ্চিক দংশনে দংশে হেন অনুমানি,
নাহি পিতা বা সোদর, অর্থ লাগি দেশান্তর,
নাহি হেথা সে প্রতিমা প্রণয়ের ছবি,
সরলতা অলঙ্কার, ভালবাসা শোভা যার,
মধুর বচন যার আঁধারের রবি।
শিশুর চঞ্চল খেলা, যে ঘরে না করে মেলা,
সুখ সচ্ছন্দতা শান্তি নাহিক যথায়,
হেন মনে হয় জ্ঞান, কারাগার সেই স্থান,
সুখের সুন্দর ছবি কেন বা তথায়?

৫

বুঝিয়াছি এতক্ষণে সে ছবি এ নয়,
জ্বলে পথে গ্যাশালোক, চন্দ্রমারে দেয় শোক,
সে আলোক রচিল এ চিত্র মনোহর,
সত্য বটে তাই হ'লো, চন্দ্রমা না দেখা গেল,
গ্যাশালোকে জন্মেছিল স্বভাবে এ ভ্রম,
নকলে আসল ভ্রম, অবিকল অনুপম,
মিথ্যায় সত্যের শোভা এ বড় বিষম,
বিষম কেমনে বলি,— কাননে কুসুম কলি,
অবনী বৈচিত্র—সিন্ধু ভূধর সুন্দর,
গ্রাম পল্লী উপবন, গ্রহ তারা অগণন,
চঞ্চল নদীর জল, শশী দিনকর।
পুত্র কন্যা পরিবার, হয় হস্তী ধনাগার,
ধনীর সম্পদ সুখ, দীনের দুর্গতি ;
জগতের যত খেলা, সবি ইন্দ্রজালে মেলা
জল বুদ্বুদের পথে সবাকার গতি।
সর্পে রজ্জু ভ্রম যায়, কি বলিব চমৎকার,
তার কাছে গ্যাশালোকে চন্দ্রিকার ভ্রম,
কখন বিচিত্র নয়, এ সংসার ভ্রান্তিময়,
আমার বলিতে তবু না লাগে সরম,
যে সব দেখিছ ভাই, কিছুতেই কিছু নাই,
সার মাত্র সেইজন, বিশ্বের কারণ,—
তাঁহাতে জগৎ ভ্রম, যাবে না, নিষ্ঠুর যম
যে দিনে না টানি লবে ঘরেতে আপন।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত

বিজয় সিংহ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কথা প্রসঙ্গে।

বেলা প্রায় সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমাদের পূর্ব্ব পরিচিতা রমণীটী বিজয় সিংহের আবাসের একটী প্রকোষ্ঠে, সুনির্ম্মিত পর্য্যঙ্কোপরি উপবিষ্ট হইয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে কি ভাবিতেছিল, এক একবার বদনপ্রান্তে চিন্তাচক্রের পদ্ধতির গাঢ় রেখা দেখা যাইতেছিল, আবার কখন বা চক্ষু উজ্জ্বল ও স্ফূর্ত্তিসম্পন্ন বলিয়া বোধ হইতেছিল। এবম্বিধ অবস্থায় রমণীর চক্ষে বিষাদসূচক চিহ্ন অসম্ভব নহে, কিন্তু কে জানে যে তাহা কেন ক্ষণে ক্ষণে হাসিতেছিল। রমণী এই ভাবে অবস্থিতা এমত সময়ে জনৈক দাসী আসিয়া কহিল "মহারাজ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা করেন, আপনার কোন আপত্তি না থাকিলে তিনি আপনার সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করেন।"

রমণী কহিল "মহারাজ কে?"

দাসী। আপনি কি বিস্মৃত হইয়াছেন! যিনি আপনাকে এই স্থানে আনিয়াছেন।

রমণী লজ্জিত হইয়া কহিল "তাঁহার আগমন জিজ্ঞাসাসাপেক্ষ কেন?"

দাসী নিরুত্তর হইয়া প্রস্থান করিল। অনতিবিলম্বেই একজন যুবা পুরুষ বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। বস্তুত সে পরিচ্ছদ রমণীর নিকট যথেষ্ট নহে। সে পরিচ্ছদ রমণীর নয়ন বিন্দুমাত্র আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। যুবককে দেখিবামাত্র রমণী যে কিরূপে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবে তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। শশব্যস্তে পালঙ্ক হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিজয়সিংহ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "আমার যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা হইয়াছে, আপনি ভাল আছেন ত? শারীরিক কোন ক্লেশ হয় নাই?"

রমণী সসম্ভ্রমে কহিল "আপনার অনুগ্রহে অধিনীর সমস্ত মঙ্গল।"

বিজয়সিংহ রমণীকে অনুরোধ করিয়া স্বয়ং খট্টোপরি উপবেশন করিলে, রমণী স্বতন্ত্র আসনে উপবেশন করিয়া বলিল "আপনি আমার প্রতি দিন দিন যে অসীম অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে অধিনী আপনার নিকট সর্ব্বতোভাবে ঋণী. কিন্তু এ ঋণের যে কখন পরিশোধ দিতে পারিব সে আশা নাই।"

বিজয়। আপনি তন্নিমিত্ত বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইবেন না, এ সমস্তই আপনার যথেচ্ছ ব্যবহার্য্য।

রমণী ঈষৎ হাস্যসহকারে কহিল "তাহার বিন্দুমাত্র অন্যথা হয় নাই।"

বিজয়। শুনিয়া সুখী হইলাম। আমি অদ্য আপনার বৃত্তান্ত জানিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া আসিয়াছি, যদ্যপি বলিতে কোন বাধা না থাকে তাহা হইলে বলিয়া কৃতার্থ করুন।

এই কথা শুনিয়া রমণী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "যিনি আমার প্রাণদাতা, রক্ষা কর্ত্তা, তাঁহার নিকট আমার ঘটনা বলা ত সুখের কথা। কিন্তু মহারাজ আমার একটি অনুরোধ, আমি যেকথা বলিবনা তাহাতে আপনি আপত্তি করিবেন না।" এই কথা বলিয়া রমণী বলিতে লাগিল—"আমি একজন সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য-নন্দিনী, আমার পিতামহী পীড়ীতা হইয়া ইতস্তত জলপথে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন, তিনি আমায় বড় ভালবাসেন, আমায় দেখিবার জন্য বলিয়া পাঠাইলে, পিতা আমাকে তাঁহার সন্নিধানে প্রেরণ করেন। কয়েক দিবস স্বচ্ছন্দে আসি, কোন বিপদ ঘটে নাই, পরে একদিবস সহসা আকাশ ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন হইল, গোদাবরীবক্ষে ভীষণ তরঙ্গমালা ভয়াবহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল, বজ্রের কড় কড় নাদে মেদিনী বিকম্পিত হইল। এমত সময়ে—বলিতে প্রাণ শিহরিয়া উঠে—প্রায় পঞ্চাশৎজন দস্যু আসিয়া সেই ভয়াবহ সময়ে আমাদিগকে আক্রমণ করে, আমার সমভিব্যাহারী রক্ষিগণ একে একে পরাভূত হইল, তাহাদের একজনও জীবিত আছে কি না

সন্দেহ, পরে দস্যুরা আসিয়া আমার অলঙ্কারাদি কাড়িয়া লয়, ইতিমধ্যে আমি প্রাণভয়ে জলে লাফাইয়া পড়ি। তাহারা যে সেই সঙ্গে আমাকে ধরিবার জন্য জলে ঝাঁপ দিয়াছিল সেই পর্য্যন্ত জানি, তাহার পর যে আমি কোথায় গেলাম, আমার কি হইল তাহা জানি না। মাতা গোদা-বরী প্রসন্না হইয়া অসহায়া অবলার প্রতি কৃপাকটাক্ষ বিতরণ করিলেন। আমি সেই দুর্দ্দান্ত নরপিশাচ দিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলাম।” এই বলিয়া রমণী কাঁদিল, পরে চক্ষু মুছিয়া বলিল “নতুবা তাহারা যে আমার কি অবস্থা করিত তাহা জানি না।” পুনরপি চক্ষু মুছিয়া বলিল “তাহার পর শুনিলাম আপনি আমাকে নদী সৈকতে পাইয়া রক্ষা করিয়াছেন।”

বিজয়। সে কথা বলিতে হইবে না, আমি সমস্তই জানি, কিন্তু আপনি আপনার পিতামহীকে দেখিবার নিমিত্ত কোথায় যাইতে-ছিলেন ?

রমণী। আমি তাহা জানি না; আমার সমভিব্যাহারী লোকেরা জানিত।

বিজয়। আপনার পিতার নামটি কি, তাহা জানিতে পারি কি ?

রমণী ব্রীড়াসহকারে কহিল “মহারাজ ক্ষমা করিবেন, এ অবস্থায় পিতার নাম মুখে আনিতে লজ্জা বোধ হয়।”

মহারাজ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন “তবে বলিবেন না।” বিজয়সিংহ দেখিলেন যে, রমণী তাহার বর্ত্তমান অবস্থা বড় লজ্জাকর বলিয়া বিবেচনা করে, আরও বুঝিলেন যে, রমণী ধনবানের কন্যা, রমণীর পরিচ্ছদাদি দেখিয়া বিজয় সিংহের তাহাকে যবনী বলিয়া ভ্রম জন্মিয়াছিল, সেই নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন “দিল্লীতে হিন্দুরমণীরাও কি এইরূপ বেশে থাকেন ?”

রমণী কহিলেন “মহারাজ, দিল্লীতে হিন্দুরমণী অতি কম, যাঁহারা আছেন তাঁহাদের বেশ আমার এ বেশ অপেক্ষাও যবনী সদৃশ। আপনি কি আমায় যবনী বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন ?”

মহারাজ অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন “না, তাহা করি নাই, পরিচ্ছদের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম।”

রমণী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন “মহারাজ! আপনি আমার প্রতি

অনুগ্রহ দেখাইয়া আমার মনকে উন্নত করিয়াছেন, আমার আশা বাড়াইয়া দিয়াছেন,—এক্ষণে আমার একটী ভিক্ষা আছে, শুনিবেন কি ?”

বিজয়সিংহ কহিলেন “আপনার যে কোন কথা শুনিতে আমার বড় আনন্দ হয়।”

রমণী। অধিনীর প্রতি আপনার অনুগ্রহ এমনই অসীম বটে।

বিজয়। কি বলিবেন বলুন, আমি শুনিতে উৎসুক হইয়াছি।

রমণী। বলিতে ছিলাম কি—আর কতকাল আপনাকে বিরক্ত করিব, যখন এত অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তখন শেষ দয়া প্রকাশ করিয়া আমায় দিল্লীতে পাঠাইয়া দিন।

বিজয়সিংহ ঈষৎ হাস্যসহকারে কহিলেন “আপনি কি এত শীঘ্রই আমাকে অননুগৃহীত করিতে চান ?”

রমণী। আপনার অনুগ্রহ বরং অধিনীর বাঞ্ছনীয়।

বিজয়। আপনি যদ্যপি প্রকৃতই দিল্লী যাইবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকেন, এবং আমাদের সমাগম অসহ্য হইয়া থাকে, তবে যাইবার উদ্যোগ শীঘ্রই করা যাইবে।

রমণী কহিলেন “মহারাজ অন্যায় বলিলেন, এ জীবন থাকিতে আপনার সন্দর্শনকামনা বিলুপ্ত হইবে না, কিন্তু ভাবিয়া দেখুন আমার এ অবস্থার কথা শুনিয়া পিতা মাতা কি দুর্ব্বিসহ যাতনা অনুভব করিতেছেন।”

বিজয়সিংহ “তবে আপনার যাইবার উপায় শীঘ্রই করিতেছি” বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন; তৎসঙ্গে রমণীও উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মহারাজ হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনার নামটিও কি শুনিতে পাই না ?”

রমণী কহিলেন “স্ত্রীলোকের আবার নাম কি ? যাহারা আত্মরক্ষায় অপটু তাহাদের আবার নামের প্রয়োজন ?”

মহারাজ পুনর্ব্বার হাসিতে হাসিতে কহিলেন “এ কথাটি আজি নূতন শুনিলাম।”

রমণীও মধুর হাসিয়া কহিলেন “এ অধিনী তবে ভাগ্যবতী, কেন না আপনার ন্যায় রাজাকে নূতন কথা শুনাইল।”

বিজয়সিংহ কহিলেন "তবে এখন আসি? মধ্যে মধ্যে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিলে সুখানুভব করি, আপনি তাহাতে বিরক্ত হই-বেন কি?"

রমণী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "আপনি তবে বুঝি আমার কথায় বিরক্ত হইয়াছেন, এবং ভবিষ্যতে আর যাহাতে আসিয়া বিরক্ত হইতে না হয়, সেই নিমিত্ত এখন হইতে কাটাইয়া রাখিতেছেন?"

মহারাজ বিজয়সিংহ আর কোন উত্তর না দিয়া হাসিতে হাসিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শুভ সমাগম।

বিজয় সিংহের পিতার সহিত প্রতাপসিংহের বিশেষ সখিত্ব ছিল। বিজয় সিংহের পিতা প্রতাপ সিংহকে "দাদা" বলিতেন, এবং সেই সম্বন্ধানুসারে বিজয়সিংহ প্রতাপ সিংহকে জ্যেষ্ঠতাত বলিয়া সম্বোধন করি-তেন। প্রতাপ সিংহও স্বীয় সন্তান উদয় সিংহকে যেরূপ যত্ন ও স্নেহ করিতেন বিজয়সিংহকেও তদ্রূপ করিতেন। ঘনিষ্ঠতাই আত্মীয়তার মূলী-ভূত কারণ, উভয় বংশমধ্যে সেই ঘনিষ্ঠতা অতি প্রবল। বিজয় ও উদয় সিংহ উভয়ে দুই দেহে এক আত্মা মাত্র; উভয়ে উভয়কে প্রাণাধিক ভাল বাসিতেন, বিজয়সিংহের পিতা বর্ত্তমানে বিজয়সিংহ প্রায়ই প্রতাপসিংহের প্রাসাদে বাস করিতেন, আজি দুই বৎসর অতীত হইল বিজয় সিংহের পিতার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে; এখন তাঁহার সেই বিস্তৃত রাজ্যের ভার বিজয়সিংহের স্কন্ধে পতিত হইয়াছে। সুতরাং বিজয় সিংহের প্রতাপ সিংহের আবাসে আগমন পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক মন্দীভূত হইয়াছে। এক্ষণে উদয়সিংহই প্রায়শঃ বিজয়সিংহের রাজধানীতে আসিতেন। বিজয় সিংহ যে একেবারে মরিলার দুর্গে যাইতেন না তাহা নহে, দুই এক মাস

অন্তর তথায় যাইয়া চারি পাঁচ দিবস মাত্র অবস্থিতি করিতেন। আজি সপ্তাহ মাত্র বিজয়সিংহ মরিলার দুর্গ হইতে গিয়াছেন কিন্তু আবার আসিয়া উপস্থিত।

দিবা অবসান প্রায়, সূর্য্যদেব আরক্তলোচনে অস্তাচল শিখরাবলম্বন করিতেছেন, মলিন বসয়না নিশিথিনী যেন প্রকৃতিকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল, সেই বিষাদময়ী ঘটনা দেখিয়াই যেন গোঠ হইতে গাভি সকল গৃহাভিমুখে আসিতে লাগিল, পক্ষিগণ বায়ুসাগরে সন্তরণ করিয়া স্ব স্ব নীড়াভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিল, অনাথা বিধবা রমণী স্বামীর প্রফুল্ল বদন স্মরণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল, দুঃর্ভাগা বাঙ্গালি সমস্ত দিন প্রভুর নিগ্রহ সহ্য করিয়া ম্লানমুখে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কুটীর দ্বারে প্রাণাধিকা স্বর্ণপ্রতিমাকে বক্ষে ধারণ করতঃ সমস্ত যন্ত্রণা ভুলিল, সন্তানগুলি আসিয়া হাসিতে হাসিতে ক্রোড়ে উঠিবার প্রত্যাশায় জানুস্পর্শ করিল, আর কে যেন বিদগ্ধ প্রাণে অমৃত ঢালিয়া দিল। আবার কোথাও বা অভাগা জননী চিরন্তরগত প্রিয় কুমারের সরোজবদন স্মরণ করিয়া তপ্ত নয়ন জলে বসুধা সিক্ত করিল। এই সময়ে—এই অপূর্ব্ব বা ভয়ঙ্কর সময়ে মরিলার দুর্গদ্বারে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে একটী যুবা পুরুষ অবতরণ করিলেন। রক্ষিগণ যথাবিহিত সম্মান প্রদান করিল, এবং এক ব্যক্তি অশ্বের বল্‌গা ধারণ করিয়া তাহাকে ইতঃস্তুতঃ সঞ্চালন করিতে লাগিল।

যুবা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া জনৈক রক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কুমার কোথায়?"

রক্ষী করপুটে উত্তর করিল "যুবরাজ অদ্য মহারাজের রাজধানীতে গিয়াছেন।"

পাঠক! এ যুবকটী কে তাহা বুঝিয়াছেন?—মহারাজ বিজয় সিংহ। বিজয়সিংহ কহিলেন "কতক্ষণ গিয়াছেন?"

রক্ষী। এক দণ্ড অতীত হইয়াছে।

বিজয়। কোন্ পথে গিয়াছেন?

রক্ষী। জল পথে।

বিজয়। তবে আমার সহিত পথিমধ্যে সাক্ষাতের সম্ভাবনা ছিল না।

রক্ষী। না।

বিজয়। মহারাজ বাহাদুর কোথায়?

রক্ষী। দুর্গমধ্যে।

বিজয়। আমার প্রবেশের আপত্তি নাই?

রক্ষী। মহারাজ প্রবেশ করিবেন তাহাতে কাহার আপত্তি।

বিজয়। তবে মহারাজকে সংবাদ দাও।

রক্ষী "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিল। বিজয়সিংহ দুর্গমধ্যস্থ একটী প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন, এটী উদয় সিংহের বসিবার ঘর, এই স্থানে তিনি প্রায়শঃ থাকেন।

বিজয়সিংহ সেই প্রকোষ্ঠাস্থিত একটী আসনে উপবিষ্ট হইয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন; মনে মনে বলিলেন, "ইচ্ছা ছিল দুদিন থাকিব, কিন্তু যখন উদয় নাই, তখন থাকা হইবে না।" যুবা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন "আহা! কমলার কি অলৌকিক সৌন্দর্য্য, নয়ন সে রূপমাধুরী অনিমেষ লোচনে নিরীক্ষণ করিতে চঞ্চল হইয়াছে, মন অধীর হইয়াছে।" বিজয় সিংহের চক্ষে জল আসিল, সাশ্রুলোচনে বলিলেন "কমলা! ইচ্ছা করে না যে মরিলার দুর্গ ত্যাগ করি, ইচ্ছা করে না যে তোমায় এক মুহূর্ত্তের জন্যও নয়ন-অন্তরালে রাখি। কিন্তু কমলা তুমি কি আমার হইবে? এ দগ্ধ হৃদয়ে কি তোমায় ধারণ করিয়া অমৃতরসে তাহা সিক্ত করিতে পারিব? না না, তাহা বুঝি হইবে না, এমন কি ভাগ্য করিয়াছি যাহাতে কমলা আমার অঙ্কসুশোভিনী হইবে?"

বিজয়সিংহ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমত সময়ে রক্ষী আসিয়া বিনীত ভাবে কহিল "মহারাজ আপনাকে দেখিতে উৎসুক হইয়াছেন।"

বিজয়সিংহ গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন "চল।"

রক্ষী "আসুন" বলিয়া অগ্রসর হইল, বিজয়সিংহ তাহার অনুসরণ করিলেন। ক্রমে প্রতাপ সিংহের কক্ষে উপস্থিত হইলেন। প্রতাপসিংহ তাঁহাকে আলিঙ্গন ও মুখচুম্বন করিয়া তাঁহার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন।

বিজয়সিংহ কহিলেন "আপনার শ্রীচরণ আশীর্ব্বাদে এক্ষণে সমস্ত মঙ্গল।"

প্রতাপসিংহ কহিলেন "উদয় তোমার নিকট গিয়াছে, তুমি তাহাকে না দেখিতে পাইয়া যেরূপ বিষাদিত হইয়াছ, কুমারও তদ্রূপ হইবে।"

বিজয়। মনে করিতেছি অদ্যই প্রত্যাবর্ত্তন করিব।

প্রতাপসিংহ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "প্রতাপসিংহের ভবন কি তোমার এতি ক্লেশের স্থান?"

বিজয়সিংহ লজ্জিত হইয়া কহিলেন "আমি সেজন্য বলি নাই।"

প্রতাপসিংহ পুনরপি মৃদু হাসিয়া কহিলেন "আমি বিদ্রূপ করিয়াছি মাত্র, কুমারী কমলা ছাড়িয়া দিবে কি?"

বিজয়। আমায় না দেখিতে পাইলে উদয় বিষণ্ণ হইবে।

প্রতাপ। আমার বিবেচনায় অদ্য না যাওয়াই শ্রেয়ঃ।

বিজয়। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

এমত সময়ে দাসী আসিয়া কহিল "মহারাজের সান্ধ্য ক্রিয়ার্থ সমস্ত প্রস্তুত, গাত্রোত্থান করিতে অনুমতি হয়।"

প্রতাপসিংহ কহিলেন "এখন তবে যাও, সান্ধ্য ক্রিয়াদি সমাপন করগে।"

বিজয়সিংহ "যে আজ্ঞা" বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

প্রতাপসিংহ দাসীকে কহিলেন "বিজয় ক্লান্ত হইয়াছে, সন্ধ্যাদি সমাপন হইলেই আহারের আয়োজন করিয়া দিও।"

দাসী। দেবী ইতিমধ্যে সে সমস্ত প্রস্তুত করিয়াছেন।

প্রতাপসিংহ ঈষৎ হাস্য সহকারে করিলেন "মা আমার লক্ষ্মী-স্বরূপিণী।"

বিজয় সিংহ দাসীর অনুসরণ করিলেন। দাসী ক্রমশঃ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। বিজয়সিংহ দেখিলেন কমলা অন্তঃপুর দ্বারে দণ্ডায়মানা, বিজয় সিংহ তথায় উপস্থিত হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহারাজের কুশল ত?"

বিজয়। আমার কুশল, তুমি ভাল আছ কমলা?

কমলা তাহার কোন উত্তর না দিয়া কহিলেন যে " এই গৃহে সান্ধ্যাদির সমস্ত আয়োজন হইয়াছে, আপনি সান্ধ্যকৃত্য সমাপন করুন। "

বিজয়সিংহ সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলে, কমলা তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

সাদৃশ্য পর্য্যালোচনা।

আয়েষা ও তিলোত্তমা।

এই পৃথিবী মধ্যে দুইটি হৃদয়, এক উপকরণে ঠিক একরূপ হইয়া যে গঠিত হইয়াছে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। দয়া, স্নেহ, মায়া, ভালবাসা, বিনয় প্রভৃতি অশেষ প্রকার হৃদয়গত ভাব বা গুণ অথবা দোষ দুইটি হৃদয়ে সমান রূপে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে, তথাপি দুইটি হৃদয়ের কার্য্য একরূপ হইবে না, বৈলক্ষণ্য প্রত্যক্ষীভূত হইবেই হইবে। প্রকৃত প্রস্তাবে দেখিতে গেলে মনুষ্যের সমস্ত মানসিক ভাব কখন অপরের সহিত সর্ব্বাংশে তুল্য হয় না। কিছু না কিছু প্রভেদ পরিলক্ষিত হইবেই হইবে।

আয়েষা ও তিলোত্তমা উভয়েই স্ত্রীলোক, উভয়েই সুন্দরী, উভয়েই স্নেহ, মায়া, ভালবাসায় সমান বলিলে অন্যায় হয় না। তথাপি উভয়ে কত প্রভেদ। তিলোত্তমা লজ্জাশীলা মুখে কথা নাই। আয়েষা লজ্জা থাকিলেও প্রগল্‌ভা। তিলোত্তমা হিজি বিজি কাটিতে কাটিতে " জগৎ সিংহ " লিখিয়া ফেলিয়া কত লজ্জিত হইল। মুছিয়া ফেলিল তথাপি মন বুঝিল না, মনে হইল " জগৎ সিংহ " এই কথাটি সেখানে উজ্জ্বল বর্ণে লিখিত রহিয়াছে। আবার জগৎ সিংহ তিলোত্তমার নিকট উপবিষ্ট, তিলোত্তমার বাঙ্‌নিষ্পত্তি নাই, তিলোত্তমা লজ্জায় ম্রিয়মাণা। অথচ জগৎ সিংহ ব্যতিরেকে জগৎ সংসার অন্ধকারময় দেখিতেছে।

তিলোত্তমা যখন বিমলার কৌশলে মুক্তি পাইয়া কারাগারে জগৎ সিংহকে দেখিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিল, তখন তিলোত্তমাকে স্বরূপতঃ বুঝা যায়। তিলোত্তমার হৃদয়ের ভাব দেখিয়া দুঃখ হয় এবং অচতুরা বালিকার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে—তিলোত্তমার হৃদয়স্থ প্রণয়পঙ্কজ যদিও অপারিস্ফুট বলিয়া বোধহয় না, তথাপি তাহাকে অচতুরা বালিকা বলিয়া পদে পদে বোধ জন্মাইয়া দেয়। তিলোত্তমা তাহার সেই ক্ষুদ্র অথচ পবিত্র হৃদয়াসনে যে ভালবাসাবিভূষিত প্রেম প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিত্য আরাধনা করিতেছিল তাহা কে না বুঝিতে পারে? বাস্তবিকই তিলোত্তমার হৃদয়গত ভাব বড়ই মনোরম; তাহা সম্যক প্রকারে প্রকাশিত হয় নাই তাহা মেঘাচ্ছাদিত বিভাকরের ন্যায় ভাসমান।

তিলোত্তমা মুগ্ধস্বভাবা বালিকামাত্র। তাহার জগৎকে তাহাকে দাও, আর সে কিছুই চাহিবে না। তাহার রত্নালঙ্কার তোমায় দিবে, গৃহ, সম্পত্তি প্রভৃতি সমস্ত দিবে, পথে পথে ভিক্ষা করিয়াও সে সুখী হইবে। কিন্তু সেই জগৎ ব্যতীত তাহার হৃদয়ে কিছুই ভাল লাগে না। অবোধ বালিকা প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াও যদ্যপি সেই প্রেমের অব্যক্ত যাতনা হইতে নিষ্কৃতি পায়, তাহাও সে অম্লানবদনে করিতে উদ্যত।

তিলোত্তমা সতীত্বের আদর্শ স্বরূপ, তিলোত্তমার হস্তে জগৎ সিংহকে সমর্পণ করিয়া জিজ্ঞাসা কর, তুমি ইহাকে চাও কি? শতবর্ষ পরেও এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলেও তিলোত্তমা তোমার সমক্ষে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবে না। তাহার বক্ষ দুর দুর করিবে, চক্ষে অজস্র বারিধারা প্রবাহিত হইবে, হয়ত সে মূর্চ্ছা যাইবে। আবার তিলোত্তমাকে বল যে জগৎ সিংহ তোমায় চায় না। তিনি আয়েষাকে বিবাহ করিয়াছেন। আর তুমি ইহ সংসারে সেই লজ্জাবাঞ্জক্ প্রেম প্রতিম বদনখানি দেখিতে পাইবে না। তিলোত্তমার তাহাতেও বাঙ্নিষ্পত্তি হইবে না, সেই নিদারুণ বাক্যই হয়ত তাহার দেহ হইতে প্রাণবায়ু বাহির করিয়া দিবে। তিলোত্তমার চরিত্র এইরূপ। বঙ্কিম বাবু অতি চাতুর্য্যের সহিত এই লোকবিমোহনকারী চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন।

কিন্তু আয়েষা? তাহার সে লজ্জা নাই, সে অভিমান নাই, সে সন্দেহ নাই। ভালবাসিবে কি না ভাবিয়া অগ্র পশ্চাৎ করা নাই। তিলোত্তমা কতবার ভাবিয়াছে যে, জগৎ সিংহ হয়ত আমায় বিস্মৃত হইয়াছেন, কিন্তু আয়েষার মুখে সে কথা নাই। আয়েষা অম্লানবদনে, অপ্রতিহত চিত্তে, নির্ভীক হৃদয়ে, ওসমান সমক্ষে যে সকল কথা বলিয়াছিল তাহা শুনিলে বাস্তবিকই শরীর লোমাঞ্চিত হয়, দেহে বিদ্যুৎ বেগ ধাবিত হয়, আয়েষার প্রতি ভক্তি জন্মে। আয়েষাকে রমনীকুলভূষণ অমূল্য রত্ন বলিয়া বোধ হয়। বঙ্কিম বাবু আয়েষাতে যে সৌন্দর্য্যরাশি বিন্যস্ত করিয়াছেন তাহা যে সহজে অন্য কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না তাহার সংশয় নাই।

কিন্তু আয়েষার সহিত তুলনা করিতে গেলে, সম্ভবত তিলোত্তমাই হীনপ্রভা হইয়া পড়েন। আয়েষা বুঝিয়াছিল যে জগৎ সিংহ তাহার হইবে না, তথাপি তাঁহাকেই আত্মসমর্পণ করিল। এ বিশ্ব সংসারে এরূপ স্বার্থশূন্য হৃদয়ে একবারে আত্ম সমর্পণ কেহ কখন করিয়াছেন কিনা সন্দেহ!

এই পাঠান দুহিতা আয়েষার সহিত, একবার ইংরাজ মহিলার তুলনা করিয়া দেখ। সাহিত্য কাননের পরিমলপূর্ণ সুন্দর কুসুম, তুলনার উচ্চ সোপান, প্রণয়ের আদর্শ, জুলিয়েট, মিরন্দা, ও দেসদিমোনার সহিত ইহার তুলনা করিলে দেখিবে আয়েষা তাহাদের কাহার অপেক্ষা ভালবাসিতে ন্যূন শিক্ষা করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা আয়েষার ন্যায় আত্মসমর্পণ করিতে পারেন নাই।

যে জুলিয়েট পদে পদে স্বামীর হৃদয় পরীক্ষা করিয়াছে, পদে পদে আত্ম সমর্পণ করিতে দ্বিধা করিয়াছে, তাহার সহিত আয়েষার তুলনা, অগ্নিপরীক্ষা মাত্র।

জুলিয়েট প্রেমের প্রস্তাবনাতেই বলিল——

"O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?
Deny thy father, and refuse thy name,
Or if thou will not, be but sworn my love
And I'll no longer be a Capulet."

পরক্ষণে আবার বলিতেছে :——

"Romeo doff thy name;
And for that name, which is no part of thee
Take all myself."

পুনশ্চ নানা প্রকার শপথ করাইবার নিমিত্ত রোমিওকে ঘুরাইতেছে, অতএব ইহাকে আমরা কোন ক্রমেই সুন্দর আত্মসমর্পণ মধ্যে গণ্য করিতে পারি না। জুলিয়েট ভাল বাসিতে পারে. কিন্তু তাহার আত্মসমর্পণ আয়েষার সহিত তুলনা করিতে লজ্জিত হই। আয়েষার কোন সৌন্দর্য্য জুলিয়েটে থাকিতে পারে, কিন্তু আয়েষার মধুর ও স্বর্গীয় আত্ম সমর্পণ জুলিয়েট কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই।

আবার দেসদিমোনার সহিত তুলনা করিয়া দেখ, কে প্রতিহত হয়? আমরা বলিতে পারি যে, আয়েষা দেসদিমোনা অপেক্ষা আত্ম সমর্পণে কোন অংশেই ন্যূন নহে। বরং শ্রেষ্ঠ বলিলেও অন্যায় বলা হইবে না। দেসদিমোনা ওথেলোর হৃদয়ের অধিকারিণী হইয়াছে, তখন পিতৃসমক্ষে বলিয়াছিল—যে

"My noble father,
I do perceive here a' devided duty
To you I am bound for life and education,
My life, and education both do learn' me
How to respect you; you are the lord of duty,
I am hitherto your daughter but here's my husband:
And so much duty as my mother showd
To you, preferring you before her father.
So much I challenge that I may profess
Due to the Moor, my lord."

প্রিয় পাঠক! একবার আয়েষার হৃদয়ের আন্তর স্তরে প্রবেশ করিয়া দেখ। আয়েষা বুঝিয়াছিল যে জগৎসিংহ অপর-হৃদয়পিঞ্জরের বিহঙ্গ,

তথাপি তাহাকে সে উপাস্য দেবতার ন্যায় আরাধনা করিত ও চিরকাল করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল।

আয়েষার চরিত্র পাঠ করিলে উত্তম উপলব্ধি হয়, যে যাহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে স্বার্থশূন্য ভালবাসা বলে, আয়েষা বাস্তবিকই তাহাই করিয়াছিল। আয়েষার হৃদয়গত ভাব সমস্ত স্বর্গীয় ও মধুর। কিন্তু আয়েষা হতভাগিনী!

দেখিতে গেলে বনবিহঙ্গিনী মিরন্দার আত্মসমর্পণ প্রকৃতই মধুর, প্রকৃতই তাহাতে মধুর প্রেম বিরাজ করিতেছে। মিরন্দা ফার্দ্দিনন্দকে কাষ্ঠ বহনে কাতর দেখিয়া বলিতেছে।

"If you'll sit down
I'll bear your logs the while: pray give me that
I'll carry it to the pile."

যখন মিরন্দার পিতা ফার্দ্দিনন্দের রূপের নিন্দা করিল, তখন মিরন্দা অম্লান বদনে বলিল।——

"My affections
Are then most humble; I have no ambitions
To see a goodlier man."

মিরন্দা নির্লজ্জ ভাবে নায়ককে পাইয়া বলিল——

"I am your wife, if you will marry me,
If not, I die your maid; to be your fellow
You may deny me, but I will be your servant
Whether you will or no."

এই মানসিক তেজ ও সুন্দর পবিত্রতা আয়েষারও প্রতি কথায় প্রতি কার্য্যে প্রকাশ পায়। আয়েষা যে রূপ স্নেহশালিনী সেই রূপ পরদুঃখ কাতরা, সেইরূপ পবিত্রা ও প্রেমময়ী। আয়েষার চরিত্র জগতের একটী সুন্দর চরিত্র, অথবা সুন্দর চরিত্র সমষ্টির সার ভাগ মাত্র।

অনেকের বিশ্বাস যে আয়েষার চরিত্র সারওয়াল্টর স্কটের বিখ্যাত উপন্যাস আইভান্‌হোর রেবেকার চরিত্রের অনুকরণ মাত্র। স্বীকার করি

যে এ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রমাত্মক নহে, তথাপি সম্পূর্ণ সত্যও নহে। রেবেকায় যাহা আছে তাহা আয়েষায় আছে, কিন্তু আয়েষায় যাহা আছে তাহা রেবেকায় নাই। জগৎসিংহের রুগ্নাবস্থায় আয়েষা কর্ত্তৃক শুশ্রূষা, ওসমানের প্রণয়ে অবজ্ঞা, তিলোত্তমাকে অলঙ্কার দান প্রভৃতির ন্যায় কার্য্য রেবেকায় থাকিতে পারে, কিন্তু আয়েষার অপরাপর বহুল সৌন্দর্য্য তাহাতে নাই। আয়েষার ওসমানকে পাণিদান বিষয়ে অনিচ্ছা, আর রেবেকার টেম্প্লারের সহিত প্রণয় করিতে অসম্মতি, এতদুভয়ে অনেক প্রভেদ। রেবেকা যাহা করিয়াছিলেন তাহা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। কারণ টেম্প্লার একজাতি, রেবেকা একজাতি, রেবেকা টেম্প্লারের বন্দিনী মাত্র। টেম্প্লারের উদ্ধত স্বভাবে ও ওসমানের বিনয়ে অনেক প্রভেদ। ওসমান লালায়িত, টেম্প্লার ভয় প্রদর্শন করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধারে যত্নপর। ওসমানের ইচ্ছা প্রণয়, টেম্পলারের ইচ্ছা তাহার বিপরীত। ওসমান বিবাহ করিতে পারিলে কৃতার্থ হয় আপনাকে সৌভাগ্যশালী বিবেচনা করে, কিন্তু টেম্প্লার তাহাতে স্বীকৃত হয় না। যেখানে প্রাণ লইয়া টানাটানি সেখানে কি করিয়া প্রণয় হইতে পারে? আরও আইভান্হোর রুগ্ন শয্যা ও জগৎসিংহের রুগ্ন শয্যায় অনেক প্রভেদ। স্বীকার করি যে রেবেকার অলঙ্কার দান, আয়েষা অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর। আয়েষার জগৎসিংহের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ পাইয়াছিল, কিন্তু রেবেকার ভালবাসা কাহার নিকট প্রকাশ পায় নাই। তথাপি আয়েষার চরিত্র অতি উত্তম রূপ রক্ষিত হইয়াছে। আয়েষার প্রেমও ওসমানের জন্য প্রকাশ পায় নতুবা তাহাও প্রকাশ পাইত না।

অনুকরণ ব্যতীত মনুষ্য প্রকৃত উন্নত হইতে পারে না। লেখক হইলেই তাহাকে কিছু না কিছু পূর্ব্বতম লেখকদিগের নিকট ঋণী হইতে হইবে। কিন্তু অনুকরণ মাত্রেই দূষ্য নহে। অনেক অনুকরণ প্রকৃত অপেক্ষা উত্তম হইয়াছে। যিনি অনুকরণ করিতে গিয়া কোন মন্দ ভাগ গ্রহণ করিয়া কেবল রুচির বিকৃতি মাত্র প্রদর্শন করেন, তাঁহার অনুকরণ করিতে ক্ষান্ত হওয়াই বিধেয়। কিন্তু যিনি আদর্শ অপেক্ষা অনুকরণকে আরও উজ্জ্বল করিতে সক্ষম তাঁহার অনুকরণ ততদূর দূষ্য নহে। অনেকের

ধারণা যে অনুকরণ মাত্রেই ইচ্ছাধীন কিন্তু তাহা ভ্রম। সে যাহাই হউক সে বিষয় লইয়া আন্দোলনে আমাদের আবশ্যক নাই। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে উন্নতির প্রথম সোপান অনুকরণ, পরে সে অনুকরণ থাকে না। তথাপি কে না স্বীকার করিবে যে যত অনুকরণ করিতে বিরত হইতে পারা যায় ততই শ্রেয়, কে না প্রকৃতে ও অনুকরণে দুইরূপ মর্য্যাদা প্রদান করিবে।

আমরা আয়েষার চিত্রকে সম্পূর্ণ রূপে রেবেকার চিত্রের অনুকরণ বলিতে পারি না। তবে আয়েষার চিত্রে রেবেকার ছায়া পড়িয়াছে এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। যাহাই হউক এ সংসারে যদ্যপি দুই একটী আয়েষা জন্মে তাহা হইলে সংসার সুখের আস্পদ হয়। এ সংসারে আর আয়েষা নাই। আয়েষা পুষ্প বুঝি এ সংসারোদ্যানে আর ফুটিবে না।

মুকুন্দ চরিত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সর্ব্বাগ্রে তাঁহার জীবিত কাল, যতদূর সাধ্য, নির্ণয় করা যায়, যাউক। অধুনাতন মুদ্রিত চণ্ডী কাব্যের শেষভাগে "শকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা" ইত্যাদি রূপে যে কাব্যখানির রচনা কাল নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, তাহা কতদূর সত্য? উক্ত কাব্যে "গ্রন্থোৎপত্তির কারণ" প্রবন্ধে মানসিংহের বঙ্গশাসন কালে মামুদ সরিফের অত্যাচার পীড়িত হইয়া কবি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন, এবং মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত আরড় ব্রাহ্মণ ভূমির রাজা রঘুনাথ রায়ের সানুকুল্যে চণ্ডীকাব্য রচনা করে বলিয়া যে নির্দ্দেশ আছে, তাহার সহিত কাব্য সম্পূর্ণতার যে কবিতাটী আছে তাহার সমতা রক্ষিত হয় না। "শকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা" অর্থাৎ ১৪৬৬ শক ইংরাজী ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দ। রাজা মানসিংহ ইংরাজী ১৫৮৯

খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের রাজাসনে আসীন ছিলেন। যদি ১৪৬৬ শকে অর্থাৎ ইংরাজী ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দে চণ্ডী কাব্য বিরচিত হইয়া থাকে তাহা হইলে কবি ১৪৬৬ শকে চণ্ডী রচনারকালে কিরূপে মানসিংহের অধীন রাজা মামুদ সরিফের কথা ভবিষ্যৎ নির্দ্দেশ করেন, এবং কিরূপেই বা শেষোক্তের উৎপীড়ন তাঁহার সহ্য করা সম্ভবে? ১৪৬৬ শকের একটী অনুকূল প্রমাণ আছে বটে কিন্তু আবার তাহার প্রতিকূল যুক্তি একটীও আসিয়া উপস্থিত হয়। মূল গ্রন্থে "গ্রন্থোৎপত্তির কারণ" নামক প্রবন্ধটী নাই, তাহার পরিবর্ত্তে ঐ স্থানে কবির বাসভূমি ও পূর্ব্বপুরুষগণের পরিচয় জ্ঞাপক একটী দীর্ঘ প্রবন্ধ আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইতেছে। ঐ প্রবন্ধটী আধুনিক মুদ্রিত গ্রন্থে নাই।

কুলে শীলে নিরবন্ধ, কায়স্থ ব্রাহ্মণ বৈদ্য,
দামুন্যাতে সজ্জনের বাস,
অতিশয় গুণ বাড়া, সুধন্য দক্ষিণ পাড়া,
সুপণ্ডিত সুকবি সমান।
ধন্য ধন্য কলিকালে, রত্নানু নদের কূলে,
অবতার হইলা শঙ্কর,
ধরি চক্রাদিত্য নাম, দামুন্যা করিলা ধাম,
তীর্থ কৈলা সেই সে নগর।
বুঝিয়া তোমার তত্ত্ব, দেউল দিলা বৃষ দত্ত,
কত কাল তথায় বিহার,
কে বুঝে তোমার মায়া, সুরকুল তেয়াগিয়া,
করিলা সঞ্চার।
গঙ্গাসম সুনির্ম্মল, তোমার চরণ জল,
পান কৈনু শিশুকাল হৈতে,
সেই ত পুণ্যের ফলে, কবি হই শিশুকালে,
রচিলাম তোমার সঙ্গীতে।
হরিনন্দী ভাগ্যবান, শিবে দিল ভূমিদান,
মাধব ওঝা ধনাদিকারনী,

দামুন্যার লোক যত, শিবের চরণে রত,
সেই পুরী হরের ধরণী।
কুলের অরি, যশমন্ত অধিকারী,
কল্পতরু নাগ উমাপতি,
অশেষ পুণ্যের স্কন্ধ, নাগ ঋষি সর্ব্বানন্দ,
সেই পুরী সজ্জন বসতি।
কাটা দিয়া বন্দ্য ঘাটী, বেদান্ত নিগম পাটী,
ঈশান পণ্ডিত মহাশয়,
ধন্য ধন্য পুরবাসী, বন্দ্য সে বাঙ্গালপাশী,
লোকনাথ মিশ্র ধনঞ্জয়।
কাঞ্জুড়ি কুলের আর, মহামিশ্র অলঙ্কার,
শব্দ কোষ কাব্যের নিদান,
করড়ি কুলের রাজা, সুকৃতি তপন ওঝা,
তস্য সুত উমাপতি নাম।
তনয় মাধব শর্ম্মা, সুকৃতি সুকৃত কর্ম্মা,
তার নয় তনয় সোদর,
উদ্ধরণ, পুরন্দর, নিত্যানন্দ, সুরেশ্বর,
বাসুদেব, মহেশ, সাগর।
সর্ব্বেশ্বর অনুজাত, মিশ্র নাম জগন্নাথ,
একভাবে সেবিলা শঙ্কর,
বিশেষ পুণ্যের ধাম, সুধন্য হৃদয় নাম, *
কবিচন্দ্র তাঁর বংশধর।
অনুজ মুকুন্দ শর্ম্মা, সুকবি সুকৃত কর্ম্মা,
নানা শাস্ত্রে নিশ্চয় বিদ্বান্,
শিবরাম বংশধর, কৃপাকর মহেশ্বর,
রক্ষ পুত্রে, পৌত্রে ত্রিনয়ন।

* মূলে "সুধন্য হৃদয় নামের" উপরেই "গুনিরাজ মিশ্র নাম" লিখিত আছে, ইহাতে বোধ হয়, তাঁহার নামান্তর গুনিরাজ।

যদি একথা ধরা যায় যে গ্রন্থোৎপত্তির কারণ কবির নিজের লিখিত নহে, অন্য কাহার দ্বারা গ্রন্থরচনার পর লিখিত; তাহা হইলে ১৪৬৬ শকের সত্যতা রক্ষা পায়। কিন্তু জানিতে হইবে যে কবি নিশ্চয়ই রাজোৎপীড়নে উত্যক্ত হইয়া আপনার প্রিয়তম জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। যদি বলেন মামুদ সরিফ সেরখাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী মানসিংহের অধীনস্থ বর্দ্ধমানের কোন অধস্তন শাসনকর্ত্তা, তাহা হইলেও ত মানসিংহের অধিকারকালমধ্যে বা পরে ১৪৬৬ শক আইসে না। তবে ১৪৬৬ শকে উক্ত কাব্যের প্রণয়ন কাল নির্দ্দেশ অসঙ্গত, ইহা ধ্রুব। যদি কেহ বলেন যে মহারাজ মানসিংহের অধিকার কালের পূর্ব্বে ১৪৬৬ শকে কবি চণ্ডীকাব্য রচনা করিয়া তাহার বহুকাল পরে "গ্রন্থোৎপত্তির কারণ" লিখিয়া পুস্তকমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়া থাকিবেন; এবং কালগৌণহেতু বঙ্গরাজের অধিকারকালে পরিবর্ত্তনে ভ্রম জন্মিয়া থাকিবে। বিশেষতঃ তৎকালে সংবাদ পত্রাদির প্রচার বা রাজধানীতে সাধারণ লোকের গতায়াত তদাদৃশ নৈরন্তরিক ছিল না। সুতরাং তদানীন্তন রাজকর্ম্মচারীর পরিবর্ত্তন বা নূতন রাজাজ্ঞা প্রচার সাধারণের গোচর হইতে অধিক সময় লাগিত। এরূপ অনর্গতর্কীদিগকে নিরস্ত করিবার সহজ উপায় আছে। উপরি লিখিত কবিতা পাঠে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে চণ্ডী রচনা করিবার সময় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সংসারটী পুত্র পৌত্রে জাজ্জ্বল্যমান ছিল। সে সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম অন্যূন চত্বারিংশৎবর্ষছিল স্বীকার করিতেই হইবে। ঐ সময়ের ৪০ বৎসর পরে মহারাজ মানসিংহের বঙ্গশাসন কাল। ১৫৮৯ হইতে ১৬০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পঞ্চদশ বৎসর। এইত পঁচানব্বই বৎসর; তাহার অন্ততঃ দশ পনর বৎসর পরে না হইলে এরূপ রাজ-শাসন কালভ্রম জন্মিবার সম্ভাবনা নাই, পাকে প্রকারে একশত দশ বৎসর হইল। আমরা তাঁহার বংশধরদিগের নিকট শুনিয়াছি যে তিনি আনুমানিক অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে এই প্রপঞ্চ জগৎ ও পাঞ্চ-ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিয়া দিব্যলোক আশ্রয় করেন;—প্রভূত ব্যাধিমন্দির মানবদেহধারণে যে একজন এতাধিককাল ইহলোকে অব-

স্থিতি করিতে পারেন ইহা আমাদিগের বিশ্বাসে আইসে না। এই প্রকারে আমরা যে দিকে, যে উপায় অবলম্বন করিয়া ১৪৬৬ শকে চণ্ডীকাব্য রচনার সত্যতা রক্ষা করিতে চেষ্টা করি কোন মতেই তাহা রক্ষা পায় না। ফলতঃ "গ্রন্থোৎপত্তির কারণ" টী যে চণ্ডীকাব্য বিরচিত হইবার পর গ্রন্থকার কর্তৃক সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা উক্ত প্রবন্ধ পাঠেই প্রতীত হয়। যথাঃ—

"শুন ভাই সভাজন, কবিত্বের বিবরণ,
এই গ্রন্থ হইল যেমতে।"

ইত্যাদি বাক্যে কে না বিশ্বাস করিবেন যে, চণ্ডীকাব্য সমাপ্ত করিবার পর কবি সভাস্থ ব্যক্তিবর্গকে গ্রন্থোৎপত্তির পরিচয় দেন।

(ক্রমশঃ)

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

———ooo———

মামুয়েল হানিমানের জীবনী ও তৎপ্রণীত গ্রন্থাবলীর বিবরণ। শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় কর্তৃক বিরচিত। টালিগঞ্জ কাশীখণ্ড যন্ত্র।

বঙ্গভাষায় জীবনচরিত গ্রন্থ অতি কম। বঙ্গভাষাপ্রিয় ব্যক্তিগণের নাটক নভেল লিখিতে যে রূপ আগ্রহ ও রুচি, সে রূপ আর কিছুতেই নাই। আমরা নাটক নভেল লেখকের নিন্দা করি না, আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য যে বঙ্গসাহিত্য জগতে নাটকনভেল ব্যতীত আরও অনেক বস্তু আছে, তৎ সমুদয়ের অনুসরণ করিলে বঙ্গসাহিত্যেরও উপকার দর্শে এবং লেখকেরাও নানা বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া নানা গ্রন্থের রচনা করিতে পারেন। মহদ্ব্যক্তিগণের জীবনচরিত লেখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ইহাতে কেবল সাহিত্যজগতের অঙ্গ পরিপুষ্টি হয় তাহা নহে। ইহাতে সাধারণের রুচিরও পরিবর্ত্তন হয়, উৎকর্ষলাভের বাসনাও জন্মে। হানিমানের তুল্য

মহোপাধ্যায়ের জীবনী সাধারণে প্রকাশিত হওয়া সর্ব্বথা কর্ত্তব্য, সুতরাং মহেন্দ্র বাবু সেই জীবনী জনসমাজে প্রকাশিত করিয়া যে একটী সৎকার্য্য করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

গ্রন্থের ভাষা পরিষ্কার এবং যত্ন করিয়া লেখা। গ্রন্থখানি বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক আলোচনায় পূর্ণ হইলেও মহেন্দ্র বাবু তৎ সমুদায় এরূপ পরিষ্কার ভাবে লিখিয়াছেন যে তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে ইচ্ছা করে। উপসংহারে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে আমরা গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া সাতিশয় প্রীত হইয়াছি। এখানি বঙ্গবিদ্যালয় সমূহের উচ্চ শ্রেণীর পাঠোপযোগী।

জোড়াসাঁক লাইব্রেরীর সাম্বৎসরিক বিবরণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। কতিপয় উন্নতমনা বালকের উৎসাহে ও যত্নে উক্ত লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেখা গেল যে ইহার ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। আশা করি যেন ইহার উৎসাহদাতাগণের উদ্যম অটলভাবে রহে, তাহা হইলেই পুস্তকালয়টি দিন দিন উন্নত হইয়া সাধারণের উপকারে আসিবে।

লর্ড ও লেডি রিপনের চিত্র। শ্রীপ্রিয়লাল মিত্র কর্ত্তৃক চিত্রিত।

প্রিয় বাবু উক্ত চিত্রদ্বয় অতি সুন্দর রূপে চিত্রিত করিয়াছেন। আশা করি প্রিয় বাবু ভবিষ্যতে এইরূপ চর্চ্চা রাখিয়া সূক্ষ্ম শিল্পের অভাব মোচনে যত্নপর হইবেন, এবং আমরাও মধ্যে মধ্যে তাঁহার সুন্দর সুন্দর চিত্র দেখিয়া অন্তরের সহিত আহ্লাদিত হইব।

The Leisure Hour. ইহা একখানি ইংরাজি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র। আমরা ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। যে সকল বিবিধত্ব থাকিলে সংবাদ পত্র সাধারণের প্রিয় হয় ইহাতে তাহা আছে। লেখা সরল এবং সংবাদ পত্রোপযোগী। গুটিকত বেশ আবশ্যকীয় বিষয় লিখিত হইয়াছে। এ পত্রখানি দীর্ঘজিবী হইলে আমরা আহ্লাদিত হইব।

— ——

বাঙ্গালির বাংগলা শিক্ষা।

আজি কালি বঙ্গের উন্নত অবস্থা কিনা তাহা বঙ্গের শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন, দাসত্বের স্থূল চক্রে বিমর্দ্দিত হইয়াও বঙ্গের উন্নতির আকাঙ্ক্ষা করা যাইতে পারে। 'নিরপেক্ষভাবে বলিতে কি ইংরাজদিগের সুশাসনে, ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাবে, ইংরাজদিগের সভ্যতার আদর্শ গ্রহণে, বাঙ্গলার উন্নতি দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। এ কথা প্রত্যেক বাঙ্গালিকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে আমরা পঞ্চশতবর্ষ মুসলমান দিগের রাজ্যে বাস করিয়া যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি, ইংরাজ সুশাসনে সেই সময়ের চতুর্থাংশের একাংশে তাহার অধিকাংশ পূর্ণ হইয়াছে। তবে বাঙ্গালির শ্লাঘা করিবার দিন এখনও উপস্থিত হয় নাই। বাঙ্গালির এখনও ইংরাজ বা অন্য কোন সভ্যজাতির প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার উপযুক্ত সময় হয় নাই, তাহার প্রধান কারণ বাঙ্গালির কার্য্যান্ধতা। এ কথা কে না স্বীকার করিবে যে অনুকরণ ব্যতীত কেহ কখন উন্নত হয় নাই, কোন্ বহুদর্শী না দেখিয়াছেন যে অনুকরণ ব্যতীত কেহ উন্নতিলাভ করে নাই। আজি বাঙ্গালির সেই অনুকরণের দিন উপস্থিত, কেহ স্বীকার করুক বা না করুক এ কথা নিশ্চয় যে অনুকরণ ব্যতীত বাঙ্গালির উপায়ন্তর নাই। বাঙ্গালীও অনুকরণ প্রিয় বটে। কিন্তু অনেক বিবেচনা করিয়া দেখিলে উত্তম উপলব্ধি হয় যে বাঙ্গালির উন্নতি হইতে অনেক বিলম্ব আছে। কারণ তাহারা অনুকরণ প্রিয় হইয়াও ভ্রমান্ধ; অর্থাৎ কোন্টী অনুকরণীয় বা কোন্টী অনুকরণের অযোগ্য ইহা বুঝিতে অক্ষম, সেই ভ্রমান্ধতা যতদিন না অন্তর্হিত হইতেছে ততদিন কোন ক্রমেই বাঙ্গালির গ্রহ প্রসন্ন হইতেছে না।

আমাদের উন্নতির আর একটি বিশেষ প্রতিবন্ধক যে বাঙ্গালির উন্নতি পক্ষে দৃষ্টি অতি কম। ময়ূর বয়সের চাতুরীর অনুকরণ করিলে চতুর হইতে পারে, কিন্তু বায়স হওয়া কি শোচনীয় নহে? আজি বাঙ্গালির

সেই দশা। বাঙ্গালি অনুকরণশীল বটে কিন্তু স্বকার্য্য সিদ্ধির জন্য নহে। যতদিন না বাঙ্গালি মাত্রেরই হৃদয়ে স্বতঃহউক অন্যতঃ হউক সেই এক মাত্র লক্ষ্য বদ্ধমূল হইবে ততদিন বঙ্গের উন্নতি হইবে না। কিন্তু এ সকল কথার আন্দোলন এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, বাঙ্গালির বাঙ্গলা শিক্ষা সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সুতরাং অন্যান্য অংশ ত্যাগ করিয়া বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি সম্বন্ধে দুই একটি কথা মাত্র অদ্য আমরা বলিব।

বাঙ্গালি বলিয়া আত্ম পরিচয় দিয়া যিনি বঙ্গভাষার উন্নতি সাধনে যত্ন বিহীন, তিনি বঙ্গের সুসন্তান নহেন, তিনি আমাদিগের প্রাণের ভাই নহেন, তাঁহার সহিত আমাদের শত সম্বন্ধ থাকিলেও তাঁহার কোন কার্য্যে আমাদের সহানুভূতি নাই। স্বীকার করি যে বাঙ্গালা ভাষা একটি ভাষা পদবাচ্য নহে, তথাপি যে কখন তাহা একটি ভাষা হইবে একথা বলিয়া আত্ম শ্লাঘা করিতে পারিব না, তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হই—লজ্জিত হই, মর্ম্মে ব্যথানুভব করি। বলিতে কি, আমরা যত বিজাতীয় ভাষা পাঠ করি না কেন, তন্মধ্যে বাঙ্গলার তুল্য সুমিষ্ট ভাষা কুত্রাপি যে পাঠ করি না, ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ইহার কারণ, বাঙ্গলা আমাদের মাতৃভাষা, মা বলিয়া ডাকিলে যে পরিতৃপ্তি, "মাদারে" সে পরিতৃপ্তি নাই, ভাই বলিলে যতটা প্রাণ জুড়ায়, "ব্রাদার" বলিলে বোধ করি ততটা হৃদয়ের পরিতৃপ্তি হয় না। তাই বলি মাতৃভাষা তুল্য ভাষা নাই। যদি জননীকে না স্নেহ করিলে, না ভালবাসিলে কাপুরুষ বলিয়া অভিহিত হই, তাহা হইলে মাতৃভাষার প্রতি বৈরাগ্য দেখাইলে কেন যে সে পদবাচ্য হইব না, তাহার কারণ দেখিতে পাই না। মা নাই কার? কিন্তু পরস্পরে কেন মাতাকে ভালবাসে, কেন সকলে বলে যে "মাতার তুল্য ইহ জগতে আর কেহ নাই।" সেই নিমিত্ত ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে মাতৃভাষা তুল্য সুমিষ্ট ভাষা আর দ্বিতীয় নাই।

আজ কাল প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া যায় বঙ্গীয় যুবক মাত্রেরই বঙ্গভাষায় কেমন এক ঘৃণা আছে, বাঙ্গলাভাষায় কথা হইলে তাঁহারা হাসিয়া উড়াইয়া দেন। ইহা স্বীকার্য্য যে একাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ভাষা

ইংরাজি বা অপরাপর ভাষার সহিত তুলনা যোগ্য হয় নাই, তথাপি ইহা অধিক দুঃখের বিষয় যে তাঁহারা বাঙ্গালি হইয়া বাঙ্গলাভাষার নিন্দা করেন। বাঙ্গলাভাষার কিছু নাই বলিয়া যে হৃদয়ে অবজ্ঞা করেন, সেই হৃদয়ে কোন্ প্রাণে বঙ্গভাষার দৈনাবস্থা দেখিয়া দুঃখিত না হন। যে ব্রীটনবাসী দিগের সাহিত্য ভাণ্ডারের রত্নাবলী দেখিয়া বাঙ্গালি হইয়া বঙ্গভাষার প্রতি আস্থা শূন্য হইয়াছ, ভাব দেখি যে সেই ব্রীটনবাসী দিগেরই সাহিত্য ইতিপূর্ব্বে কিরূপ ছিল, আবার কিরূপেই বা এত উন্নত হইল। এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে ইংরাজদিগের অসাধারণ অধ্যবসায় ও যত্নের গুণেই ইংরাজি সাহিত্যের এতদূর উন্নতাবস্থা হইয়াছে। বাঙ্গালিও যত্নশীল হইলে বাঙ্গলাভাষার যে কখন সে দশা হইবে না তাহা কে বলিতে পারে? যিনি বলিবেন তিনি বঙ্গের কুসন্তান, বঙ্গভাষার পরম শত্রু।

বাঙ্গলাভাষা উন্নত না হইবার দ্বিতীয় কারণ আমরা পরাধীন, ইংরাজি-ভাষা না শিখিলে আমাদের চলে না, ইংরাজির পদ সেবা না করিলে আমাদের উপায়ন্তর নাই। বঙ্গভাষার যতটুকু উন্নতি তাহা কেবল বঙ্গভাষা প্রিয় ব্যক্তিমাত্রের বিশেষ উৎসাহে। বঙ্গভাষার পরিচর্য্যার উপর নির্ভর করিয়া বাঙ্গালি যে কোন কালে সচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে, সে আশা করি না, কারণ বাঙ্গলার গৌরব বাঙ্গলা ব্যতীত আর কোথাও হইবে না, অন্ততঃ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা দেখি না। আবার বঙ্গের লোক সংখ্যার সহিত শিক্ষিত শ্রেণির তুলনা করিলে তাহা এত কম যে তাহার উপর নির্ভর করিয়া বুক ঠুকিয়া সাহিত্য ব্যবসায়ী হওয়া নিতান্ত দুরূহ। বঙ্গ-ভাষায় অবনতির আর একটি বিশেষ কারণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। শিক্ষিত দিগের মধ্যেও অনেকে সংবাদ বা সাময়িক পত্রিকাদি লইয়া টাকা দেন না। বাঙ্গলা কাগজ পাঠ করিয়া আবার টাকা দিতে হইবে? যদি শিক্ষিত শ্রেণির ভিতর এরূপ ধারণা হয় তবে কখন কি বঙ্গভাষার গৌরবে গৌরবান্বিত হইব এ আশা করা যাইতে পারে? ছি! ছি! ভদ্র লোকের সহিত ঘরের অর্থ ব্যয়ে সাহিত্য ব্যবসায় করিয়া যদ্যপি অতি সামান্য অর্থের জন্য লোকে প্রবঞ্চিত বা ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাহা

হইলে সে ভাষার কি কস্মিনকালেও উন্নতি হইবে? প্রথমতঃ সাময়িক পত্রিকাদির প্রচারই ভাষা উন্নতির প্রধান সোপান, কিন্তু বঙ্গে তদ্‌প্রচারে কত প্রতিবন্ধক তাহা দেখুন। ইংলণ্ডে কেহ কোন পত্রিকা প্রচার করিলে তদ্‌সম্পাদককে লিখিতে হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তাঁহার কার্য্য কেবল সমাগত প্রবন্ধরাজি পছন্দ করিয়া প্রচার করা মাত্র। কিন্তু বাঙ্গলা পত্রিকার সম্পাদককে সমস্ত না হইলেও অধিকাংশ লিখিতে হয়। তাহাতেও আমরা দুঃখিত নহি, কিন্তু কি দুঃখের বিষয় যে তাঁহারা এত করিয়াও পত্রিকার—নাম মাত্র সামান্য মূল্যও প্রাপ্ত হন না। সেই নিমিত্ত বলিতেছি যে বাঙ্গলাভাষার উন্নতির এখনও অনেক বিলম্ব, যত দিন না সাধারণ পাঠক শ্রেণি পত্রিকাদি পাঠান্তর মূল্য দিতে হয় একথা বুঝিবেন, তত দিন বিশেষ যত্ন করিলেও সহসা বঙ্গভাষার উন্নতি হইবে না।

সে যাহাই হউক একথা সকলকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে বঙ্গভাষা ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে এবং অন্যূন বিংশতি বৎসরের মধ্যে অসাধারণ উন্নতিলাভ করিতেছে। অনুকরণ প্রিয়তাই যে সে উন্নতির মূল কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। ইতিপূর্ব্বে বঙ্গভাষা সংস্কৃত ভাষার অনুকরণে লিখিত হইত, সংস্কৃতভাষা ত্যাগ করিলে বঙ্গভাষার উন্নতি নাই—কিন্তু তাহা হইলেও একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে ইংরাজি শিক্ষাই বঙ্গভাষাকে এত দূর উন্নত করিয়াছে। এখন চিন্তাপূর্ণ ভাব পূর্ণ রচনা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কি দুঃখের বিষয় যে পূর্ব্বে চিন্তাপূর্ণ রচনা ছিল না বলিয়া যাঁহারা বঙ্গভাষাকে ঘৃণা করিতেন, তাঁহারা কেন সে অভাব অপনোদনে চেষ্টা করিতে অকৃতকার্য্য হইয়া কুণ্ঠিত হইতেন না। বাঙ্গলাভাষায় চিন্তাপূর্ণ রচনা নাই, সে অপরাধ কাহার? বঙ্গভাষার—না বাঙ্গালির?

জয়দেব, কবিকঙ্কণ হইতে ভারত চন্দ্র পর্য্যন্ত সংস্কৃতের অনুকরণকারী, সুতরাং তাঁহাদের রচনাবলী—সংস্কৃতানুযায়ী,—অর্থাৎ সমধিক লালিত্যময়ী, কিন্তু চিন্তাপূর্ণ নহে। তত্তৎ রচনা পাঠে পরিতৃপ্ত হওয়া যায় কিন্তু বিমোহিত হওয়া যায় না। জয়দেব বিদ্যাপতি কবিকঙ্কণ প্রভৃতির কথা দূরে থাকুক,

কারণ তাঁহারা ট্যাস ফিরিঙ্গি—না বাঙ্গলা না সংস্কৃত, কিন্তু ভারত অনেকটা বাঙ্গালি বটেন, তাহা হইলেও তাঁহার রচনা পাঠে হৃদয়ে কোন অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হয় না। তবে শব্দ লালিত্যে কতকটা পরিতৃপ্তি জন্মে। যাঁহাকে কবি বলিয়া গৌরব করা যায় সে কবিত্ব ভারতচন্দ্রে নাই, জগদ্বিখ্যাত কবি সেক্ষপিয়ার বলিয়াছেন ঃ——

"The poet's eye in a fine frensy rolling
Doth glance from heaven to earth, from earth to heaven,
And as imagination bodies forth the forms of things un-
known, the poet's pen
Turns them to shapes and gives to airy nothing
A local habitation and a name."

আবার আগ্নেয় পুরাণে লিখিত হইয়াছে——

"নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যাতত্র সুদুর্লভা,
কবিত্বং দুর্লভং লোকে শক্তিস্তত্রা সুদুর্লভা।"

কবিত্বশক্তি, সেই অনির্ব্বনীয় শক্তি ভারতচন্দ্রে ছিল না, এবং পূর্ব্বকার দুই একজন ভিন্ন কোন কবিতে ছিল কিনা সন্দেহ। এই সময়ে একটি কথার উল্লেখ আবশ্যক যে আমরা এখানে শক্তির অর্থ শব্দ লালিত্য গ্রহণ করিলাম না, যে শক্তির প্রভাবে বায়রণ দান্ত লিখিলেন, সেক্ষপিয়ার ওথেলো, টেম্‌পেষ্ট, ম্যাকবেথ প্রভৃতি লিখিলেন আমরা সেই শক্তিকেই শক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। সে শক্তি বঙ্গভাষায় ছিল না তাহা কোন মুখে না মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব।

বঙ্গভাষার উন্নতির পক্ষে ইংরাজি অনুকরণ যে কি বিশেষ সহায়তা করিয়াছে তাহা শিক্ষাপ্রণালি দ্বারা কতক পরিমাণে অনুভূত হইতে পারে। শিক্ষা পদ্ধতির দোষে যে বঙ্গভাষার প্রকৃত উন্নতি হয় নাই তাহা নিশ্চয়। পূর্ব্বে বাঙ্গলা পাঠ করিয়া বাঙ্গলার উন্নতি চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র ছিল ; কারণ তৎকালে বঙ্গভাষায় পাঠ্যপুস্তক ছিল না, যাঁহারা সে সময়ে বাঙ্গলা জানিতেন তাহা সর্ব্বতোভাবে সংস্কৃতভাষা শিক্ষার প্রভাবে। গ্রামে গ্রামে পাঠশালাই তৎকালিন শিক্ষার প্রধান স্থল ছিল, কিন্তু

গুরুমহাশয়েরা যে কিরূপ মহাশয় ছিলেন তাহা তাঁহাদের শিষ্য মহাশয়েরাই জানেন! বস্তুতঃ সাহিত্য শিক্ষা তৎকালে এক প্রকার ছিল না বা যাহা ছিল তাহা অতি সামান্য। কিন্তু এখন আর সেরূপ নাই, এখন সাহিত্য শিক্ষার পাঠ্য পুস্তক হইয়াছে, এখন "শিশুবোধক" ও "বিদ্যাসুন্দর" আমাদের সম্বল নহে। এখন বঙ্গ সাহিত্য ভাণ্ডারে "বিষবৃক্ষ" "দুর্গেশনন্দিনী" "মৃণালিনী" প্রভৃতি উপন্যাস হইয়াছে "লীলাবতী" "নবীন তপস্বিনী" "কৃষ্ণকুমারী" প্রভৃতি অসংখ্য নাটক রচিত হইয়াছে। দুন্দুভি নাদে মাইকেল "মেঘনাদ বধ" মহাকাব্য লিখিয়া বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। কবিশ্রেষ্ঠ নবীন বাবু "পলাশির যুদ্ধ" লিখিয়া বঙ্গ সাহিত্য ভাণ্ডারকে এক অপূর্ব্ব রত্ন দিয়াছেন। তাহার পর "কবিতাবলী" "ব্রজাংগনা" "অবকাশ রঞ্জিনী" "অবসর সরোজিনী" প্রভৃতি বীনাধ্বনিতে বাংগলার দগ্ধ হৃদয়ে অনবরত সুধা ঢালিতেছে। "বৃত্র সংহার" ও আমাদের আদরের ধন বটে। তাহার পর এই অপকৃষ্ট ভাষা হইতে "কমলাকান্তের দপ্তর" নামক অপূর্ব্ব রত্ন দীপিতেছে। "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম" "করুণোচ্ছাসিত প্রাণে কারুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদান করিয়া পাষাণের চক্ষু ফাটাইয়া জল বাহির করিতেছে ও বংগভাষা হইতে যে কতদূর বিষাদময়ী রচনা নিঃসৃত হইতে পারে তাহা দেখাইয়াছে। এদিকে "কল্পতরু" বংগভাষার প্রকৃত হেয়কের হৃদয়েও আস্থা জন্মাইয়া দিতেছে, তদনন্তর "গোচারণের মাঠ" বলিতেছে বংগভাষার সেবা কর তাহা রত্ন প্রসবিণী হইয়া তোমাদের গৌরব রক্ষা করিবে। যে ভাষায় "প্রভাত চিন্তা" "ভ্রান্তিবিনোদ" প্রকটিত হইয়াছে সে ভাষা যে উত্তম ভাষা নহে ইহা কোন প্রাণে বলিব। কালী প্রসন্ন তাঁহার লেখনীর অদ্ভুত ক্ষমতা প্রভাবে উজ্জ্বলভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে বংগভাষা ভাষার উপযোগিনী, বংগভাষা অচিরে ভাষামধ্যে গণ্য হইয়া বাংগালির গৌরব বৃদ্ধি করিবে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে বাংগলাভাষা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকাংশে উন্নত হইয়াছে এবং দিন দিন উন্নত হইতেছে কিন্তু অধিকাংশ বাংগালির বাংগলা শিক্ষায় যে আস্থা নাই তাহাতেই এত দিনেও বংগভাষার অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয় নাই। যিনি বাংগালি হইয়া বাংগলাভাষার নিন্দা

করেন তিনি এটুকু বুঝেন না যে তিনি আপনার নিন্দা করিতেছেন, যাঁহাদের যত্নে বাংগলাভাষার উন্নতি সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করে তাঁহাদের যত্ন ব্যতিরেকে কখন তাহার উন্নতি হইবে না। তাই বলি যাঁহারা বাংগালি বলিয়া আত্মগৌরব করেন, যাঁহারা বাংগালির উন্নতি দেখিয়া আনন্দিত এবং যাহারা বাংগলাভাষার উজ্জ্বল মুখশ্রী দেখিয়া আনন্দাপ্লুত হন, তাঁহারা সকলে এক প্রাণে এক মনে বাংগলাভাষা আমাদের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় মাতৃভাষার প্রতি কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করুন, দেখিবেন অচিরে বাংগলাভাষা একটি উন্নত ভাষা মধ্যে পরিগণিত হইয়া তাঁহাদের গৌরব বৃদ্ধি করিবে। বাংগলাভাষার পাঠক সংখ্যা কম সুতরাং বাংগলার সমাদরও কম তাহা স্বীকার করি, কিন্তু সে যত্ন সে পাঠক সংখ্যার আধিক্য আপনি হইবে। যাঁহাদের গৌরব করা উচিত তাঁহারা যদ্যপি গৌরব করেন তাহা হইলে কেনই না বংগভাষা গৌরবান্বিতা হইবে। সে গৌরবের উপায় সহৃদয় বাংগালির হস্তে অর্পিত, তাঁহাদের যত্ন ব্যতীত তাহা কখনই সিদ্ধ হইবে না। অতএব হে বংগবাসিগণ তোমরা আপনাদের স্বজাতি গৌরব ত্যাগ করিও না। মাতৃভাষার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিও না। এখন যে ভাষাকে অস্থিময় শোভাহীন দেখিতেছ, তোমাদের যত্ন থাকিলে অচিরে তাহা অপূর্ব্ব মনোহর শ্রীধারণ করিয়া তোমাদিগকে সমধিক আনন্দ প্রদান করিবে।

সুখে-দুঃখ।

১

পশ্চিমে দিনেশ গিয়াছে মিশিয়া,
স্তিমিত আলোকে ফেলিয়া সংসার,
বহিছে সমীর স্বনিয়া স্বনিয়া,
দক্ষিণ হইতে বেগে অনিবার।

দূরে ভাগিরথী হইছে চঞ্চল,
শীতলিতে তার তাপিত অন্তর,
পবন পরশে হইয়া শীতল,
আশিষিছে তারে উত্তোলিয়া কর।

৩

ফুটিছে কুসুম কানন ভিতর,
জুটিছে তাহাতে মধুপ নিকর,
ছুটিছে সুগন্ধ প্রবাহ সুন্দর,
ঘ্রাণে বিমোহিত জীবের অন্তর।

৪

কোলাহলময় জগৎ সংসার,
হইছে নীরব, শান্তির সাগরে,
জুড়াইছে নর ক্লান্ত দেহ ভার,
সারাদিন খাটি উদরের তরে।

৫

গাইছে আনন্দে মধুর সংগীত,
গগণ ভেদিয়া সেই কণ্ঠস্বর,
ছুটিছে, হইছে পুলকে পুরিত,
সন্তাপ তাপিত মানব অন্তর।

৬

উপরে আকাশ অনন্ত বিস্তৃত,
ধরেছে সুচারু মোহন বেশ,
মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র নক্ষত্র খচিত,
গণনায় হয় নাহিক শেষ।

৭

পূর্ণিমার চাঁদ শোভিতেছে তায়,
হাসিছে জগৎ আনন্দ সাগরে,
মেঘগত দেখি কভু পুনরায়,
পরিম্লান মুখে কাঁদিছে অঝরে।

৮

এহেন সময়ে নীরবে বসিয়া,
কি ভাবিছি আমি? কিসের কারণ,
চিন্তার আবেগ? কিবা সে অমিয়া
সুখ শান্তিময় পার্থিব রতন।

৯

যার তরে মন এত উচাটন,
নাহি কি কিছুই? তবে কি কারণ,
হৃদয়-আকাশ তামসী এমন?
একটী নক্ষত্র জ্বলেনা অমন।

১০

ওইত চন্দ্রিমা জগৎ ভূষণ,
ওইত হীরক কুসুম রতন,
ওইত পুষ্পিত সুরমা কানন,
ওইত পবিত্র জাহ্নবী-জীবন।

১১

ওইত গায়িছে সুমধুর গান,
ওইত ছাড়িছে সুমধুর তান
এইত বহিছে বায়ু অবিরাম,
কইত কিছুই তুষিলনা প্রাণ!

১২

তবে বা এমন কি আছে রতন,
জগতের সার হৃদয়রঞ্জন?
সেই আছে যার বিচ্ছেদ কারণ,
অবিরত অশ্রু করি বরিষণ।

বিজয় সিংহ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কমলা ও বিজয়সিংহ।

গ্রীষ্মকাল—পূর্ণিমা-রজনী—পূর্ণচন্দ্রের কৌমুদী আলোকে সমস্ত সংসা হাস্যময়। নীলতম তমালদ্রুমপুঞ্জ যেমন খদ্যোতিকা-আলোকে পরি শোভিত হয়, সুনীল সুগোল আকাশমণ্ডল তারকারাজিতে তদ্রূপ পরি লক্ষিত, কেবল চন্দ্রালোকে ঈষৎ পরিদৃশ্যমান, মধ্যে মধ্যে ডুবু ডুবু হচ্চে ক্ষুদ্রদেহ চকোরগণ সুধাপানলালসায় সুদূর চন্দ্রমণ্ডল পর্য্যন্ত উড্ডী হইয়া যেন সুন্দরী যুবতী-ললাটে কৃষ্ণবর্ণ অলকা তিলকার ন্যায় দেখ যাইতেছে। নীরব নৈশাকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া স্বর্গীয় অপ্সরাগণে মৃদু মৃদু মঞ্জরী-নিক্কণ শ্রুতিগোচর হইতেছে।

পৃথ্বীতলে গৃহস্থগৃহে সুবেশধারিণী পুষ্পমালাপরিশোভিতা হাস্যমুখী যুবতীগণ কেহ বা প্রিয়জনবপু বাহুলতাপাশে বেষ্টন করিয়া তাহা মুখ নিরীক্ষণ করতঃ সুখসলিলে ভাসিতেছে। কেহ বা প্রিয়জনসমাগম বিলম্ব দর্শনে উৎকণ্ঠিতা হইয়া কষ্টে কালাতিপাত করিতেছে। কখন ব আত্মভর্ৎসনা করিতেছে, কখন বা বৃক্ষের গলিত পত্রের মর্ম্মর শব্দ শ্রবণে সচকিত ভাবে দ্বারদিকে দৃষ্টি করিতেছে—কখন বা বাস সজ্জা, মনোহর

বেশধারণ, কবরীবন্ধন, প্রসূনমালা রচনা বিফল জ্ঞানে অশ্রুজলে ভাসমানা হইতেছে। কেহ বা প্রিয়জনসহ মিলিতাঙ্গ হইয়া শ্রান্তিনিবারিণী নিদ্রাদেবীর অঙ্কে সুষুপ্তা।

শ্মশানে প্রেতিনী-শঙ্খিনী-ডাকিনীগণ সহ প্রমথগণ অদ্ভুত ক্রীড়ামোদে উন্মত্ত; তাহাদের অট্টহাস্যে চতুর্দ্দিক্ প্রতিশব্দায়মান। নিবিড় কানন-মধ্যে সিংহ শার্দ্দূল ঋক্ষ প্রভৃতি বনচর গণের করাল নিনাদ, কূর্দ্দন, ভ্রমণ প্রভৃতি ভীমদৃশ্য; বিহঙ্গকুল তরুস্থিত কুলায়মধ্যে সুষুপ্ত, কেবল নিশাচর পেচক প্রভৃতি খেচরের কর্কশ রবে শূন্য ও ঝিল্লী প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূগর্ভবাসী কীটগণের ঐক্যতান রবে চতুর্দ্দিক প্রতিশব্দায়মান। নগরস্থ রাজপথ মধ্যে নগরপালগণের পদচারণ, রাজগৃহে রক্ষিগণের জাগরণ; এতদ্ব্যতীত সমস্ত জগৎ নীরব। এমত সময়ে বিজয়সিংহ মরিলার দুর্গের একটী শয়নকক্ষের পর্য্যঙ্কেউপবেশন করিয়া দূরে নদীজলে চন্দ্রকিরণের ক্রীড়া দেখিতে ছিলেন। এখনও নিদ্রার আবির্ভাব নাই। দেখিলেন স্রোতস্বিনী মৃদুসমীর-বিলোড়িত নদীবক্ষের ক্ষুদ্রতরঙ্গরাজি-রজতমণ্ডিত। মধ্যে মধ্যে এক একখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণী যাইতেছে, তাহার বহিত্রের পতন আরও মনোহর, বহিত্র উঠিতেছে তাহাতে সুধাংশুকিরণ ঝলসিতেছে, আবার পতিত হইতেছে, তাহাতে সলিল বিদারিত হইতেছে, চন্দ্র কাঁপিতেছে, জ্যোৎস্না নাচিয়া উঠিতেছে।

মহারাজ বিজয় সিংহকে যে গৃহে শয়ন করিতে দেওয়া হইয়াছিল, তাহার বামপার্শ্বে আর গৃহ ছিল না। সেটী দক্ষিণ দিক, সেদিক খোলা ছিল। সেই দিক দিয়া মৃদুমন্দ বায়ু আসিতেছিল, বিজয়সিংহ সেই দিকের বাতায়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, একটী রমণী পাদচারণা করিতেছেন। অনেকক্ষণ দেখিলেন, তথাপি চক্ষের ভ্রম ঘুচিল না। চক্ষু মর্দ্দিত করিলেন, আবার দেখিলেন,—পরে উঠিলেন। তাঁহাকে উঠিতে দেখিয়া রমণী ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবিষ্টা হইলেন।

বিজয়সিংহ কহিলেন "দেবী কমলা! তুমি এখনও নিদ্রা যাও নাই?"

কমলা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল "পূর্ব্বে জানিতাম

নিদ্রা দীন দুঃখী সকলকেই সমান আদর করে, কিন্তু এখন দেখিতেছি তাহা ভ্রম মাত্র।”

বিজয়সিংহ সোৎসুক ভাবে কহিলেন “কেন কমলা, তোমার কোমল হৃদয়ে এ ভাবের উদয় কেন?”

“কাহার কোমল হৃদয় মহারাজ?”

“তোমার।”

কমলা বক্ষে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল “ইহা পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন।”

বিজয়সিংহ ইতিপূর্ব্বে কমলার বিবাহ সম্বন্ধীয় সমস্ত কথাই শুনিয়া ছিলেন, কিন্তু আজি তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল যে কমলা এ বিবাহ করিতে চায় না। তাহা উত্তমরূপে জানিবার ইচ্ছা বলবতী হইল,—সহসা জিজ্ঞাসাও করিতে পারেন না। ক্ষণেক পরে কহিলেন “তুমি কি ভাবী বিবাহ উল্লেখ করিয়া এত কথা কহিলে?”

“বিবাহ! বিবাহ না চিতাশয্যা।”

“অমন কথা বলিতেছ কেন?”

“আর কি বলিব?”

“তোমার যদ্যপি বিবাহে মত না থাকে তাহা হইলে মহারাজকে বলনা কেন?”

কমলা অঙ্গুলি দ্বারা ললাট দেখাইলেন।

বিজয়সিংহ কহিলেন “তবে কি বিবাহ হইলে তাঁহাকে বলিবে?”

“আমি বলিব না।”

“তোমার দাদাকে বলনা কেন?”

“দাদা কি করিবেন?”

“তাঁহার ও কি মত আছে?”

“তিনি বলেন এ বিবাহ হইলে প্রাণত্যাগ করিবেন।”

“তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন, তুমি দুঃখিনী হইবে, তবে বিবাহ কাহার ইষ্টের জন্য?”

“যমের।”

বিজয়সিংহ একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিস্তব্ধ হইলেন, কুমারী কমলা গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন। বিজয়সিংহ মস্তক অবনত করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, দুই এক বিন্দু জলও পড়িল। তিনি তাহা শীঘ্র অপস্থত করিয়া আবার কি ভাবিতে লাগিলেন। এমত সময়ে কমলা গৃহমধ্যে প্রবিষ্টা হইলেন, এবার তাঁহার মুখ আরও উজ্জ্বল। কেশদাম পৃষ্ঠদেশে দুলিতেছে, অধরপ্রান্তে দুই এক গুচ্ছ আসিয়া পড়িয়াছে। কমলা মনোহর পুষ্প আভরণ পরিধান করিয়াছেন, মনোহর যূঁই ও বেলের মালা গলদেশে শোভা পাইতেছে। কমলা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র গৃহ যেন সৌরভে আপ্লুত হইল। বিজয় সিংহ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এই গেলে আবার আসিলে যে?"

"আর কদিনই বা বাঁচিব, এই কয় দিনের মধ্যে আমার সকল সাধ পুরাইব-না?"

"সে কি কমলে?"

"মহারাজকে কি দাসী প্রবঞ্চনা করিতেছে?"

"কমলা তোমার বড় মনোহর দেখাইতেছে।"

"আমার সৌভাগ্য—কিন্তু মহারাজ আমি এইমাত্র আপনার নিকট হইতে যাইতেছি, কই ইতিপূর্ব্বে ত আমায় এত মনোহর দেখেন নাই?"

"এই কুসুমবেশে তোমায় বড় সুন্দরী দেখাইতেছে।"

"তবে সে পুষ্পের বা মালার গুণে।"

"তোমার পরিবার গুণেও বটে।"

"আমি আপনার গলায় একটী মালা পরাইয়া দি।" এই বলিয়া কমলা বিজয় সিংহকে একছড়া মালা পরাইয়া দিলেন।

বিজয়সিংহ বলিলেন "মালা দিলে কিন্তু কেমন দেখাইতেছে?"

"বড় সুন্দর, আর একটী বেলের গড়ে দি।" এই বলিয়া আর একটী মালা দিলেন, বিজয়সিংহ পুনরপি মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আবার কেমন দেখাইতেছে?"

"আরও সুন্দর।" কমলা যেন চমকিয়া উঠিল, কহিল "মহারাজ বিজয়সিংহ, আমি কি করিলাম, আপনার গলায় যে মালা দিলাম!"

বিজয়সিংহ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "মালাগুলি দিতে ইচ্ছা হয় না তবে এই লও।" এই বলিয়া একছড়া মালা কমলার গলায় নিক্ষেপ করিলেন। কমলা তাহা চুম্বন করতঃ বক্ষ ও শিরে ধারণ করিয়া কহিলেন "মহারাজ, আমি ইহা অপেক্ষা আর অধিক প্রার্থনা করি না, আজি যে মালা হৃদয়ে ধারণ করিলাম ইহা অপেক্ষা অমূল্য বিভব কমলা স্বপ্নেও জানে না।"

বিজয়সিংহ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন "কিন্তু যাহার পরিণাম সুখময় ভাবিতাম, অদৃষ্ট গুণে বুঝি তাহা দুঃখে পরিণত হয়।"

কমলা। কি বলেন মহারাজ! এ জীবন থাকিতে? রাজপুতশোণিত যতকাল ধমনীতে বহিবে ততকাল কাহার সাধ্য যে আমাকে স্পর্শ করে। আমরা প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করি, মানের নিমিত্ত অম্লানবদনে প্রাণকে বিসর্জ্জন দিতে পারি।

বিজয়। যদ্যপি মহারাজ প্রতাপ সিংহ জাহাঙ্গির তনয়ের সহিত তোমার বিবাহ দেন তাহা হইলে কি করিবে?

"এই শাণিত অস্ত্রে হৃদয় পরিতৃপ্ত করিব", এই বলিয়া কমলা একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা প্রদর্শন করিলেন।

মহারাজ বিজয়সিংহ একটী উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন "সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।"

এমত সময়ে সহসা তথায় সরমা আসিয়া উপস্থিত হইল। স্তম্ভিতের ন্যায় ইতস্তত দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া কহিল "রাজকুমারি, আমি তোমাকে এমত স্থান নাই যেথানে অনুসন্ধান করি নাই। শয্যা হইতে কখন উঠিয়া আসিলে?"

কমলা অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন "অনেকক্ষণ।"

সরমা এই কথায় যেন কিঞ্চিৎ বিরক্তি ও রাগভরে কহিল "এখনও থাকিবে, না যাইবে?"

কমলা গম্ভীর ভাবে বলিল "যাইতেছি—চল।"

উভয়ে অল্পদূর যাইলে সরমা কহিল "এ কিরূপ ব্যবহার?"

"কোন ব্যবহার?"

"কুমারীর পক্ষে রজনীতে অজ্ঞাতসারে অপরপুরুষের নিকট যাওয়া ও মাল্য বিনিময় করা?"

কমলা যেন চমকিয়া উঠিল, নয়ন জ্বলিয়া উঠিল, বলা বাহুল্য যে তাহা আসারে পূর্ণ হইল, কমলা বলিল "সরমে! তুমি কমলার হৃদয়ের অনেক গুহ্য বৃত্তান্তও জান, কিন্তু সকল বিষয় জান না। অদ্য কতক জানিয়াছ,—তাই বলিতেছি শুন। সখি! মাল্যবিনিময় ত তুচ্ছ কথা, অনেকদিন হৃদয় বিনিময় করিয়াছি। না সখি, তাহা নহে, আমার হৃদয় বিক্রয় করিয়াছি।" কমলা চক্ষু মুছিয়া আবার বলিতে লাগিল "এ জগতে বিজয় ব্যতীত অপর কেহ এ হৃদয় মধ্যে স্থান পাইবে না। তিনি আমায় গ্রহণ করুন বা না করুন, আমায় দেখিয়া রাগ বা ঘৃণা করুন, কুমারী কমলা অতি আদরের সহিত, অতি ভক্তির সহিত তাঁহার চরণযুগল হৃদয় মধ্যে প্রতিষ্ঠা করিয়া অনন্তকাল ধ্যান করিবে। কমলা বালিকা নহে, নির্ব্বোধ নহে, সে নিভৃতে পরপুরুষের সহিত কথা কহে না, কিন্তু যাহার সহিত তুমি তাহাকে কথা কহিতে দেখিয়াছ, তিনি তাহার হৃদয়ের উপাস্য দেবতা; তিনি কমলার সংসারের সহায়, ধর্ম্মের সহায়, জ্ঞানের সহায়, বুদ্ধির সহায়, পরলোকের সহায়; তিনি তাহার জীবন, তাহার জীবনের সর্ব্বস্ব! শুনিলে সরমে? আর কি শুনিবে? না সরমে! আবার বলি এ হৃদয়মধ্যে পিশাচের স্থান নাই, পিতাকে নিশ্চিন্ত থাকিতে কহিও, কহিও রাজপুত সতীরা প্রাণকে ভয় করে না। সখি! অদ্য তুমি জানিলে, এ ত তুচ্ছ কথা, এ কথা কল্য পিতৃসমক্ষে বলিতে কমলা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিতা হইবে না। বিজয়ের জন্য লোকাপবাদ, সমাজাপবাদ, বা গুরুগঞ্জনা কুমারী কমলা তুচ্ছ জ্ঞান করে।"

সরমার চক্ষে আনন্দাশ্রু দেখা দিল, গদ গদ স্বরে কহিল "ঈশ্বর তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।"

কমলার চক্ষে জল আসিল,—কহিলেন "সখি! তুমি কমলাকে যে কোন কথা বল, সে অম্লানবদনে সহ্য করিবে, কিন্তু তাহাকে অবিশ্বাসিনী ভাবিও না, কমলা অবিশ্বাসিনী এ কথা সে প্রাণ থাকিতে সহ্য করিতে পারিবে না।"

সরমা এ কথার আর কোন উত্তর দিল না, উভয়ে মৃদু পাদচারণে ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যাত্রা।

দেখিতে দেখিতে তিনমাস অতীত হইল, এখনও আমাদিগের সেই পূর্ব্বপরিচিতা রমণী বিজয়সিংহের গৃহে বাস করিতেছেন। অদ্য প্রাতঃকাল, প্রভাতী বায়ু রাজার প্রাসাদ হইতে দরিদ্রের পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত সমভাবে প্রবাহিত, সরসীসলিলে সহাস্য-আননা কমলিনী নাচিতেছিল, মলিনবদন শশধর দীনদ্যুতি হইয়া কুমুদিনীকে কাঁদাইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিতেছিল। বিজয়সিংহের ভবনের একটি প্রকোষ্ঠে একটি অসামান্য রূপবতী কামিনী বেশ বিন্যাসে নিরত ছিলেন। সেই প্রাতঃসমীরণ যুবতীর অলকাগুচ্ছ, কখনবা বসনপ্রান্ত কখন বা কাঞ্চী দুলাইয়া ক্রীড়া করিতেছিল। এই সময়ে তাহার পার্শ্ববর্ত্তিগৃহে একটি যুবা পুরুষ প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার আগমনে দাসীগণ করযোড়ে দণ্ডায়মান হইল। তিনি জনৈক দাসীকে কহিলেন "যাত্রোপযোগী বাহক রক্ষী দাস দাসী ইত্যাদি সমস্তই প্রস্তুত, রমণীকে জিজ্ঞাসা কর যে তাঁহার শুভযাত্রার পূর্ব্বে আমি কি একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি ?"

দাসী প্রণত হইয়া প্রস্থান করিল। অনতিবিলম্বেই সেই রূপবতী সযৌবনা রমণী সহাস্য আননে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কহিল "আমি অসহায়া দুঃখিনী কামিনী মাত্র, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ওরূপ বিনীত প্রার্থনা সর্ব্বতোভাবে পরিহাস মাত্র।"

মহারাজ বিজয়সিংহ কহিলেন "আমি অতি সামান্য লোক, অতিথির যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করা আমার সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ আপনাকে আমার বিশেষ আত্মীয়বৎ জ্ঞান করি।"

রমণী। তাহা কেবল আপনার মহত্বের পরিচায়ক।

বিজয়। কিছু না।

রমণী। আপনার গৃহে এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত কত কি উপদ্রব করিলাম, কিন্তু আপনি নিজগুণে সে সমস্তই ক্ষমা করিয়াছেন। অদ্য চলিলাম আবার কখন যে এ অধিনী আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিবে, সে আশা দুরাশা মাত্র, কিন্তু মহারাজ যদ্যপি কখন দিল্লিতে শুভাগমন করেন তাহা হইলে অধিনীকে কি স্মরণ রাখিবেন?

বিজয়। সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

রমণী। মহারাজ নাকি প্রায়ই নানা কর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন, সুতরাং সে সমস্ত গুরুতর কার্য্য স্বত্বেও যে এ ক্ষুদ্র বালিকার নাম আপনার হৃদয়ে থাকিবে তাহা এক প্রকার অসম্ভব। সমুদ্রে তৃণ নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা কোথায় ভাসিয়া যায়।

বিজয়সিংহ কহিলেন "দিল্লিশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কখন কখন দিল্লিতে গিয়া থাকি, এবং যাইতেও পারি, কিন্তু কোথায় আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবে?"

রমণী ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন "মহারাজ সেই নিমিত্তই বলিতে ছিলাম যে আপনার বিশাল অন্তঃকরণে এই ক্ষুদ্র বালিকার নাম স্থান পাইবে না। কিন্তু আপনার যত্ন, স্নেহ, বিনয়, সৌজন্য আমার সমগ্র হৃদয় অধিকার করিয়াছে। কি নিদ্রায় কি জাগ্রতে আপনাকে বিস্মৃত হওয়া আমার সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং আপনাকে ক্লেশ করিতে হইবে না এ অধিনী স্বয়ংই মহারাজের শ্রীচরণে উপস্থিত হইবে।"

বিজয়। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ও সামান্য লোক মহানগরী দিল্লিতে উপনীত হইলে কে সংবাদ পাইবে?

রমণী। আমার পক্ষে মহারাজ অসামান্য ব্যক্তি।

বিজয়। সরলে! আমি আপনার কোন কথার কূটার্থ গ্রহণে অসমর্থ। আপনি আমার নিকট আত্ম পরিচয় দিলেন না। অধিক কি এ পর্য্যন্ত আপনার নাম পর্য্যন্তও জানিতে পারিলাম না। আবার বলিতেছেন দিল্লিতে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন; যাহাই হউক এ পর্য্যন্ত দয়া করিয়া আমায় যেরূপ

সহোদরার স্নেহ ও যত্ন প্রদর্শন করিতেছেন সেই দয়ার বশবর্ত্তিনী হইয়া অদ্য যদ্যপি প্রকৃত পরিচয় দেন তাহা হইলে সমধিক বাধিত হই। আপনার সহিত যত কথোপকথন করি, ততই নূতন কৌতূহল হৃদয়ে উদ্দীপ্ত হয়।

রমণী করপুটে কহিলেন "মহারাজ এবারে যে আপনাকে আমার পরিচয় দিলাম না তন্নিমিত্ত আমি নিজেই দুঃখিত রহিলাম। আমি পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছি যে এ অবস্থায় আত্ম পরিচয় দিতে অনুরোধ করিলে আমি তাহাও দিতে বাধ্য, কিন্তু মহারাজ দয়া করিয়া আমাকে ক্ষমা করুন।"

বিজয়সিংহ ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে কহিলেন "আপনি এতদিন এখানে থাকায়, আপনার উপর কেমন এক ভালবাসা জন্মিয়াছে, আজি আপনাকে বিদায় দিতে বড়ই ক্লেশবোধ হইতেছে।"

রমণী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে কহিলেন "অধিনীর উপর যে মহারাজের ভালবাসা জন্মিয়াছে, এ কথা অপেক্ষা মূল্যবান কথা আমি আর জানি না" প্রকাশ্যে "মহারাজ যে আমার বিদায়ে দুঃখ প্রকাশ করিলেন, তাহা অপেক্ষা শ্লাঘার বিষয় আর আমার কি আছে?" এই কথা কহিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

বিজয়। আপনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন যে?

রমণী। আপনি কি আমাকে পাষাণী বিবেচনা করেন? আমার কি হৃদয় নাই।

বিজয়সিংহ দেখিলেন যে রমণীর চক্ষু ছল ছল করিতেছে, তিনি আর সে কথা কহিলেন না। নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, ক্ষণেক পরে রমণী পুনরপি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন "মহারাজ তবে অদ্য অধিনী আপনার চরণে বিদায় প্রার্থনা করিতেছে, আপনি আসিয়াছেন উত্তম হইয়াছে নতুবা আমি স্বয়ং যাইতাম। আমার ব্যবহারের জন্য অনেকগুলি রত্নালঙ্কার দিয়াছেন, সেগুলি প্রতি গ্রহণ করুন। আর—"

এই কথা বলিতে বলিতে বিজয়সিংহ স্তম্ভিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন?"

"পথে নানা ভীতি আছে। কেন সাধ করিয়া বিপদ সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব?"

"আমি অনেক রক্ষী প্রেরণ করিব।"

"মহারাজের প্রসাদে আগমন কালীন তাহার অপ্রতুলতা ছিল না।"

"ভাবে বোধ হইতেছে যে আপনি আমার বস্ত্র গ্রহণ করিবেন না।"

রমণী মনে মনে বলিল "সামান্য রত্নালঙ্কার লইয়া কি করিব। যে ধনের প্রত্যাশী যাহার আরাধনায় আপন প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছি তাহা পাইলে লই" প্রকাশ্যে কহিলেন "সে কি মহারাজ! আপনারই প্রসাদে এ পর্য্যন্ত জীবিত আছি, আপনার অন্নে প্রতিপালিতা হইয়া এখন পর্য্যন্ত জীবনধারণ করিতেছি নতুবা আমার কি হইত?" এই কথা বলিয়া রমণী বস্ত্রাঞ্চলে স্বীয় নেত্রদ্বয় মুছিলেন, নয়নযুগল আরক্তিমাভা ধারণ করিল।

মহারাজ বিজয়সিংহ বিদায়কাল এরূপে অতিবাহিত করা অযুক্তি সিদ্ধ বিবেচনা করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, রমণী রত্নালঙ্কারগুলি একস্থানে রাখিয়া তাঁহার পশ্চাৎ অনুধাবন করিল। দাসীরাও তাঁহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিল। তাঁহারা পরিশেষে যেখানে শিবিকা ছিল সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। রমণী শিবিকা আরোহণ করিয়া কহিলেন "মহারাজ অধিনীকে বিস্মৃত হইবেন না।"

মহারাজ বিজয়সিংহ দেখিলেন—রমণী কাঁদিতেছে, সেই ইন্দীবর তুল্য নয়নযুগল হইতে স্খলিত শিশির সম্পাতের ন্যায় বারিবিন্দু পতিত হইতেছে। তদ্দর্শনে বিজয় সিংহের ও হৃদয় বিকলিত হইল, তাঁহারও নয়নদ্বয় আসারে প্লাবিত হইল। স্নেহের কি অপরিসীম ক্ষমতা! অজ্ঞাত রমণীকে বিদায় দিতে বিজয়সিংহকেও অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে হইল। পরে রমণী দাসীগণকে বিদায় দিয়া বিজয় সিংহের নিকট পুনর্ব্বার বিদায় প্রার্থনা করিলেন। তদনন্তর বাহকেরা শিবিকা উত্তোলিত করিল। অন্তঃপুর হইতে শিবিকা বহির্গত হইল। রক্ষীবর্গও দাস দাসী সমাকীর্ণ শিবিকা নিমেষ মধ্যে অদৃশ্য হইল। বিজয় সিংহও ম্লানবদনে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

সাদৃশ্য পর্য্যালোচনা।

জগৎসিংহ রোমিও ফার্দ্দিনন্দ ও ওথেলো।

জগৎসিংহ শৈলেশ্বরের মন্দিরমধ্যে অবগুণ্ঠণাবৃত তিলোত্তমাকে দেখিবা মাত্রই তাঁহাকে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন বা ভালবাসিয়া ছিলেন। বাস্তবিক জগৎসিংহের আত্ম সমর্পণের কোন মাধুর্য্য বা প্রাধান্য নাই। আদর অনাদর প্রভৃতির চঞ্চল দোলায় দোদুলামান। জগৎসিংহে আমরা অনেক প্রকার রঙ্গ দেখিতে পাই। এদিকে বিমলাকে অনুনয় বিনয়ে বশীভূত করিয়া পক্ষান্তরে শৈলেশ্বরের মন্দিরে পুনশ্চ সাক্ষাৎ করিতে কহিতেছেন। অনুরোধের একমাত্র কারণ তিলোত্তমার পরিচয় জ্ঞাত হওয়া ও সুযোগ পাইলে দেখা করা। এদিকে বিমলা গড়মান্দারণে লইয়া যাইতে চাহিলে কতকদূর যাইয়া আবার যাইতে অনিচ্ছা। চোরের মত দুর্গ স্বামীর অনভিমতে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে অসম্মতি। বাস্তবিকই জগৎ সিংহের একথা শুনিয়া তাহাকে বীর বলিয়া যত শ্রদ্ধা হউক না হউক রসিক বলিয়া হাসি পায়।

এদিকে তিলোত্তমাকে পাইবামাত্রই গৃহস্বামী হইয়া বসিলেন; যিনি পরের গৃহে প্রবেশ করিতে এত দ্বিধা করিতেছিলেন তিনি সেখানে দ্বাররুদ্ধ করিয়া আমোদ করিতে লাগিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা দেখিয়া বোধ হয় যে জগৎসিংহের হৃদয়ে তিলোত্তমার রূপ গাঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছিল, প্রথম সন্দর্শনে হৃদয়গত ভাবের বিচার করিবার সাবকাশ পাইলেন না একেবারে সমস্ত বিস্মৃত হইলেন। যখন রুগ্ন শয্যায় শায়িত হইয়া জগৎ সিংহ অচেতন অবস্থায় পতিত রহিয়াছেন তখনও তিলোত্তমার জন্য দীর্ঘ-নিশ্বাস প্রকৃত প্রণয়ের পরিচায়ক বটে। কিন্তু সে ভাব জগৎসিংহের হৃদয় হইতে সহসা অন্তর্হিত হইল। বিরাগ হৃদয়ে উপস্থিত হইল। তিলো-ত্তমার নাম হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতে লাগিল; বাস্তবিকই—জগৎসিং-হের সে মূর্ত্তি দেখিয়া হৃদয়ে ভয় হয়, কিন্তু পক্ষান্তরে বিবেচনা করিয়া

দেখ দেখি যে তিলোত্তমার অপরাধ কি, অপরাধ দিগ্‌গজ পাগলের—কি বলিতে কি বলিয়াছে। জগৎসিংহও তাহাতে ধ্রুব বিশ্বাস করিলেন। জগৎসিংহের এ বিশ্বাসকে আমরা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিনা, কারণ প্রথমত কতলুখাঁ কর্ত্তৃক ছলে বলে তিলোত্তমার সতীত্ব হরণ নিতান্ত অসম্ভব নহে, দ্বিতীয়তঃ ওসমান যেরূপ ভঙ্গিমা করিয়া দিগ্‌গজের সংবাদের পর প্রস্থান করিলেন তাহাতে সে বিশ্বাসের আরও বদ্ধমূল হওয়াই সম্ভব। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে জগৎসিংহ এ সময়ে নিষ্ঠুরের ন্যায় ব্যবহার করিলেন। তাঁহার জন্য অবলা বালিকার কি দশা উপস্থিত হইল তৎপ্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন না। অসহায়া বালিকাকে যে তাঁহার ক্রোড় হইতে দুরাত্ম পাঠানেরা কাড়িয়া লইয়া গেল তন্নিমিত্ত তাহার প্রতিহিংসা হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত না হইয়া বরং তিলোত্তমা ভাগ্যদোষে বা তাহারই কারণে যবনগৃহে বন্দিনী হইয়াছে তন্নিমিত্ত তাহার প্রতি ঈর্ষা পরবশ হইলেন। হঠাৎ তিলোত্তমার দর্শনে তাহার সহিত কথা কহিলেন না। প্রকৃত অবস্থা না জানিয়াও বীরেন্দ্র সিংহের কন্যা বলিয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া তাহার হৃদয়ে অননুভূতপূর্ব্ব ক্লেশ দিলেন। ইহা কি প্রেমিকের কার্য্য—ইহা কি প্রেমিকের ধর্ম্ম—ভালবাসার পরিণাম! জগৎসিংহ ক্রোড়ে করিয়া সেই মলিন মুখমণ্ডল মুছাইয়া দিতে পারিলেন না। তাহার দুর্দ্দশা শ্রবণ করিয়া অশ্রুনীর ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তাহার হৃদয়গত ভাব দেখিলেন না। আত্মদোষ স্বীকার করিয়া মার্জ্জনা প্রার্থনা করিতে পারিলেন না। ছি! ছি! তিলোত্তমা বড় মন্দভাগিনী, যে পাষাণের গলদেশে বরমালা প্রদান করিয়াছে।

যাহাই হউক জগৎসিংহের প্রকৃতি সর্ব্বোৎকৃষ্ট না হইলেও নিন্দনীয় নহে। যে প্রেম মনুষ্য-হৃদয়ে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় সেই প্রেম মাত্র জগৎসিংহের হৃদয় আবরিত করিয়াছিল কিন্তু অচিন্তনীয় প্রেম, যাহার প্রভাব হৃদয়ে মাদকতা জন্মাইয়া আত্মপর বিবেচনা লোপ করিয়া দেয় সে প্রেম জগৎসিংহের নাই। যে প্রেম দেখিলে হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়, প্রেমিককে প্রাণ খুলিয়া ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না সে প্রেম জগৎসিংহ শিখেন নাই।

রোমিওর প্রেমের সহিত জগৎসিংহের প্রেমের তুলনা করিয়া দেখ বুঝিতে পারিবে যে উভয় প্রেমে অনেক প্রভেদ। রোমিও পাগল, জুলিয়েট যাহা বলিতেছে তাহাতেই স্বীকৃত হইতেছে, হৃদয়ে আধা বাধা নাই, আপনার হৃদয়ের ন্যায় নায়িকার হৃদয় ভাবিতেছেন প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া প্রাণ প্রতিমাকে সন্দর্শন করিয়া হৃদয় পরিতৃপ্ত করিতেছেন। কিছুতেই বিকার নাই। রোমিও জুলিয়েটের নিমিত্ত কি মানসিক যাতনা বা কায়িক ক্লেশ না সহ্য করিয়া ছিলেন কিন্তু মন প্রেম সেইরূপ অচল ছিল—জুলিয়েট অপেক্ষা পবিত্র প্রেমের নিদর্শন প্রদান করিয়াছেন কিন্তু জগৎসিংহে সহিত তাহার তুলনা করা যাইতে পারে না। জগৎসিংহেও প্রেমের পদে পদে স্বার্থ পরায়ণতা প্রকাশ পায়, কিন্তু রোমিওতে তাহার বিন্দু বিসর্গও নাই।

আবার ফার্দ্দিনন্দর সহিত তুলনা করিয়া দেখ যে জগৎ সিংহের সহিত তাহার কোন অংশে তুল্য নাই। ফার্দ্দিনন্দর প্রেম নিষ্কাম নিস্পৃহ ও স্বার্থ শূন্য। মিরান্দার প্রথম সন্দর্শনেই বলিল

"————Full many a lady
I have ey'd, with best regard: And many a time
The harmony of their tongues hath into bondage.
Brought my too diligent ear: for several virtues
Have I liked several women; never any
With so full soul, but some defect in her
Did quarrel with the noblest grace she ow'd
And put it to the foil; but you, O you,
So perfect and peerless, are created
Of every creatures best."

এবং তৎসঙ্গে আত্ম সমর্পণ করিল।

সরলতা ও পবিত্রতার প্রতিমা স্বরূপ মিরন্দা বলিল My husband then? জিজ্ঞাসা করিবা মাত্র—

ফার্দ্দিনন্দ বলিল

Ay, with a heart as willing

As bondage e'er freedom : here's my hand."

যাহার হৃদয়ে বিকার নাই কপটতা নাই সে কেন না জগৎ সংসার সেইরূপ দেখিবে। তাহার হৃদয় বলিতেছে যে মিরন্দা কেননা তোমার কথা বিশ্বাস করিবে? প্রকৃত প্রেমে এইরূপ হইয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ কিরূপ তাহা দেখা দেয় না। কিন্তু জগৎ সিংহের হৃদয় কি ঐরূপ? কখনই নহে, তাহা সন্দিগ্ধ অতএব সহসা কাহার উপর বিশ্বাস নাই, সকল সময় উচিতানুচিত বিবেচনা করিবার ক্ষমতা নাই।

আবার রাক্ষসাবতার ওথেলার সহিত তাহার তুলনা করিয়া দেখ দেখিবে উভয় হৃদয়ে অনেক সাদৃশ্য। ওথেলো প্রথমে প্রণয় করিতে জগৎ-সিংহ অপেক্ষা ন্যুন নহে দিব্য ভালবাসার পরিচয় প্রদান করিতেও অক্ষম নয়, কিন্তু হৃদয় বড়ই সন্দিগ্ধ, কথায় কথায় উচিতানুচিত বিবেচনা শক্তি অন্তর্হিত হয়। স্বর্ণ প্রতিমা দেস্‌দিমোনার কথায় বিশ্বাস নাই। অকৃতাপরাধা যুবতীকে অম্লান বদনে হত্যা করিল, পরে যখন চৈতন্য ভাঙ্গিল তখন পরিতাপ, ক্রন্দন, প্রাণত্যাগ। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে বিবেচনা করিবার ক্ষমতা হইল না, অন্ধের ন্যায় অজ্ঞানের ন্যায় বা বালকের ন্যায় কার্য্য করিয়া পৃথিবীর সমস্ত সুখের সার পতিব্রতা কামিনীর প্রণয় লাভ সুখ হইতে বঞ্চিত হইল। দেখিতে গেলে জগৎসিংহের চরিত্রও সেইরূপ। যদ্যপি কতলুখাঁ মৃত্যুকালে তিলোত্তমার পবিত্রতা ও সতীত্বের কথা বলিয়া যাইতে না পারিতেন তাহা হইলে জগৎসিংহ তিলোত্তমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেন বলিতে পারা যায় না।

এ সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে গেলে, জগৎসিংহের প্রতি আর ভক্তি থাকে না। প্রকৃতই বঙ্কিম বাবু পুরুষ চরিত্র উত্তম রূপে চিত্রিত করিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহার পুস্তকে স্ত্রী চরিত্রের যে রূপ উৎকর্ষ সাধিত করিয়াছেন সে রূপ পুরুষ চরিত্রে কৃতকার্য্য হন নাই। শুদ্ধ দুর্গেশনন্দিনী বলিয়া নয় তাঁহার অনেক পুস্তকে ঐরূপ, তথাপি বঙ্কিম বাবুর তুল্য সুলেখক রচনা চতুর উপন্যাস লেখক এ পর্য্যন্ত বঙ্গে জন্ম

গ্রহণ করেন নাই। যাঁহার লেখনীর প্রসাদে আমরা প্রায়ই হৃদি বিমোহনকারী অভিনব পুস্তক পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হই ও বঙ্গভাষাকে সৌভাগ্যশালিনী জ্ঞান করি ঈশ্বরেচ্ছায় সেই লেখক দীর্ঘজিবী হইয়া বঙ্গভাষার অশেষবিধ মঙ্গল সাধন করিয়া স্বদেশের বিবিধ মঙ্গল করিতে থাকুন ইহাই আমাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা।

পাক রাজেশ্বর সম্বন্ধে দুই একটী কথা।

বৎসরাধিক হইল পাকরাজেশ্বর নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, দুঃখের বিষয় বাঙ্গলা সম্বাদপত্রে ইহা সমালোচিত হয় নাই। কলেবরে ইহা সামান্য পুস্তক হইলেও ইহার ফল অসামান্য। বাঙ্গলার আধুনিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে ইহার নিতান্ত আবশ্যকতা কিঞ্চিৎ পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। আজি বাঙ্গালার উন্নত অবস্থা। বাঙ্গালি যুবকগণ আজি সুশিক্ষিত, বাঙ্গলার সাহিত্য, বাঙ্গালির সৌখিন জীবন আজি উন্নতির পথে ধাবমান, আরও গৌরবের, সুখের, আদরের বিষয়—বঙ্গাঙ্গনাগণ রন্ধনশালা প্রভৃতি সভ্যতার প্রতিবন্ধক স্বরূপ কুরীতির পথে জলাঞ্জলি দিয়া সাহিত্য রসানুভবে বদ্ধ পরিকরা; শুদ্ধতাই কেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি সাধনে কৃত-সংকল্পা। তাহারা অনেকে বুঝিয়াছে, বাঙ্গলার উন্নতি অর্দ্ধেক পরিমাণে তাহাদিগের উপর নির্ভর করিতেছে। বাঙ্গালার কেন ভারতের, ভারতের কেন সমস্ত পৃথিবীর পুরুষ সংখ্যা যত স্ত্রী সংখ্যাও তত, অতএব যাহারা বাঙ্গলার উন্নতির জন্য লালায়িত তাহারা যদি বঙ্গের অর্দ্ধেক প্রজা সংখ্যাকে অর্থাৎ অঙ্গনাদিগকে ছাঁটিয়া রাখিয়া বঙ্গের অবস্থা উন্নত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাকেন তাহাদিগের মত মানবচরিত্রানভিজ্ঞ লোক নাই বলিলে অত্যুক্তি দোষে দুষিত হইতে হয় না। স্ত্রী ও পুরুষের অধিকার সমান, উভয়েই ঈশ্বরের সৃষ্ট হইয়া কেন স্ত্রীগণ চিরদিন ঘোর

অন্ধকার পরাধীনতায় জীবন কাটাইবে? পুরুষ বাবু স্ত্রী তাহার দাসী হইবে কেন? শিক্ষিতা বঙ্গাঙ্গনাগণ উপরি উক্ত মহামূল্য নীতিগুলির সার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে। এবং পারিয়াছে বলিয়া অনেকে ইহা বঙ্গের উন্নতির লক্ষণ বলিয়া চিনিতে সমর্থ হইয়াছেন। যাহা হউক বাঙ্গালার এহেন অবস্থায় রন্ধন প্রভৃতি গৃহকর্ম্ম বঙ্গাঙ্গনা কর্ত্তৃক সমাধান করা অসভ্যতা সূচক ইহাই অনেকের প্রতীতি। পাক রাজেশ্বরের মত পুস্তক নিতান্ত আবশ্যক কি না এই বার পাঠক মহাশয়েরা বুঝিতে পারিবেন, আমি ভবিষ্যৎ গর্ভে কেন, আধুনিক অনেক বাঙ্গালি গৃহে দেখিতে ও শুনিতে পাইতেছি, শিক্ষিতা বঙ্গাঙ্গনার রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলে মাথা ধরে, বাসন মাজিলে তাহাদিগের কোমলাঙ্গে ব্যথা জন্মে। দুর্গেশনন্দিনী মেঘনাদবধ প্রভৃতি পুস্তকের সৌন্দর্য্য যাহারা অনুভব করিতে পারিয়াছে, তাহাদিগকে কোন প্রাণে তাহাদিগের গুণবান স্বামীগণ মস্তিষ্ক ঘূর্ণনকারী কোমলাঙ্গ ব্যথাদায়ক রন্ধন প্রভৃতি অমানুষিক কার্য্যে ব্যাপৃতা দেখিতে পারেন? প্রায় সকল গৃহেই রন্ধনী ব্রাহ্মণী আছেন অবস্থানুরূপ হউক আর নাই হউক সকল স্বামীকেই এ খরচ যোগাইতে হইতেই হইবে। যদি বাটীতে বৃদ্ধা সাহিত্যরসানভিজ্ঞা মাতা বা বিধবা পিসী বাঁচিয়া থাকেন তাহা হইলে রন্ধন প্রভৃতি কার্য্য তাঁহাদিগের দ্বারাই সমাধা হইয়া থাকে, বাবুরও তাহাতে কিছু অর্থের শাশ্রয় হয়। মনে করুন আর ইহা মনে করা নিতান্ত অসম্ভব নয় হঠাৎ একদিন রন্ধনী কিম্বা বৃদ্ধা শ্বাশুড়ীরপীড়া হইয়াছে? কি করেন ভাবিয়া আকুল প্রথম দিন বাজার হইতে লুচি চিঁড়ে প্রভৃতি আনয়ন করিয়া কাটিয়া গেল, সেদিন অন্ন জুটিল না, চাউল্ আছে তাহার অপ্রতুল নাই, কিন্তু রন্ধন করে কে? নবীনা গৃহিনী রাঁধিতে জানে না, কাজে কাজেই অন্না-ভাবে প্রথমদিন কাটিয়া গেল, বাবু লুচ্যাদির শ্রাদ্ধ করিয়া আফিসে গেলেন, তথায় গিয়া শুনিলেন "পাকরাজেশ্বর" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, আফিস হইতে প্রত্যাগমন করিবার সময় একখানি পাকরাজেশ্বর ক্রয় করিয়া আনিলেন। সতী স্বাধ্বী রাত্রিতে সেখানি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলেন; প্রত্যুষে গাত্রোত্থান

করিয়া দাসীকে উনুনে আগুন দিতে বলিয়া আপনি প্রাতকৃত্যাদি সমাপন করিলেন, পরে একটি মেজার গ্ল্যাস (Measure glass) ও দাঁড়ী পাল্লা, সের পোয়া প্রভৃতি বাটখারা আনাইলেন। দাসী মাসকলাই দালি বাহির করিল, নবীনা গৃহিনী টুয়ালে হস্তে হাঁড়িতে জল ঢালিয়া দিলেন, জল টগ বগ করিয়া আপনার মনে ফুটিতে লাগিল পাকরাজেশ্বরের ১৯ পৃষ্ঠা সম্মুখে অনাবৃত রহিয়াছে গৃহিনী অথবা বাব্বী এক একটি কথা পড়িতেছেন ও দাঁড়ী পাল্লা লইয়া সমস্ত দ্রব্যগুলি ওজন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে রাখিয়া দিতেছেন। পুস্তকের উপদেশ মত "দালি ও অদ্ধ কুটিত লবঙ্গ ও দারচিনি একত্রে ঘৃতে" ভাজিলেন তাহার পরে জলসহ তাপে অর্দ্ধ সিদ্ধ হইলে আদার রস ও লবণ মরিচ বাটা দিয়া সুপাক" করিলেন। তাহার পরে পাঠ করিলেন "পরে গন্ধদ্রব্য ও কুঙ্কুম বাটা সযুত লবঙ্গ সন্তলন করিবে" ভাবিলেন কি গন্ধদ্রব্য দিবেন সুরভি আতর (otto de Rose) দিলে বোধহয় দালি আরো অধিক সুমিষ্ট ও সুরভি হইতে পারে, এই ভাবিয়া দালে ফোটাকতক আতর ঢালিয়া দিলেন। এইরূপে দাল প্রস্তুত হইল। ভাত ও ক্রমে প্রস্তুত হইল। এদিকে আফিসের বেলা হইতে লাগিল বাবু আর থাকিতে পারিলেন না, গৃহিনী আসিয়া বলিলেন—ভাত দাল প্রস্তুত মৎস্য রন্ধনের ওজর করিতে লাগিলেন—কিন্তু বাবুর কাকুতি মিনতিতে আদ্র` হইয়া দাল ভাতই দিলেন। বাবু দাল মাখিয়া ভাত এক গ্রাস খাইয়া আর খাইতে পারিলেন না। গৃহিনী জিজ্ঞাসিলেন বসিয়া রহিলে যে? খাইতেছ না কেন?

বাবু সভয়ে উত্তর করিলেন "তিক্ত"?

গৃহিনী। কি তিক্ত?

বাবু। বোধহয় দাল।

গৃহিনী। কখনই না?

বাবু। খাইয়া দেখ।

গৃহিনী (খাইতে খাইতে) তাই তো?—কিসে তিক্ত হইল? আশ্চর্য্যের বিষয়—এতো বৃদ্ধাদিগের রন্ধন নহে যে দ্রব্য পরিমাণের ন্যূনাধিক্য

হইবে। তুমি দেখিয়াছ, আমি পুস্তকের উপদেশ মত পদে পদে চলিয়াছি।

আমি নিজের বুদ্ধি কোথাও খাটাই নাই, কেবল গন্ধদ্রব্য নির্দ্দিষ্ট ছিল না বলিয়া ফোঁটা কতক ভাল আতর নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। তাহাতে কখন তিক্ত হইতে পারেনা। তবে পাকরাজেশ্বর নিশ্চয় ভ্রম-সঙ্কুল। উন্নতিশালি উনবিংশতি বর্ষের শেষ ভাগে বাঙ্গালার গৌরবের দিনে এ হেন ভ্রম পরিপূর্ণ পুস্তক প্রনয়ণ অতিব অন্যায় কার্য্য। এরূপ পুস্তক প্রণেতা সাধারনের নিকট দণ্ডার্হ। পাকরাজেশ্বরের মত একখানি পুস্তকের আবশ্যকতা ছিল। মনে করিয়াছিলাম এতদিনে সে অভাব পূর্ণ হইল কিন্তু তাহাও তো হইল না আশা করি কোন উপযুক্ত ব্যক্তি এ গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন। সাধারণী সম্পাদক মহাশয় আমা-দিগের অনেকটা হিতাকাঙ্খী বোধ হয়, তাঁহার মত ব্যক্তিরই ইহা অবশ্য করণীয়। এ বক্তৃতা স্রোত কোথায় গিয়া যে স্থগিত হইত বলিতে পারিনা বোধ হয় বাবুর আফিসের বেলা হওন রূপ বাধা প্রাপ্ত না হইলে ইহার গতি অবিরাম হইত। বাবু আস্তে আস্তে আফিসাভিমুখে গমন করিলেন। দাসী বলিল মাঠাকুরণ বোধ হয় তুমি সেই যে কি তেলের মত ঢালিয়া দিলে তাইতে দাল তেঁতো হইল। গৃহিনী দূর মাগী বলিয়া ধমকদিলেন, দাসী আস্তে আস্তে সরিয়া গেল।

আমরা পাকরাজেশ্বরের সমালোচনা করিব মনে করিয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলাম কিন্তু সে মনষ্কামনা পূর্ণ করিবার আর কোন আবশ্যকতা দেখিনা। "গৃহিনী" সমালোচনার উপর দ্বিরুক্তি করিবার আমাদের আর ক্ষমতা নাই।

শ্রীলাঃ——

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

রূপজালাল। (উপন্যাস) শ্রীমতী ফয়জন্নেছা চৌধুরাণী প্রণীত। ঢাকা-গিরিশ যন্ত্র। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

গ্রন্থের প্রথমে গ্রন্থকর্ত্রীর বংশাবলীর বিবরণ, পরে লেখিকার গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য অতি বিশদ রূপে লিখিত হইয়াছে, গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য পাঠে জানা যায়, যে রচয়িত্রী অতুল ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও ভাগ্য অপ্রসন্নতা হেতু বড় মন্দভাগিনী, এবং সেই ভাগ্য অপ্রসন্নতা হেতু মনস্তুষ্টি সাধনার্থ এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থখানি গদ্য ও পদ্যে বিরচিত। ভাষা প্রাঞ্জল পরিপাটি এবং যত্ন করিয়া লেখা। মুসলমান রমণীর বঙ্গভাষায় যে এতাদৃশ যত্ন আছে, অথবা এরূপ সুশিক্ষিতা যবনী যে আছেন, তাহা আমরা বস্তুতই পূর্ব্বে জানিতাম না। এ পুস্তকখানি যে একজন রমণী বিশেষতঃ যবনী কর্ত্তৃক লিখিত বলিয়া প্রশংসা করিলাম তাহা নহে। এরূপ রচনা কোন বিজ্ঞের লেখনী হইতে নিস্রাবিত হইলেও প্রসংশার্হ। আমরা গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইয়াছি। ঈশ্বরেচ্ছায় গ্রন্থকর্ত্রী দীর্ঘজীবিনী হইয়া এই হিতসাধন ব্রতে নিরত থাকিয়া স্বজাতির, বঙ্গের, ও বঙ্গভাষার মুখোজ্জ্বল করিতে থাকুন ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা ও একান্ত প্রার্থনা।

সাত জুতো। বিদ্রূপপূর্ণ উপদেশ, নং ১ শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, করপ্রেস, কলিকাতা। মূল্য /০ আনা মাত্র।

এই পুস্তকখানি রাজকৃষ্ণ বাবুর "ঘোড়ার ডিম" "কুঁপো কাৎ" প্রভৃতি প্রচারিত হওয়ার পর প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং ইহা কতক পরিমাণে সাদৃশ্য দোষে দুষী। "ঘোড়ার ডিম" প্রভৃতি প্রচারের যে উদ্দেশ্য ইহার ও সেই উদ্দেশ্য, অতএব ইহা সাধারণের প্রিয় বস্তু। ইহার উদ্দেশ্য প্রকৃতই মহৎ। কবিতা—পরিষ্কার পারিপাটী এবং সাবধানতার সহিত লিখিত। আমাদের একান্ত ইচ্ছা যে সাধারণে এক আনা ব্যয় করিয়া ইহার লালিত্যময়ী অপূর্ব্ব রসাস্বাদনে যেন বঞ্চিত না হয়েন। গ্রন্থকার প্রকৃতই প্রসংশা ও উৎসাহের পাত্র।

———

সমালোচক।

মক্ষিকা ব্রণ মিচ্ছন্তি মধু-মিচ্ছন্তি ভ্রমরা।

সাংসারিক সমস্ত কার্য্যে সমালোচক হওয়া বিধেয়,অথবা সকল কার্য্যের সমালোচনা হওয়া আবশ্যক, সাধারণতঃ যে কার্য্যের যত সমালোচনা হইবে, সে কার্য্যের তত উন্নতি বা উৎকর্ষ সাধিত হইবার সম্ভাবনা। উন্নতি-শীল জগতে এ চিত্র বিরল নহে। সমালোচনা ব্যতিরেকে বিষয় সম্যক প্রকাশ পায় না। সমালোচক যে সৌন্দর্য্য বা ভ্রান্তি প্রদর্শন করিবেন, সে সমস্ত লেখক জানেন না, বস্তুতই সমালোচনা ব্যতীত উন্নতি নাই। আমাদের অধঃপতিত ভারতে সমালোচকের অসম্ভাব নাই, সমালোচ্যেরও অভাব নাই। লেখকের দৌড় "মাছের পোকায়" সমালোকের দৌড় আবার ততোধিক, বঙ্গভাষার বহুল সমালোচনা—অথবা বিস্তৃত সমালোচন তরঙ্গ পরিপ্লাবিত বঙ্গভাষা দেখিয়া যদ্যপি আমরা বিষাদিত হই—তাহা হইলে আমরা বঙ্গভাষার হিতাকাঙ্ক্ষী নহি—বরং শত্রুপদবাচ্য। কিন্তু কি দুঃখের বিষয় যে অদ্য আমরা সেই ভাষাপ্রিয় বঙ্গ মুখোজ্জ্বলকারী সমালোচকগণের পক্ষে বা বিপক্ষে দুই এক কথা বলিতে এই প্রবন্ধ প্রকটনে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। জানিনা যে সাধারণ কর্ত্তৃক আমাদের এই অসমসাহসিকতা বা ধৃষ্টতা ক্ষমা যোগ্য কিনা।

বঙ্গভাষা অধিকাংশ ইংরাজি ভাষাভিজ্ঞ কর্ত্তৃক ঘৃণিত, সুতরাং এই অযত্নপ্রতিপালিত পরিলাঞ্ছিত অসহয়া ও পরিত্যক্ত বঙ্গভাষার প্রতি যাঁহারা কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন তাঁহারা আমাদের প্রাণের ভাই, তাঁহাদের সহিত আমাদের সহানুভূতি অসীম অপরির্য্যাপ্ত। বঙ্গভাষা সুদ্ধ বঙ্গমধ্যে প্রচলিত, তাহাতে আবার অধিকাংশ শিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত কর্ত্তৃক ইহা একেবারে ত্যক্ত, এ সমস্ত প্রবল প্রতিবন্ধক সত্ত্বে এই নির্জ্জীব ভাষা যে দিন দিন কিরূপে উন্নত হইতেছে তাহা জ্ঞানীকে

বুঝাইবার আবশ্যক নাই। তাহার পর বাঙ্গলাভাষা রাজভাষা নহে। বাঙ্গলা শিক্ষা করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার আশা দুরাশা মাত্র। সুতরাং বাঙ্গালির পক্ষে ল্যাটিন্ শিক্ষা যেরূপ ইচ্ছাধীন, বাঙ্গালা শিক্ষাও তদ্রূপ প্রায় হইয়া উঠিয়াছে। তবে বঙ্গভাষা আমাদের মাতৃভাষা সুতরাং না জানিলেও কতকটা জানি, এবং না জানিয়াও অভিমানি। আজ বঙ্গভাষার ত এই অবস্থা, তাহাতে আবার অসংখ্য অসংখ্য ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সমালোচক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ঈশ্বর জানেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য কি?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সকল কার্য্যেরই সমালোচনা হওয়া আবশ্যক, সেই সমালোচনা বঙ্গভাষার প্রতি সানুকূল দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াছেন, সুতরাং সেই সমালোচকগণের অক্ষয় কীর্ত্তি স্বরূপ লেখনীর জয় হউক, আমরা অদ্য তাঁহাদেরই বিজয় ঘোষণা করিতে কথঞ্চিৎ অকিঞ্চিৎকর প্রয়াস করিব, হে মা বাক্‌বানি তুমি আমার স্কন্ধে উত্তম করিয়া ভর প্রদান কর, দেখিও মা আমি যেন তাঁহাদের বিষ দৃষ্টিতে পতিত না হই। ভাষার উন্নতি কল্পই যদ্যপি সমালোচকের জন্মের প্রধান বা একমাত্র কারণ হয় তবে বলিতে কি সেরূপ সমালোচক বঙ্গে অতি বিরল। সাধারণতঃ সমালোচক বিদ্বান বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ হওয়া চাই, কিন্তু বঙ্গভাষার দুর্ভাগ্যক্রমে সমালোচকগণ উহার বিপর্য্যয় ভাবাপন্ন হইতেছেন। আমরা সমালোচকের আসনকে একটী গুরুতর আসন বলিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হই না, কিন্তু কি বিড়ম্বনা যে বঙ্গভাষার পক্ষে সেই সমস্ত শীর্ষ স্থানীয় আসনে কতকগুলি অপরিণতবয়স্ক দাম্ভিক যুবক সমাসীন হইয়া বঙ্গভাষার ভাবি উন্নতির বিঘ্ন সম্পাদন করিতে কৃত সংকল্প হইয়াছেন। তাঁহারা ভাষা অনভিজ্ঞ অথচ লেখক, সমালোচনায় সর্ব্বতোভাবে অপটু অথচ সমালোচক, সমালোচকের কর্ত্তব্য কি, সমালোচনা করিতে হইলে কোন কোন বিষয় অবলম্বন করিয়া সমালোচনা করা কর্ত্তব্য, তাহার বিন্দু মাত্রও জানেন না, অথচ সমালোচনা কার্য্যে ক্ষিপ্রহস্ত। আজ কাল সেই মহাত্মা—তাঁহাদের লেখনী অক্ষয় হউক—সমালোচক দিগের প্রসাদে সমালোচনার বাজার এত সস্তা হইয়াছে যে আমরা পথে ঘাটে দেখিতে পাই যে কতকগুলি অজাতশ্মশ্রু বালক মাত্র একত্রিত হইয়া

কেহ বা মাইকেলের কেহ বা দীনবন্ধুর—কেহ বা বঙ্কিম বাবুর পিণ্ড চটকাইতেছেন।

সমালোচক গণের আর একটী দুঃচিকিৎস রোগ জন্মিয়াছে। তাঁহাদের ধারণা হইয়াছে যে গলাবাজি বা গালি দিতে পারিলেই বড় লোক হয়। কেহ যদ্যপি—একখানি মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকাতে কোন সম্ভ্রান্ত লোককে গালি দিতে পারিলেন, তাহা হইলেই তিনি বড় সমালোচক, বিচক্ষণ ব্যক্তি। আবার পাঠক শ্রেণীও তদ্রূপ,—তাহারা আগ্রহ সহকারে সেই সমস্ত পত্রিকা পাঠ ও গ্রহণ করেন। এ সমস্ত নিস্তেজ অন্তঃকরণের পরিচায়ক; আজি কাল ভারতে এই ভীমমূর্ত্তি বিরাজমান! বঙ্গে যেরূপ পাঠক সংখ্যা কম, সেইরূপ লেখক সংখ্যাও কম। কিন্তু পাঠক সংখ্যার সহিত তুলনা করিলে লেখক সংখ্যার ভার গুরু বলিয়া প্রতীতি জন্মে। লেখক হইলে তাঁহার সমালোচনা অবশ্যম্ভাবী। তাঁহারা সমালোচনে হয়ত নিন্দিত হইয়া স্বয়ং সমালোচক হইয়া উঠিয়াছেন এবং বেওয়ারিস্ বঙ্গভাষাকে পাইয়া সেই গুরু পদবাচ্য—বঙ্গের শীর্ষস্থানীয় সমালোচক হইয়া গ্রন্থকারগণের অন্যায় রূপে নিন্দা করিয়া আপন আপন ক্ষুদ্রান্তঃকরণের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। আমরা অনেক সময়ে দেখিতে পাই যে কোন লোক বিশেষের কুৎসা করিবার নিমিত্ত কোন কোন পত্রিকার ক্ষণিক বিকাশ হয়! ইহা কি বঙ্গের শোচনীয় অবস্থার একান্ত পরিচায়ক নহে? ইহার প্রথম আদর্শ—উপহার। ইহা একখানি গণ্ডা গণ্ডা বিষয় প্রসবিনী মাসিক পত্রিকা। ইহা দুই মাসের জন্য মর্ত্তধামে অবতীর্ণ হইয়া অনন্ত কালের অন্ধকার গর্ভে চিরদিনের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে বোধহয় যে উহার জন্ম গ্রহণের একমাত্র কারণ সাধারণীর সুযোগ্য সম্পাদক বাবু অক্ষয় চন্দ্র সরকারকে অন্যায় রূপে অভদ্রের ন্যায় গালিবর্ষণ করা। শুধু তাই নয় বঙ্কিম বাবুর উপর ও বিলক্ষণ রোষ ছিল। অক্ষয় বাবুর "গোচরণের মাঠে" বঙ্কিম বাবুর পত্র আছে, এবং বঙ্কিম বাবুও ন্যায়ের অনুরোধে একটী প্রসংশা পুর্ণ পত্রী দিয়াছিলেন বলিয়া না জানি বঙ্কিম বাবুকেও কত কথা শুনিতে হইয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য যে উপহার সম্পাদক

একবার কি ভ্রমেও ভাবিলেন না যে তাঁহার গালিতে অক্ষয় বা বঙ্কিম বাবুর যশের বিন্দুমাত্র লাঘব হইবে না, বরং তাঁহারই অজ্ঞতা ও নীচান্তঃকরণের দেদীপ্য প্রমাণ প্রকাশ পাইবে। উপহার সম্পাদক "গোচারণের মাঠ" সমালোচনা করিয়া বস্তুতই সাতিশয় সঙ্কীর্ণ হৃদয়তা, অজ্ঞতা ও বহুদর্শিতার অসদ্ভাবের পরিচয় প্রদান করিয়া বিজ্ঞ সমাজে সমধিক হাস্যস্পদ ও ঘৃণিত হইয়াছিলেন।

ইহার দ্বিতীয় আদর্শ "বঙ্গবাসী"। বঙ্গবাসীর জন্মদিন এখনও মনে পড়ে। বঙ্গবাসীর এখনও অন্ন প্রাসন হয় নাই, কিন্তু কি আশ্চর্য্য যে এই বাল্যাবস্থাতেই বঙ্গবাসীর জেঠাম রোগ ধরিয়াছে। বঙ্গবাসী মনে করিয়াছেন যে গালি দিতে পারিলেই বুঝি বড় হইব। কথায় আছে "যদি বড় হ'বে তবে ছোট হও" কিন্তু বঙ্গবাসী তাহা বুঝেন না। বঙ্গবাসীর ৩৫০০ গ্রাহক হইয়াছে সে অহঙ্কার আর তাহার ধরিতেছে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যে এই ৩৫০০ গ্রাহক সত্ত্বেও বঙ্গবাসীর বার্ষিক আয় কত তাহার তালিকা প্রকাশ করিয়া কি বঙ্গবাসী আমাদিগকে বাধিত করিবেন? সপ্তাহে দুই ফর্ম্মা রয়েল্ ইহার মূল্য বর্ষে ১৷৹ টাকা পাইয়া যিনি উন্মত্ত হয়েন তিনি যে সকল বিষয়ে অন্ধ তাহা কেনা বলিবে। আমরা বঙ্গবাসীর উন্নতি দেখিয়া যে সুখী তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু বঙ্গবাসীর অহঙ্কার ভাল লাগে না। বঙ্গবাসী বঙ্গদর্শনের সমালোচনায় স্বীয় গাম্ভীর্য্য রাখিতে পারেন নাই। বালকের ন্যায় তিনিও বলিলেন "সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই" কেন সঞ্জীব বাবু বঙ্গদর্শনের সম্পাদক বলিয়া কি বঙ্গদর্শনের এ অবস্থা? কখনই না। বঙ্কিম বাবু এ সময়ে বঙ্গদর্শনের সম্পাদক থাকিলেও ইহার যে বিশেষ কোন উন্নতি করিতে পারিতেন না তাহা নিশ্চয়, তবে বঙ্কিম বাবু চেষ্টা করিলে যে পারে না তাহা নহে। বঙ্কিম বাবু যে পারিতেন না তাহার কারণ এই যে তিনি এখন ও বঙ্গদর্শনে লিখেন তখনও লিখিতেন। তবে বঙ্কিম বাবু সম্পাদক থাকিলে হয়ত গ্রাহক সংখ্যা কতক বৃদ্ধি হইত।

বঙ্গবাসী সঞ্জীব বাবুর নিন্দা করিলেন বটে, কিন্তু ভাল করিয়া নিন্দা করিতে পারিলেন না। কারণ যে লেখাগুলি তিনি বঙ্কিম বাবুর মনে

ভাবিয়া সুখ্যাতি করিলেন, সেগুলি দুর্ভাগ্য বশতঃ বঙ্কিম বাবুর না হইয়া সঞ্জীব বাবুর, তাই বলি অন্যায় করিয়া লাগি দেওয়া ন্যায় পরায়ণ সমালোচকের কর্ত্তব্য নহে। বঙ্গবাসী এইরূপ অনেক কার্য্য করিয়াছেন ও করিতেছেন, সেই নিমিত্ত এ স্থলে তাহা উল্লিখিত হইল নতুবা হইত না। বঙ্গবাসী—আপনি পত্র লিখিয়া অতি সমাদর করিয়া বৃদ্ধ বঙ্গদর্শনকে শঙ্খধ্বনি করিয়া গৃহে তুলেন। কিন্তু সেই বঙ্গবাসীই বাল-স্বভাব-সুলভ চাপল্য পরবশ হইয়া কেন যে বঙ্গদর্শনকে অযথা কটুবাদ করিলেন, তাহা বুঝি না। বঙ্গবাসীর বঙ্গদর্শন সমালোচনার আবশ্যক ছিল কিনা জানি না। তবে এ কথা সত্য যে বঙ্গবাসীর বঙ্গদর্শন সমালোচনা করিবারও ক্ষমতা আছে! আশা করি বঙ্গবাসী ভবিষ্যতে মিষ্ট কথা শিক্ষা করিবেন, বালকত্ব ত্যাগ করিবেন। বঙ্গবাসীর নাকি উন্নতির আশা আছে, বঙ্গবাসী একখানি ভাল কাগজ হয় ইহা নাকি আমাদের ইচ্ছা, তাই এত কথা বলিলাম নতুবা এত কথা বলিতে আমাদেরও মাথা ব্যথা করিতেছিল না।

অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি জানি না কোন উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া এইরূপ ঘৃণিত কার্য্য করিয়া ফেলেন। অক্ষয় বাবুর "তুলনায় সমালোচনা" তাহার দেদীপ্য মূর্ত্তি। অক্ষয় বাবু একজন বিদ্বান্ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি বলিয়া গণ্য, তিনি একজন পক্ষপাতশূন্য সমালোচক বলিয়া খ্যাত, কিন্তু কালচক্রে বুঝি তাঁহার সে খ্যাতিটুকুও বিলুপ্ত হয়। তিনি আজি কাল ভয়ানক—প্রায়শ্চিত্ত—আরম্ভ করিয়াছেন। যাহাই হউক একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না, অক্ষয় বাবুকে আমরা গুরু তুল্য মান্য করি, তিনিও আমাদিগকে যথেষ্ট স্নেহ করেন, আশা করি তিনি স্নেহ করিয়া আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। তিনি একজন প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি তাঁহার "চন্দ্রালোকে" "উদ্দীপনা" "প্রাবু" "দশমহাবিদ্যা" তাহার পরিচয়, অতএব বলা বাহুল্য যে দীন বঙ্গভাষা তাঁহার মুখ প্রতি সর্ব্বদা সোৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, কিন্তু তিনি কি কঠিন যে সে অবলার প্রতি ভ্রমেও দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন না। সাধারণী লইয়া হয়ত তাঁহার ব্যস্ততা প্রযুক্ত তিনি এ কার্য্য করিয়া উঠিতে পারেন না, যদি তাহাই হয় তবে

আমাদের ভাগ্য বড় মন্দ, আজ কাল সাধারণী আর পূর্ব্বমত নাই, তাহা হইলেও সাধারণী তাঁহার প্রিয় বস্তু। সাধারণী তাঁহার প্রিয় বস্তু হইতে পারে, কিন্তু সাধারণী অপেক্ষা অক্ষয় বাবু আমাদের প্রিয়। তাই বলি সাধারণী তুমি যদি অক্ষয় বাবুর বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতি সাধনার বিঘ্নকারিনী হও তবে তুমি উৎসন্ন যাও, তোমার লয় দেখিয়া আমরা সুখী হইব।

বঙ্কিম বাবু একজন অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি, তাঁহার গ্রন্থাবলী বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য বিভব। কিন্তু বাঙ্গালির নিয়ম নহে যে ভালকে ভাল বলে, আজ কাল তাঁহার লেখা লইয়া ভয়ানক সমালোচনা চলিতেছে, সে যাহাই হউক ইহা নিশ্চয় যে যতই কেন সমালোচনা হউক না বঙ্কিম বাবু লেখনীর জয় যতকাল বঙ্গভাষা জীবিত থাকিবে, ততকাল বিঘোষিত হইবে। তাহার পর তাঁহার সমালোচনা,—তিনি "উত্তর রামচরিত" ও "বহুবিবাহের" সমালোচনা করিয়া সমালোচকের রুচি ও ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু অনেক নিন্দুকের তাহা ভাল লাগিল না, বা প্রাণে সহিল না। এ কথায় আমাদের ব্যাঘ্রাচার্য্য ও বৃহল্লাঙ্গুলের বক্তৃতার পর বান্দরগণ কর্ত্তৃক তৎসমালোচনার কথা মনে পড়ে ও হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না।

যাহাই হউক আর নানা কথা বলিয়া এ প্রবন্ধের অঙ্গ পরিপুষ্টির আবশ্যক নাই। আমাদের এ প্রবন্ধ প্রকটনের যে উদ্দেশ্য তাহা সংক্ষেপে এক প্রকার বলা হইয়াছে, আশা করি আমাদের এ প্রবন্ধ প্রকটনের অন্ততঃ কতকটা উদ্দেশ্য সংশাধিত হইবে।

কল্পনার প্রতি।

—oo—

(১)

এস মা কল্পনে, দয়িতের ধন,
এস সুখে তব, করি আবাহন,
বহুদিন হ'তে, দেখিনি তোমার,
সমুজ্জ্বল ছবি, বিশ্ব প্রতিভার;
এস দয়াময়ি, দেখি একবার,
বিপুল সে চিত্র, হৃদয় মাঝার।

(২)

কি চিত্রে চিত্রিব, বল দেখি দেবি,
আজিকে তোমার মূরতি খানি;
কি কল্পনা বলে, বল দয়াময়ি,
দেখিবে তোমারে (এ) অবোধ প্রাণী?
না না দেখিবনা, তোমারে আজিকে,
তোমার পশ্চাতে ছুটিবে প্রাণ,
দেখিতে নূতন, নূতন নূতন,
পাইতে কৌশলে নূতন জ্ঞান।
দেখিব নূতন, জলদের ছটা.
দেখিব নবীন দামিনী-হাস!
দেখিব সাগর, ভূধর প্রান্তর,
সরসীর জল—নলিনীবাস।

(৩)

দেখিব না আজি, প্রণয় আবেগ,
প্রণয়িনী-চক্ষে নীহার মালা;

বঙ্গ-বিরহিনী, বিধবা রমণী,
তাহার দারুণ হৃদয়-জ্বালা।
বিদ্যুৎ বরণী, প্রিয়ার অধরে,
দেখিব না সেই মধুর হাসি!
প্রিয় সম্ভাষণ, প্রেম আলিঙ্গন,
বঙ্গবাসী যাহে চির উল্লাসি।

(৪)

কি দেখিব তবে, দেখিব না যদি,
চিরদিন যাহা দেখিয়া আসি;
কি দেখিলে বল, বাঙ্গালির এই,
অবোধ পরাণ উঠিবে হাসি?
কি দেখিলে প্রাণ, হইবে চঞ্চল,
ধমনীতে ব'বে তরল বেগ;
ওহো বিড়ম্বনা, সে সব বাসনা,
তুষিতে বাঙ্গালি-হৃদয়-বেগ।
চল মা কল্পনে, দেখি তবে গিয়া,
দূর হ'তে পানিপথের জয়,
মহারাষ্ট্র জাতি, গৌরব ভাস্কর,
উঠিয়া আবার কোথায় ধায়।
চল একবার, পলাশি প্রাঙ্গণে,
ক্লাইবের মূর্ত্তি দেখাও দীনে।
জ্বলুক তাহাতে, উজ্জ্বল বরণে,
বীরত্বের ছবি বাঙ্গালি-জীবনে।
না না সেই আশা, যাও দূরদেশে,
বাঙ্গালি নির্জ্জীব,—নির্জ্জীব প্রাণ;
কি হ'বে দেখিয়া, কৃপাণের খেলা,
তোপের গর্জ্জন কাঁপাতে প্রাণ।

ফুলমালা-ভার, লৌহশৃঙ্খলসম,
ভাবে যে বাঙ্গালি কেন বা তার ?
দেখিতে বাসনা, দুর্জ্জয় আহব,
কাঁদাইবে প্রাণ মূরতি যার।

(৫)

চল মা কল্পনে, চল তবে যাই,
দেখিগে ইংলণ্ড দেখিগে ফ্রান্স্ ;
দেখি সেই রোম, অভ্যুদয় তার,
হয় ত প্রাণের ঘুচিবে ত্রাস।
হয় ত আবেগে, হৃদয় কাঁদিবে,
হইবে প্রসন্ন বিধাতা তায় ;
দুর্ব্বল বাঙ্গালি, ভাগ্যের প্রভাব,
ইন্দ্রজাল বলে ঘুচিবে হায়।
না না তা যাবনা, কিনিতে কলঙ্ক,
সাজিতে ইংরাজ বাঙ্গালি প্রাণে,
ঘুচিবে না তাহে, ভারতের দুঃখ,
যাইবে না দুঃখ কপাল গুণে।
এখনও ভারত, আমার আমার,
ভারতবাসীরা ভা'য়ের মত,
ভারত মাতার, দেখিয়া যাতনা,
বিরলেতে বসি কাঁদি বা কত।
সে সুখ—দুস্তর সাগর সলিলে
ভাসায়ে, ইংরাজ-ভূষণে সাজি ;
ইংরাজের বেশ, ইংরাজের ভাষা,
কাজ কি আমার সে কাজ সাধি ?

(৬)

চল মা কল্পনে ! কাজ নাই আর,
চল যাই সেই নিবিড় বনে,

সাজাইয়া তোমা, রুদ্রাণী-বরণে,
দেখিব সে বেশ পুলক মনে।
নাচিবে তাহাতে, হৃদয় আমার,
উঠিবে তাহাতে জীবন হাসি,
দেখি সেই শোভা, নির্জ্জনে একাকী,
অতুল আনন্দে হ'ব উল্লাসি।
যার ইচ্ছা সেই, সে দেশেতে যাবে,
গাঢ় আলিঙ্গন করিব তায়,
তার কাছে খুলি, হৃদয়কবাট,
কাঁদিব আকুলে কাঁদাব তায়।

বিজয় সিংহ।

—ooo—

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নৃত্যশালা।

বেলা প্রায় সার্দ্ধ দ্বীপ্রহর, দিল্লীশ্বরের পদরজ চুম্বন করিয়া,মৃদু পবনে নাচিয়া নাচিয়া আগ্রার পূর্ব্বদিক দিয়া যমুনা নিম্নগা নিম্নগামিনী হইয়া সখি ভাগিরথীর দর্শন লালসায়, নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছিল। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ তুচ্ছ করিয়া, মনোরম তরণী বক্ষে ধারণ করিয়া দুর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী সম্রাটের তাজমন্দির দেখিতে দেখিতে যমুনা বাহিত হইতেছে। বুক চিরিয়া সেই জগৎ বিখ্যাত সোধকিরিটিণী তাজমহলের চারু অঙ্গ বক্ষে ধারণ করিয়া জগৎ সংসারকে দেখাইতেছে, ও হাসিতে হাসিতে

নাচিতে নাচিতে কলঃস্বরে কল্লোলিনী ধাইতেছে। আজি সমাগ্র নগরী হাসিতেছে। নগর সুসজ্জিত, কোথাও স্বর্ণ কলস বিভাবসুর কিরণে জ্বলিতেছে, কোথাও শোভাময় পতাকা চারু প্রাসাদ শ্রেণীর অঙ্গ-শোভা সম্বর্দ্ধিত করিতেছে। কোথাও নৃত্য, কোথাও বাদ্য, কোথাও বা গগণস্পর্শি আনন্দ ধ্বনি; কে জানে আজি কি সুখে নগর মাতিয়াছে, কে জানে আজি কি অলোক সামান্য দিন যে এই দিনে এত হৃদয় আনন্দে মগ্ন। পাঠক! বুঝিয়াছ কি? যদি না বুঝিয়া থাক তবে বুঝ যে আজি আরুঙ্গজেবের জন্মদিন। আজি আগ্রা আনন্দে পূর্ণ, রাজপ্রাসাদ আনন্দ-পূর্ণ, তাজমহল আনন্দময়। উনবিংশ শতাব্দির শেষাংশে সে আনন্দ বা সেই সুখ—চিন্তা দ্বারা উপলব্ধি হইবার নহে। 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান এখন আর হয়না, এবং তৎকালে দিল্লীশ্বর যে কি ছিলেন তাঁহার প্রভুতা, সমৃদ্ধি প্রভৃতি যে কত ছিল, তাহা চিন্তা করিতেও এখন আমরা সম্পূর্ণ পারক নহি। আজি সেই মুসলমান সম্রাজ্যের প্রবল তরঙ্গে আগ্রাতে দিল্লীশ্বরের জন্ম দিন। আজি সম্রাট তাজমহলে, রক্ষীবর্গ আনন্দে মগ্ন, পৌরবর্গ আনন্দে মগ্ন, ভৃত্যবর্গও আনন্দে আপ্লুত।

একটী বৃহৎ গৃহে ময়ুর সিংহাসনোপরে সম্রাট আরুঙ্গজেব উপবিষ্ট। প্রায় পঞ্চাশৎ জন পারিষদবর্গ করপুটে দণ্ডায়মান। সংখ্যাতিরিক্ত রক্ষীবর্গ উলঙ্গ অসী হস্তে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। গৃহের উপরিভাগ মনোহর কারু কার্য্য সম্পন্ন সুবর্ণে খচিত। গৃহতল বহুমূল্য কিংখাপ গালিচায় আচ্ছাদিত। সম্রাট সিংহাসনে সমাসীন রহিয়াছেন, তাঁহার সম্মুখে মনোহর বেশভূষায় বিভুষিতা হইয়া কতিপয় রমণী বিবিধ অঙ্গরাগ করিয়া নৃত্য করিতেছে। দিল্লীশ্বর মধ্যে মধ্যে আনন্দধ্বনি করিতেছেন ও নর্ত্তকীদিগকে যদৃচ্ছা পারিতোষিক দিতেছেন। এই সময়ে দূর হইতে নকীব প্রণত হইয়া মহারাজ প্রতাপসিংহের আগমন বার্ত্তা দিল্লীশ্বরের গোচর করিল। আনন্দে মত্ত দিল্লীর অধীশ্বর প্রতাপ সিংহকে প্রবেশানুমতি প্রদান করিলেন। অতি অল্প সময় মধ্যেই কিঞ্চিৎ দূরে এক জন দীর্ঘকায় বৃদ্ধ অথচ বলিষ্ঠ রাজপুতকে অসি চর্ম্মে আবৃত হইয়া তিন পদ অগ্রে ও দুই পদ পশ্চাৎ হইয়া সেলাম করিতে করিতে অগ্রসর হইতে

দেখাগেল,—ইনিই প্রতাপ সিংহ। তিনি নিকটবর্ত্তি হইলে, পারিষদবর্গ সসম্ভ্রমে উঠিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা ও অভিবাদন করিল। বাদসাহ বৃদ্ধকে অবনত শিরে ক্রমশঃ অগ্রে পশ্চাতে ক্লান্ত দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া দ্রুত আসিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ প্রতাপ সিংহ অতি সুচতুরের ন্যায় আরও আদব কায়দার সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রতাপ সিংহ বাদশাহের পদ চুম্বণ করিলে, বাদশাহ তাঁহার বাম পার্শ্বে তাহাকে উপবিষ্ট হইতে আদেশ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সকল কুশল ত?"

" প্রতাপসিংহ সসম্ভ্রমে কহিলেন। যাহার দিল্লীশ্বর সহায় তাহার কি অকুশল সম্ভবে?"

" বাদসাহ কহিলেন, বলিতে কি, প্রতাপ সিংহ, আরঙ্গজেব এ পর্য্যন্ত তোমা অপেক্ষা কাহাকেও অধিক বিশ্বাস করেনা।"

প্রতাপ আমি যে প্রাতঃস্মরণীয় দিল্লীশ্বরের শ্রীচরণে এতদূর আশ্রয়, পাইয়াছি, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য।

বাদসাহ কিন্তু প্রতাপসিংহ আমার কি অভ্যাস যে আমার আজ্ঞার তিলার্দ্ধ ক্রটী হইলে, আমার অতি প্রিয়েরও শিরশ্ছেদ করিতে অবহেলা করিনা।"

এই কথা শুনিবা মাত্র প্রতাপ সিংহের আপাদ মস্তকের প্রত্যেক কেশ পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, মস্তক ঘুরিয়া গেল। কিন্তু প্রতাপ সিংহের অন্য কোন গুণ না থাকিলেও আত্ম সংজম গুণটা বড় ছিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রকৃতিস্থ হইয়া নম্রভাবে কহিল। "যে সাধ্যমতে দিল্লীশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ, তাহার প্রাণে প্রয়োজন?"

" আমারও অভিপ্রায় তাই।"—এই কথা বলিয়া আরঙ্গজেব ক্ষণেক অনন্যমনা হইলেন, আবার নৃত্য চলিল। আবার সুধাময়ীর তরল তরঙ্গে বাদসাহের যত না হউক পারিষদবর্গের চিত্ত দ্রব করিতে লাগিল, আরঙ্গজেব ক্ষণতরে রাজকার্য্য বিস্মৃত হইয়া নর্ত্তকীগণের নৃত্য দেখিতে ও তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। একটী নর্ত্তকী এই সুখের বাসরে গাহিল :—

মোহন রূপ প্রাণ পাগল হেরি।

আশাতে হ'ল নিরাশা—মরমেতে জ্বরে মরি॥

সুখ আশা ছিল যত, হ'ল দুঃখে পরিণত,
প্রাণ কাঁদে অবিরত, স্মৃতিয়ে স্মরণ করি।
যে যাহারে নাই পাবে, কেন প্রাণ তারে চাবে,
প্রেম আশা কেন হেন, পরাণ আকুল কারি॥

গীত সমাপ্ত হইবামাত্র বাদসাহের যেন চমক ভাঙ্গিল, পরে কহিলেন—"ওঃ প্রতাপ সিংহ তোমার কন্যা আসিয়াছেন কি?"

প্রতাপসিংহ কাঁপিয়া উঠিলেন বলিলেন "আজ্ঞে—না"

"কেন"

"আমার পুত্র ও বিজয়সিংহ তাহাকে আসিতে দিবে না, আমার পুত্রের ইচ্ছা বিজয়ের সহিত তাহার বিবাহ দেয়।"

আরঙ্গজেবের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, অধঃপ্রান্তে—দন্ত সংযোজনা পূর্ব্বক কহিলেন "সেই শূকর শাবকের সহিত কমলার বিবাহ দিবে? প্রতাপসিংহ! বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে তুমি যে রাজার স্মরণাগত, সেই রাজদ্রোহি সন্তানের স্কন্ধে এখনও মস্তক রাখিয়াছ।"

প্রতাপ সিংহ কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন "কেবলমাত্র বাদসাহ বাহাদুরের অনুমতি সাপেক্ষ।"

"যেদিন তোমার কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই দিবস তুমি আমার কোন এক সন্তানের সহিত তাহার বিবাহ দিবার অনুগ্রহ প্রার্থনা কর, এখন সেই সযৌবনা কন্যার বিবাহে যে কোন ব্যক্তি প্রতিবন্ধকতা চরণ করিবে তাহার শিরচ্ছেদ করিতে আবার অনুমতি?"

প্রতাপসিংহ করযোড়ে কহিল "এক্ষণে বিদায়ের অনুমতি হইলে অতি সত্বরেই সেই নৃশংসের মুণ্ড আনিয়া আপনার পদতলে উপস্থিত করি।"

আরাঙ্গজেব ক্ষণকাল কি ভাবিলেন, পরে মনে মনে বলিলেন "প্রতাপ সিংহ আমার প্রধান সহায় ও বাধা, কি জানি যদি পুত্র হত্যা করিতে অসম্মত হইয়া বিজয় সিংহ প্রভৃতির সাহায্য গ্রহন করিয়া আমার বিদ্রোহিতাচরণ করে। সে অনল জ্বলিলে নির্বানও নিতান্ত সহজ হইবেনা। এই এক উত্তম সময়,—কোন গতিকে প্রতাপসিংহের বংশলোপ আবশ্যক,

সাহসী রাজপুত্র ও রাজা মাত্রেরই বধ আমার নিতান্ত স্পৃহনীয়, কিন্তু একে একে ব্যতীত একেবারে সমস্ত সম্ভবেনা। যাহাই হউক, কোন কৌশল দ্বারা বিজয়সিংহ ও প্রতাপসিংহের পুত্রকে এখানে আনা আবশ্যক।” পরে প্রতাপসিংহের দিকে ফিরিয়া বলিলেন “দেখ প্রতাপসিংহ আমি লঘু পাপে গুরু দণ্ড আজ্ঞা দিয়াছি। রাজার উচিত বিচার করিয়া দণ্ড দেওয়া, সুতরাং আমি বিচার না করিয়া দণ্ড দিব না। তুমি তোমার পুত্র ও বিজয়সিংহকে রাজ দরবারে উপস্থিত কর।”

প্রতাপ সিংহ “যে আজ্ঞা” বলিয়া অভিবাদন করিলেন।

আরাঙ্গজেব বলিলে “তাহাদিগকে আনিবার অতি সহজ উপায় স্থির করিয়াছি। অতি শীঘ্রই তাহাদিগের উপর কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে দরবারে উপস্থিত হইবার পরোয়ানা যাইবে। সেই দিন তাহাদিগকে লইয়া তুমি আসিও।

প্রতাপসিংহ পুনঃ অভিবাদন করিয়া পূর্ব্ববৎ অগ্র পশ্চাৎ করিতে করিতে দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেন। আরাঙ্গজেবও নর্ত্তকীগণকে উপযুক্ত পারিতোষিক আজ্ঞা করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

একি বনদেবী?

মহারাজ প্রতাপসিংহ বাদসাহ সন্নিধান হইতে বিদায় লইয়া এককালে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়াছিলেন। উদয় সিংহের প্রতি না জানি আরাঙ্গজেব কি ভয়ানকই দণ্ড আজ্ঞা করিবে। প্রতাপসিংহ বাদসাহকে বিশেষরূপে জানিতেন, সুতরাং উদয়সিংহের যে ভারি অমঙ্গল অতি নিকট তাহা তিনি উত্তম বুঝিয়াছিলেন। বৃদ্ধ রাজা একাকী অশ্বারোহণে মনের গুরু ভার বহন করিয়া চলিলেন। আজি বৃদ্ধের চক্ষে জল আসিল। উদয় সিংহের সেই প্রীতি প্রফুল্ল মুখারবিন্দ তাহার মনে পড়িল, তাঁহার অকৃত্রিম

স্নেহ বিনয় সৌকুমার্য্য বীরত্ব ও পিতৃবশম্বদা প্রভৃতি রাশি রাশি গুণাবলী একে একে হৃদয়ে আসিয়া উপনীত হইতে লাগিল। থাকিয়া থাকিয়া আজি তাঁহার চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। আরাঙ্গজেব তনয়ের সহিত কমলার বিবাহ দিয়া যে উদয়ের ভবিষ্যত আশা আরও উজ্জ্বল করিবেন ভাবিয়া ছিলেন, আজি দৈব দুর্ব্বিপাকে কমলার জন্য সেই উদয় প্রাণে বিনষ্ট হয়! যে বিজয়সিংহকে শৈশবাবধি তনয় নির্ব্বিশেষে ভাল বাসিতেন, আজি বুঝি কমলার জন্য তাহারও প্রাণ যায়? কি শোচনীয় ঘটনা! কেন বৃদ্ধ এত সাধ করিয়াছিল? বৃদ্ধ আপন পদে কুঠারাঘাত করিতে কেন উপস্থিত অবস্থায় পরিতৃপ্ত হইতে পারে নাই, এই সমস্ত অনু-শোচনা বৃদ্ধের হৃদয় দগ্ধ করিতে লাগিল।

আগ্রা হইতে মরিলার দুর্গে যাইতে পথিমধ্যে একটি অরণ্যময়ী ক্ষুদ্র পর্ব্বত ছিল, যাতায়াত কালে সেই পর্ব্বতটী অতিক্রম করিয়া যাইতে হইত। প্রতাপসিংহের অশ্ব সেই পর্ব্বতোপরে আরোহণ করিতে লাগিল। পর্ব্বত মধ্যস্থ দৃশ্য অতি সুন্দর, কোথাও বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড, কোথাও পর্ব্বত ভেদ করিয়া মৃদুবাহিনী নির্ঝরিণী সমূহ প্রবাহিত হইতেছে। কোথাও বা বৃহৎ বৃক্ষ তাহাতে আদরে বন লতা উঠিতেছে। বৃক্ষে লতায় প্রণয় বড় মধুর। সে প্রণয় যে দেখে সেই বিমোহিত হয়,—কিন্তু দেখে কে? জগৎ সংসারে যাহা ভাল,তাহা কেহ দেখে না,কিন্তু যাহা কুৎসিত—অসংখ্য চক্ষু তাহাতে পতিত হয়। প্রতাপসিংহ পর্ব্বতে আরোহণ প্রযুক্ত কিছু পরিশ্রান্ত হইয়া ছিলেন,সুতরাং শারীরিক শ্রম শান্তি বিধানার্থ অশ্বকে একটি বৃক্ষে বদ্ধ করিয়া আপনি এক শিলা খণ্ডে দেহভার অর্পণ করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, যাহার মনে সুখ নাই, তাহার অন্যমনা থাকিলেই কতক সুখ, কিন্তু বিশ্রামে তাহার সুখ নাই। পূর্ব্বে হৃদয় যেরূপ জ্বলিতেছিল, এখন আবার তাহার দ্বিগুণ জ্বলিতে লাগিল। শান্তির সুখ না হইয়া, অবসর পাইয়া চিন্তা বিশেষরূপে সহচরীত্ব স্থাপনা করিল।

চিন্তার কি প্রবল ক্ষমতা! তাহার নিকট রাজা প্রজা কাহার অব্যা-হতি নাই। এ পৃথিবীতে এমন মনুষ্য কে আছে যে চিন্তা করিতে বর্জ্জিত? যে দিল্লীশ্বর জগদীশ্বরের সহিত তুল্য বলিয়া অভিহিত হইতে, তাঁহার হৃদয়

কন্দরেও চিন্তা কীট যেমন দুর্ব্বিসহ যাতনা সহকারে দংশন করিত একজন দরিদ্রের হৃদয়েও তদ্রূপ করে। রাজ প্রসাদেও চিন্তা যেরূপ ভয়ঙ্করী, দরিদ্রের পর্ণকুটিরেও ইহা তাহা অপেক্ষা বিভীষণ নহে। প্রতাপসিংহ অনন্য মনস্ক হইয়া গাঢ় চিন্তায় মগ্ন, চক্ষু দিয়া অবিরত বারিধারা নিপতিত হইতেছে, এমত সময়ে তাঁহার বামপার্শ্বে আসিয়া একটি শানিত শর নিপতিত হইল। বৃদ্ধ চমকিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে আর একটি শর আসিয়া তাঁহার সেই আশ্রিত শিলাখণ্ড প্রতিঘাত হইল। প্রতাপসিংহ এদিক ওদিক দেখিতে লাগিলেন কিন্তু কোথাও কিছু দেখিতে পাইলেন না। ক্ষণেক পরে দেখিলেন, একজন অশ্বারোহি যবন সেনা আসিতেছে এবং তাঁহাকে লক্ষ করিয়া ধনুকে পুনর্ব্বার শর সংযোগ করিতেছে। বৃদ্ধ তড়িত বেগে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক এক বৃক্ষপার্শ্বে আত্ম রক্ষার্থ লুক্কাইত হইয়া স্বীয় কোদণ্ডে শর সংযোজনা করিয়া পুনর্ব্বার মূহুর্ত্ত মধ্যে পূর্ব্বস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলেন অশ্বারোহীর অশ্ব পূর্ব্ব স্থানেই রহিয়াছে, কিন্তু সৈনিক পুরুষ বক্ষে শরবিদ্ধ হইয়া অশ্ব পদতলে পতিত হইয়াছে। সহসা তাহাকে এ বীজন স্থানে কে সংহার করিল তৎবিষয় জ্ঞাত হইবার ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে বড় বলবতী হইল। তিনি সেই সৈনিক পুরুষের নিকটে গিয়া দেখিলেন যে সে মরিয়াছে, পরিচ্ছদে বুঝিলেন যে বাদসাহের সেনা, কিন্তু কি নিমিত্ত যে তাঁহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিল তাহা এখনও বুঝিতে পারেন নাই। প্রতাপ সিংহ মৃত সৈনিকের উষ্ণীষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে তাহার মধ্যে একটি পত্র রহিয়াছে, তিনি পত্রটি সংগ্রহ করিয়া পাঠোৎযোগ করিতেছেন। এমত সময়ে একটি রমণী আসিয়া বলিল "মহারাজ! করেন কি, এখনি যে প্রাণে বিনষ্ট হইবেন, অদূরে প্রায় পঞ্চবিংশতি জন যবন সেনা আসিতেছে। শীঘ্র পলায়ন করুণ।"

প্রতাপ সিংহ একেবারে চমকিয়া উঠিলেন। কোথায় যাইবেন স্থির করিতে না পারিয়া সেই রমণীকে বলিলেন "এখানে আর কোথায় লুকাইব স্থান ত দেখিনা।"

রমণী বলিল "আছে আমার সহিত আসুন।"

তাঁহারা নিমেষের মধ্যে পর্ব্বতের কতিপয় বক্র পথাবলম্বন করিয়া এক

দুর্গম স্থানে উপস্থিত হইলেন। যদিও সে স্থান সেই পূর্ব্ব স্থানের সন্নিহিত বটে, তথাপি সহসা তথায় যাওয়া যায় না।

এ বীজন বন মধ্যে কেহ যে প্রতাপসিংহের এরূপ সহায়তা করিবে, তাহা তিনি পূর্ব্বে স্বপ্নেও ভাবেন নাই। রমণীর এরূপ ব্যবহারে তিনি একেবারে বিমোহিত ও চমৎকৃত হইলেন, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "এ রমণী কে? মানবী না বনদেবী?"

মনুষ্য-রহস্য।

—ooo—

বাল্যকালে যখন অল্প অল্প জ্ঞানের উন্মেষ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল; যখন পাপসংসার যৌবনকালের ন্যায় মায়াজালে জড়ীভূত করিয়া, আমাকে নিতান্ত অপদার্থ করিয়া তুলিতে সক্ষম হয় নাই; যে সময়ে দুরন্ত জঠর চিন্তা দুর্ব্বিসহ অনলের ন্যায় জীবিত অবস্থায় দহন করিতে না পারিয়াছিল; তখন সেই সুখের সময় কিরূপ সুন্দর ও আদরণীয় ছিল! তখন সকল দিকে প্রকৃতির সকল পদার্থে যেন আদর মিশ্রিত ছিল; আমাতেও যেন পূর্ণ আদর বিরাজমান করিত। পরমারাধ্য পিতৃদেব "এই আমার পিতৃঋণ পরিশোধক, পুন্নাম নরকোদ্ধারক, বৃদ্ধকালের এক মাত্র ভরসাস্থল" বলিয়া কতই আদর করিতেন; স্নেহময়ী জননীর নিকট আদরেরত সীমা পরিসীমা ছিল না। তিনি সর্ব্বদাই মুখচুম্বন করিয়া বলিতেন "এই আমার পুত্র একাকীই এক সহস্র, সংসারাকাশে নক্ষত্রগণ পরিশোভিত তমোহন্তা চন্দ্র স্বরূপ। যখন ইহার জ্ঞান ও যশের কিরণ জ্যোতিঃ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতে আরম্ভ হইবে, তখন আমাদের দুঃখরূপ ঘোরান্ধকার বিদূরিত হইয়া যাইবে।" ফলকথা তখন সকলেই আদর করিত, আদরের অন্ত ছিল না। কিন্তু কালপরিবর্ত্তনের সহিত আর সে আদর নাই, এক্ষণে সর্ব্বত্রই অনাদর—কেবল অনাদর! প্রকৃতিও যেন অনাদরময়ী হইয়া অনানন্দরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন। আর সে আহার, বিহার, শয়ন, স্বপ্নে আদর নাই, বিমল চন্দ্র কিরণেও আদর নাই; বাল্যকালের সুখেও আদর নাই; অধিক

কি জীবনেও আর তত আদর নাই। সকল পূর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি দিতে ইচ্ছা করি, অনেকেরও পিণ্ডদান করিয়াছি; পিতা মাতার আশা সুখকেও দূর করিয়া দিয়াছি; কিন্তু একটী সুখ ও শান্তিময় উপদেশ আজিও বিস্মৃত হইতে পারি নাই; আজীবন তাহা স্মৃতিপথে উদিত থাকিবে। সে শান্তিপূর্ণ, ভবিষ্যৎ-জীবনের মঙ্গলদায়ক উপদেশ আমার—কেবল আমার কেন অনেকেরই সেই বৃদ্ধ পিতামহের মুখনিঃসৃত। আজ তাঁহার সেই উপদেশ ভবিষ্যৎ সন্তানগণের জ্ঞাতকারণ ও হিতার্থ সকলের নিকট প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হইতেছে। হয়ত ইহা দ্বারা পরিণামে অনেকের সুশিক্ষা লাভ হইতে পারিবে।

বৃদ্ধ পিতামহ বাল্যকালে আমার মত অনেককে একত্র করিয়া যেন সেই তপোবনবিহারী সৌম্যমূর্ত্তি তাপসপ্রবর মুনি ঋষির ন্যায় সরলভাবে সর্ব্বদাই বলিতেন "ক্রমোন্নতিই জগতের নিয়ম। বিজ্ঞানবাদীরা কহিয়া থাকেন পদার্থের বিনাশ নাই; তাহা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া নিয়ত উন্নতির অভিমুখে গমন করিতেছে। মনুষ্যও প্রথমে জড় প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়া, নানা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া সম্ভবতঃ স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। মনুষ্যই জীব মণ্ডলীর শ্রেষ্ঠ। মনুষ্য হইয়া যে আর উন্নতি হয় না, সেই যে চরম উন্নতি এরূপ নহে। প্রকৃতির নিয়মে অবস্থাভেদে মনুষ্যেরও উন্নতি হইয়া থাকে। বাল্যকালে যে ভাব যে অবস্থা থাকে, যৌবনে তাহার উন্নতি হয় এবং বৃদ্ধকালে আর ও উন্নতি হইয়া চিতাশয্যায় চরম উন্নতি বা নির্ব্বাণ পদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। মনুষ্য না মরিলে উন্নতি আর তাহার সঙ্গত্যাগ করেনা।

উন্নতি বিভিন্ন বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকার। তন্মধ্যে কতকগুলি বাহ্যিক চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ হইয়া থাকে; অন্যগুলি কার্য্য বা লক্ষণ দ্বারা প্রকাশিত হয়। মনুষ্য জীবনে এই উভয়বিধ উন্নতিই ঘটিয়া থাকে। ১ম বাহ্যিক বা শারীরিক, ২য় আন্তরিক বা মানসিক ও আধ্যাত্মিক। এই উভয়ের মধ্যে শারীরিক উন্নতি চিহ্ন দ্বারা অবগত হওয়া যায়। শিশু যখন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়, তখন তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি নিতান্ত ক্ষুদ্র থাকে। ক্রমে যত বয়স্ক হয়, ততই তাহার শারীরিক উন্নতি হইতে থাকে—

তাহার বক্ষঃস্থল প্রশস্ত, বাহু যুগল ও পদদ্বয় দীর্ঘ, সবল ও কর্ম্মঠ এবং সর্ব্বাঙ্গই পূর্ণাবয়ব সম্পন্ন হয়। যেমন শারীরিক উন্নতি হয় তৎসঙ্গে মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিও হইতে থাকে। কিন্তু এ উন্নতি বাহ্যদৃষ্টি দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না ; কার্য্য বা লক্ষণ দ্বারা অবগত হওয়া যায়। এ উন্নতিও দুই প্রকার। এক যথার্থ উন্নতি যদ্দ্বারা মনুষ্য পূজনীয় হইতে পারেন, আর দ্বিতীয় চরম উন্নতি—যাহার বলে পদবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ের অধিকাংশ লোকই এই শেষোক্ত উন্নতির উপাসক। ইহারই কৃপায় দ্বিপদ হইতে তাহারা ক্রমে ক্রমে চতুষ্পদ ও ষট্পদ রূপে পরিণত হইয়া থাকে।

চক্ষু দ্বারা এ পদ দেখিতে পাওয়া যায় না। কার্য্য দ্বারাই ইহার সত্ত্বা হৃদয়ঙ্গম হয়। পিতামহ মহাশয় এই স্থলে ন্যায়ের কথা আনিয়া ফেলিতেন; কিন্তু ন্যায়ের কচ্‌কচি তখন ভাল লাগিত না। বিজ্ঞানের গূঢ় রহস্যভেদ করিয়া তাহার মূল সত্য হৃদ্গত হইত না বলিয়া বিজ্ঞানকে বড় নীরস ও অসার বোধ হইত। মনুষ্য আবার কখন নাকি চতুষ্পদ হইতে পারে ও হইয়া থাকে, এই তর্ক ধরিয়া তাঁহার সেই কথা তাঁহার স্বকপোল কল্পিত বলিয়া কতই হাস্য করিতাম। কিন্তু এক্ষণে বয়োধিক্য হওয়ায় পৃথিবীর ভাব গতিক, কার্য্য কারণ সম্বন্ধ দেখিয়া ভূয়োদর্শন বলে জানিতে পারিয়াছি, ন্যায়ের কচ্‌কচিতে সার আছে ; বিজ্ঞান রহস্যে কত মহাসত্য নিহিত রহিয়াছে ; পিতামহের বাক্যও নিতান্ত কাল্পনিক নয়, গভীর উপদেশ পূর্ণ। বাল স্বভাব প্রযুক্ত তখন সে কথার মর্ম্মোভেদ করিয়া সত্যতত্ত্ব বুঝিতে পারি নাই, সেই জন্য হাস্য করিতাম ; এক্ষণে সে কথার প্রতিশব্দের অর্থ স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি ও পারিতেছি। নিজে অসময়ে বুঝিয়াছি, বুঝিয়া বৃক্ষ ভূমিতে পতিত হইলে তাহাকে পূর্ব্ববৎ দণ্ডায়মান রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি ; কিন্তু সে চেষ্টা তত কার্য্য-কারী হইতেছে না। এই জন্য যাহারা অল্প বয়স্ক, বা ভবিষ্যতে জন্ম-গ্রহন করিয়া ভারতের ভাবী উন্নতির জলগণ্ডুষস্থল হইবে, পূর্ব্ব হইতে তাহাদিগকে এই কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতে পারিলে অনেক উপকার হইতে পারিবে ; এই আশায় মুগ্ধ হইয়া মনুষ্যের অবস্থাগত রহস্য ভেদ

করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পাঠক! দেখুন, মনুষ্য দ্বিপদ হইতে কখন কিরূপে চতুষ্পাদ ও কখনই বা ষট্‌পদ রূপ ধারণ করিয়া থাকে।

মাতৃগর্ভ হইতে মনুষ্য যখন ভূমিষ্ট হয় তখন প্রকৃতির নিয়মানুসারে তাহার অধিক নহে, কেবল মাত্র দুই খানি পা দেখিতে পাওয়া যায় ও সেই সময়ে তাহার অঙ্গও অসম্পূর্ণ থাকে। অর্দ্ধাঙ্গ (রাজা জরাসন্ধের মত!) থাকে বলিলেও অসঙ্গত হয় না, বরং শাস্ত্রানুসারে ন্যায় সঙ্গতই হয়। কেননা বিবাহ না করিলে ত আর পূর্ণাঙ্গ সম্পন্ন হইতে পারে না? মনুষ্য যে স্বাভাবিক দ্বিপদ ও জীবশ্রেষ্ট, এবং জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, দয়া, ও পরোপকারিতাদি দেবদুর্লভ গুণসম্পন্ন, ইহারও প্রমাণ সচরাচর এই সময়ে যেমন সুন্দর রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়, অন্য সময়ে সেরূপ পাওয়া যাইতে পারেনা। বাল্যকালে মনের সহিত অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণও সরল থাকে। মন সরল থাকিলে বিশ্বও সরল থাকে। মন রূপ সরল স্বচ্ছ দর্পণে সকল বস্তুতে, সকল জীবে, সকল মনুষ্যে সরলতা ও পবিত্রতার প্রতিবিম্ব পড়ে। এক জন কবি বলিয়াছেন :——

সাধুঃ সাধুময়ং পশ্যেৎ ক্রূরঃ ক্রূরময়ং জগৎ,
দর্পণেন যথা জন্তুঃ স্বীয় মাকারমীক্ষ্যতে।

ফলতঃ বল্যকালের সরলতা স্বর্গীয়, তেমন সরলভাব আর জীবনে কখন দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু কাল পরিবর্ত্তনের সহিত বয়োভেদ ক্রমে সে সরলতারও পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হয়। এবং সরলতার স্থানে ক্রূরতা আসিয়া পড়ে। বয়োবৃদ্ধির সহিত সকলেই যে, ক্রূরভাব প্রাপ্ত হন, আমরা একথা বলিতেছি না, অনেকে যে বর্জ্জিত বিধির অন্তর্গত ও সরল থাকেন তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু সে সরলতায় ও বাল্যকালের সরল সরলতায় লক্ষৈক যোজন অন্তর! বাল্যকালে একদিন যাহাকে সরল ও পবিত্রভাবপূর্ণ প্রকৃত মনুষ্য বলিয়া জ্ঞান ছিল; আজি কালবশে যৌবন সময়ে তাহাকে দিব্য চক্ষে যেন চতুষ্পদ বলিয়া জ্ঞান জন্মিতে লাগিল। বাস্তবিক জগতের ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে সেই দ্বিপদ মনুষ্য এক্ষণে চতুষ্পদ—অনেকে প্রকৃতই চতুষ্পাদ, দিগ্বিদিক্ জ্ঞান শূন্য—মনুষ্য নামের অযোগ্য হইয়া পড়িল! মনুষ্য মনুষ্যত্ব হীন হইয়া গেল!!

যৌবনকাল বড় ভয়ানক কাল। মনুষ্য-জীবনে এমন ভীষন পরীক্ষার সময় আর নাই। এই সময়ে মন, হাঙ্গর, কুম্ভীর ও নক্রাদি ভীষণ জল জন্তু পরিপূর্ণ প্রবল ঊর্ম্মিমালাসঙ্কুল অর্ণব মধ্যে দোদুল্যমান অর্ণবের তুল্য গতিবিশিষ্ট হয়। সর্ব্বদাই চঞ্চল, অনবরতই টল মল করিতে থাকে। একবার যেন ডুবিয়া যাইতেছে, আর বার উঠিতেছে; পরক্ষণে ডুবিয়া ডুবিয়া চলিতেছে বলিয়া বোধ হয়। যিনি বহুদর্শী, ধর্ম্মজ্ঞ, নীতিশীল কর্ণাধার হন, তিনি এই সংসার-সমুদ্রের ঘোর তুফানে ধৈর্য্য সহিষ্ণুতার সহিত মনকে স্থির রাখিয়া নিরাপদে স্বীয় গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে পারেন। তাঁহারই মনুষ্য-জীবন সার্থক; তিনিই মনুষ্য নামের প্রকৃত অধিকারী; দ্বিপদ মনুষ্য নামে যে কিছু গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব আছে, তাহার পরিচয় তাঁহাতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্যথা যিনি ধর্ম্ম ও নীতিহীন; যাহার কর্ণ উৎকৃষ্ট নহে, পরন্তু ভঙ্গপ্রবন তিনি সমুদ্রে কর্ণহীন ও বিপথগামী হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে অতল জলে নিমগ্ন হইয়া যান; আর উঠিতে পারেন না। এরূপ মনুষ্যই যদি চতুষ্পাদ শ্রেণীর অন্তর্ভূত না হয়, তবে সংসারে আর চতুষ্পাদ মনুষ্য বলিয়া কে অভিহিত হইতে পারে? লোকে আক্কেলকেই কি চতুষ্পাদ বলে না?

দিব্যচক্ষে যৌবন সময়ে এই সকল মনুষ্যেরই পদবৃদ্ধি হইতে দেখা যায়! এই পদবৃদ্ধি সাধারণতঃ শক্তিরূপিনী স্ত্রীজাতির অনুগ্রহ বা শক্তিবলেই হইয়া থাকে। বিবাহদ্বারাই এই চতুষ্পদত্ব লাভ হয়। বাল্যকালে পুরুষ দ্বিপদ ও অর্দ্ধাঙ্গ-বিশিষ্ট ছিল, কিন্তু যখন চতুর্দ্দিকেই প্রতিনিয়ত উন্নতি হইতেছে তখন সেই উন্নতিশীল পৃথিবীর মধ্যে থাকিয়া চিরকাল অর্দ্ধাঙ্গ হইয়া বাস করা ভাল দেখায় না বলিয়া পুরুষের সংসারী ও উন্নতিশীল হইতে বাসনা জন্মিল। অমনি বিবাহ করিয়া অর্দ্ধাঙ্গিনীর কৃপায় অর্দ্ধ অঙ্গে অর্দ্ধ অঙ্গ মিলাইয়া পূর্ণ এক অঙ্গ প্রাপ্ত ও তৎসঙ্গে পূর্ব্বে দুইটী চরণ ছিল, এক্ষণে আর দুইটী চরণের যোগ হওয়ায় চারি চরণ বা স্থূল কথায় "চতুষ্পদ" এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। এই স্থলেই উন্নতির বীজ রোপিত হইল! এস্থলে ন্যায় শাস্ত্র প্রিয় অনেক পাঠক হয়তঃ এই বলিয়া আপত্তি করিতে পারেন, বিবাহ দ্বারা পুরুষ যদি চতুষ্পদত্ব লাভ করিলেন, তবে চতুর্হস্তত্ব লাভ

কেমনা করিবেন? সে বিষয়েরও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। যদি এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত হয়, (উত্থাপিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা!) তবে পূর্ব্ব হইতেই তাহার মীমাংসা করিয়া রাখা কর্ত্তব্য হইতেছে। আমরা বলি নদীর কখন একবারে দুই কুল ভঙ্গ হয় না। এককুল ভাঙ্গিতে থাকে, অন্য কুল ভরাট্ হইতে আরম্ভ হয়। দম্পাতির পক্ষেও এই নিয়ম। পুরুষই যে কেবল চতুষ্পদ, চতুর্হস্ত লাভ করিবেন, আর স্ত্রীর কিছুই লাভ হইবেনা এরূপ কখন হইতে পারে না। পরম কারুণিক পরমেশ্বর পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার দৃষ্টি সকলের উপরই সমান। তাঁহার বিচারে পুরুষ-ভাগ্যে চরণ আসিয়া পড়ে, আর স্ত্রীর অংশে হস্ত যায়। অর্থাৎ পুরুষ চতুষ্পাদ হন, আর স্ত্রী চতুর্হস্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এ কথার ভাষ্য এই, টীকা-কারেরা ইহার এইরূপ অর্থ করেন যে, পুরুষ যদি চতুষ্পাদ হইল তবে স্ত্রীর আর চরণ থাকিল না। চরণ না থাকিলেই আর তাঁহাকে কিছুই করিতে হয় না; তিনি সংসারে শালগ্রামশিলা হইয়া পড়েন! আর পুরুষের হস্তলোপ হওয়ায় তিনি জগন্নাথ হন। সংসারের আর কোন কার্য্যই তাঁহার স্বক্ষমতায় করিবার ক্ষমতা থাকেনা। সকলই স্ত্রীর হস্তাধীন। স্ত্রী তখন সংসারে চতুর্হস্তধারণী (১) সর্ব্বময়ী দেবী হন, আর পুরুষ তাঁহার অনুগ্রহ লাভের কামনা করেন! কেমন ন্যায় শাস্ত্র প্রিয় পাঠক! আপনার উত্থাপিত তর্কের এ মীমাংসা কি ন্যায় সঙ্গত হইল না?

সূক্ষ্ম রূপে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে সকল বিবাহিত মনুষ্যই চতুষ্পদ হইতে পারেন! কেবল কয়েকজন এ বিধি বর্জ্জিত। এ কথায় অনেক অপরিনামদর্শী ব্যক্তিরা আমাদের উপর ক্রুদ্ধ হইতে পারেন এবং হইবেন সত্য; কিন্তু বলা কর্ত্তব্য এ যুক্তি আমাদের নহে। ইহা পূজনীয় পিতামহের যুক্তি। তিনি ন্যায় শাস্ত্রে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন; তাঁহার যুক্তি অখণ্ডনীয়। তবে তিনি ইহাও উপদেশ দিয়াছেন চতুষ্পদ বলিলেই যে পুচ্ছবান বুঝাইবে এরূপ নহে। কতকগুলির পুচ্ছ আছে কি না আছে, কতকগুলির পুচ্ছ আছে কিন্তু গোপণীয় আর কতকগুলির পুচ্ছ বাহির হইয়া পড়ে। যাহাদের পুচ্ছ বাহির হইয়া পড়ে, তাহারাই

(১) দুই হস্ত শতমুখী ধারণের জন্য বুঝি?

প্রকৃত চতুষ্পদ তাহারাই প্রকৃত উন্নতিশীল। নতুবা অন্যান্যেরা অধ্যাসের অন্তর্গত মাত্র। যাহা হউক, আজি কাল অস্মদ্ সমাজে প্রকৃত চতুষ্পদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। কবে তাঁহারা তাঁহাদের স্ব স্ব নামের কলঙ্ক দূর করিয়া জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্য বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিতে পারিবেন? সে দিন কতদিনে আসিবে?

চতুষ্পদ অনেক জাতীয় আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি দাঁতাল, কতকগুলি সিংঙ্গেল (শৃঙ্গবিশিষ্ট) আবার আর গুলি শৃঙ্গ সত্ত্বেও শৃঙ্গহীন। এই শেষোক্তই মেষ জাতীয়। আতপ তণ্ডুলের উপর ইহাদের বড়ই লোভ! আতপ-তণ্ডুল পাইলে আর ইহাদের দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকে না! অশিক্ষিতা, ধর্ম্ম ও নীতিহীনা অর্দ্ধাঙ্গিনীরা এই সম্প্রদায়কে যথার্থই মেষ বানাইয়া থাকে। উপকথায় শুনিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বে রাজকন্যারা কত রাজপুত্র-গণকে মেষ করিয়া রাখিতেন। সে মেষ এরূপ! ইহাদিগকে স্ত্রী, কর্ণ ধরিয়া যে দিকে লইয়া যান, ইহারা বাঙ্নিষ্পত্তি না করিয়া সেই দিকে গমন করিয়া থাকে। বাল্যকালে যাহাদিগকে স্বর্গ হইতেও উচ্চ, পৃথিবী হইতেও গরীয়সী বলিয়া জ্ঞান ছিল, সেই পরম গুরু পরমারাধ্য পরম পুজনীয় পিতা মাতাকে এ উন্নতির অবস্থায় আর গুরু বলিয়া জ্ঞান হয় না; স্ত্রীই পরম গুরুর স্থান অধিকার করিয়া থাকে। স্ত্রী তখন সংসার সমুদ্রের দিক্-নিরূপণকারী দিগ্দর্শণ যন্ত্র হন। ধিক্ এই সকল কুল পাংশুল পুত্রগণকে!

এইরূপ কত কুপুত্রের গুণে যে আজ কাল বঙ্গ সমাজে কত পিতা মাতা বৃদ্ধ কালে সুখে জলাঞ্জলি দিয়া নিয়ত পরিতাপ করিতেছেন, তাহার সংখ্যা নাই। হা, ধিক্! যে পিতা মাতা হইতে পৃথিবীর মুখদর্শন হইয়াছে, যাহাদের কৃপাগুণে দেহ এত বড় হইয়াছে; সেই পিতা মাতার প্রতি পশুবৎ আচরণ করা কি অল্প নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য? এই সকল মনুষ্যেরা দ্বিপদ হইয়াও যদি চতুষ্পদ শ্রেণীভুক্ত না হন, তবে পৃথিবীতে আর চতুষ্পদ নাই! বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্ মহাত্মা ডারউইন্ সাহেব বোধ হয় এই রূপ ব্যক্তিগণের আচার ব্যবহার দর্শন করিয়াই তাঁহার নূতন সেই আবিষ্করণটি করিয়াছেন! তিনি ভ্রমে পতিত হন নাই; যথার্থ কথাই বলিয়াছেন। সমগ্র মনুষ্য-জাতি না হউক, অনেকের উৎপত্তি যে, ইতর জাতীয় জীব হইতে হইয়াছে,

আচার ব্যবহার ও কার্য্যকলাপাদিতে তাহার সুন্দর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

এইখানেই উন্নতির শেষ হইল না। অতঃপর আরও উন্নতি আছে। যৌবনে চতুষ্পদের ন্যায় হইয়া রাম প্রসাদ সেনের সেই "চোক্ ঢাকা বলদের ন্যায়" ঘানির চতুর্দ্দিগে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে থাকেন। এইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে কেহ কেহ একদিন চক্ষু মুক্ত হইয়া দেখিলেন যে স্ত্রীর ভাগ্য-বলে পুন্নাম-নরক-উদ্ধার হইবার উপায় স্বরূপ একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। এইখানেই উন্নতি বৃক্ষ ফল ভরে অবনত হইয়া পড়িল! মানুষ চতুষ্পদ ছিল, উন্নতির আর এক ধাপ উপরে উঠিয়া ষট্‌পদ হইয়া গেল। অনেকে বলিতে পারেন, চতুষ্পদ প্রকাণ্ড শরীর বিশিষ্ট, আর ষট্‌পদ ক্ষুদ্র প্রাণী, যদি ষট্‌পদ হইল তবে বৃহৎ আকার হইতে ক্ষুদ্র আকারে আসিয়া উন্নতি হইল না, অবনতি হইল? এ আপত্তির খণ্ডনার্থ আমাদিগকে বলিতে হইতেছে, আমরা বাহ্যিক উন্নতির কথা ত বলিতেছি না। গুণ বা কার্য্য গত উন্নতির কথাই বরাবর বলিয়া আসিতেছি। চতুষ্পদ যদিও বৃহৎ শরীর বিশিষ্ট সত্য বটে, কিন্তু তাহার উপরে উঠিবার ক্ষমতা নাই। কেবল ঘুরিয়া ফিরিয়া পৃথিবীর উপর "গোঁজের গোড়ায়" বেড়াইতে হয়! আর ষট্‌পদ পৃথিবী ত্যাগ করিয়া উপরে উঠিয়া "ভোঁ ভোঁ" করিয়া উড়িতে পারে। যে উড়িয়া উপরে উঠিতে পারিল তাহারই উন্নতি কি অধিক বলা অধিক সম্ভবপর নহে? যৌবন সময়ে মানুষ "গোঁজের" চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইত, এক্ষণে তাহাকে সন্তান প্রতিপালনের জন্য মধু বা রস সংগ্রহ করিতে হইবে। আর কি নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিতে পারে? এজন্য তাহাকে উড়িতে হইল! মনুষ্য-জীবনে ইহা অপেক্ষা উন্নতি আর কি আছে?

ষট্‌পদও এক জাতীয় নহে, বহু জাতীয় তন্মধ্যে মক্ষিকা ও উর্ণনাভই শ্রেষ্ট বলিয়া গণণীয়। মক্ষিকা প্রৌঢ়েরা আর বৃদ্ধেরা উর্ণনাভের শ্রেণীভুক্ত। ক্রমশঃ এ কথার অর্থ বিশদ করিয়া দিতেছি। প্রথম ভ্রমর সম্বন্ধে প্রৌঢ় ব্যক্তিগণের সহিত কিরূপ তুলনা হইতে পারে দেখা আবশ্যক। মাছি তিন প্রকার। ১ম গুবরে মাছি; ২য় দেশী মাছি এবং ৩য় মধু মক্ষি।

গুবরে মাছিরা কেবল আলোকনির্ব্বাণ অর্থাৎ পরের অনিষ্ট করিতেই তৎপর, এই তাহাদের গুণ! দেশী মাছিরা দোষ গুণে জড়িত, দোষের ভাগই অধিক। ইহারা কেবল ভ্যান্ ভ্যান্ করিয়া কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সেই বহু যত্নের কাঁটালের উপর বসিয়া রস প্রার্থনা করিয়া থাকেন। ফল, এই শ্রেণী কেবল পরের কাঁটাল ভাঙ্গিতেই সুদক্ষ! আর মধুমক্ষিকারা প্রৌঢ়গণের মধ্যে যাহারা পরিশ্রমী, উপার্জ্জনক্ষম, পরমুখ প্রত্যাশী নহেন তাঁহারাই। ইহাঁদের গুণের ভাগই অধিক এবং ইহাঁরা মধুচক্র পরিত্যাগ করিয়া উড়িয়া বহুদূর দেশে যাইয়া মধু সংগ্রহ পূর্ব্বক পুনরায় মধুচক্রে আসিয়া সেই সঞ্চিৎ মধু নির্ব্বিবাদে ভোজন করিয়া থাকেন। বলিতে কি মক্ষিকার মধ্যে মধুমক্ষিকারাই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু শ্রেষ্ঠ হইলেও মধুচক্র ত্যাগ করিতে পারেন না। চক্রে থাকিয়া চক্রে পড়িয়াই তাঁহার কাল অতিবাহিত করেন।

অতঃপর প্রৌঢ়কাল গত হইয়া মনুষ্যের বার্দ্ধক্য কাল আসিয়া উপস্থিত হয়। এই সময়ে আর উড়িবার সামর্থ থাকে না। পক্ষ লোপ হইয়া যায়। তখন উর্ণনাভ হইয়া লূতাজাল বিস্তার করিয়া একস্থানে স্থির হইয়া বসিয়া থাকেন। এবং দৈবক্রমে যদি কোন হতভাগ্য জীব আসিয়া জালে পতিত হয়, অমনি তাহাকে উদরসাৎ করিয়া নিজের ও পরিবার বর্গের জঠরানল শান্ত করিয়া থাকেন। এই সময়ে যিনি মনুষ্য জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন, তিনি লূতাজাল ছিন্ন করিয়া একদিকে চলিয়া যান অর্থাৎ সংসারে বদ্ধ থাকেন না। আর যদি উন্নতি ভুলিতে না পারেন, পূর্ব্বের ন্যায় উন্নতিপ্রিয়ই থাকেন, তবে আপনার জালে আপনই পতিত ও জড়িত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হন। এবং চিতাশয্যায় শয়ন করিয়া চরম উন্নতি বা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পাঠক! এক্ষণে কি মনুষ্যের অবস্থাগত রহস্যের মর্ম্মভেদ করিতে সক্ষম হইলেন?

এই স্থলেই বৃদ্ধ পিতামহের উপদেশ শেষ হইল। এই উপদেশে যদি কাহারও চৈতন্যোদয় হয়, তবে পিতামহের নাম অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকিবে। উপসংহারে বক্তব্য, দ্বিপদ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া আমাদের দ্বিপদের ন্যায় কার্য্য করাই কর্ত্তব্য; চতুষ্পাদ হইলে সকল দিক্

নষ্ট হয়। ইহকালে জনসমাজে ঘৃণিত ও পরকালে তাহার ফলভোগ করিতে হয়। এ অবস্থায় কোন্ পথ অবলম্বন করা আমাদের কর্ত্তব্য?

শ্রী বিঃ——— চট্টোপাধ্যায়।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

বিজন বাসিনী। (নবন্যাস) কলিকাতা বাগবাজার হইতে শ্রীমতী শতদল বাসিনী দেবী কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। টালা, চট্টোপাধ্যায় চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোম্পানির নীলকণ্ঠ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

নবন্যাস, উপন্যাস, নাটক, ও গীতিকাব্যে বঙ্গ প্লাবিত। সমালোচক মহা বিপদগ্রস্ত, এই সমস্ত নরককুণ্ড হইতে যে কি করিয়া রত্ন বাছিয়া লইবে ভাবিয়া আকুল। আজ কাল বর্ণপরিচয় হইবা মাত্রই পুস্তক লিখিবার স্পৃহা জন্মে। শুদ্ধ বালক নয়—সুকুমার মতী বালিকারা পর্য্যন্ত এ রোগে আক্রান্তা। সে কথায় আর এখন কি হইবে, যখন সমালোচনা করিতে বসিয়াছি তখন অগ্র হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত আস্বাদন করিতে হইবে, কিন্তু ভাগ্য দোষে নিম্বই আমাদের কপালে ঘটিয়া থাকে। আজি এক শ্রীমতীর পুস্তক সমালোচনে অগ্রসর হইয়াছি, জানি না যে মনোরঞ্জন করিতে পারিব, কি দেবীর কোপ দৃষ্টিতে পতিত হইয়া ভস্ম হইয়া যাইব। শুনিয়াছি স্ত্রীলোকের ক্ষমা গুণ অসীম, তাহাই আমাদের নিরাশার অকূল সাগরের ভগ্ন তরি।

যখন সমালোচনা করিব, তখন স্ত্রীপুরুষ বিচার কেন? যাঁহারা প্রকাশ্যে আমাদের উপদেষ্টা হইতে চাহেন, তাঁহাদের আবার শ্রেণী বিভাগ কেন? সুতরাং বিজনবাসিনী কোন পুরুষ কর্ত্তৃক লিখিত হইলে যেরূপ পক্ষপাত শূন্য হইয়া সমালোচনা করিতাম, ইহাও তদ্রূপ করিব।

গ্রন্থকর্ত্রী বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন "পুস্তক মুদ্রাঙ্কন প্রায় ব্যবসার মাত্র, * * * আমি তদ্রূপ ব্যবসাবলম্বিনী সন্দেহ নাই।" প্রকৃতই আমরা এ রুচির প্রসংশা করি না। পুস্তক লেখা ব্যবসা মাত্র এ ধারণা যতদিনে করকণ্ডুয়ন রোগাক্রান্ত ব্যবসায়ীগণের হৃদয় হইতে দুরীভূত না হইতেছ, ততদিনে প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি হইবে না! সাধারণে এক এক খণ্ড "বিজনবাসিনী" ক্রয় করিয়া গ্রন্থ প্রণেত্রীর ব্যবসা ফালাও করুন, আর গ্রন্থকর্ত্রীর জীবনোপায়ের অন্য উপায় নাই বলিয়া, যদি পরোপকারে ধর্ম্ম থাকে, অন্নহীনকে অন্ন ও বস্ত্রহীনকে বসন দেওয়া যদ্যপি সাধু সম্মত হয়, তাহা হইলে [গ্রন্থকর্ত্রীর] সহৃদয় মহোদয়গণ এক এক খানি বিজন বাসিনী গ্রহণ করিয়া তাঁহার চির মনোরথ সুসিদ্ধ করিয়া গ্রন্থকর্ত্রীকে যারপর নাই কৃতার্থ করুন, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু আমরা এ মতের অনুমোদনকারী নহি; ইহাতে বক্তি বিশেষের উপকার হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে সাহিত্যের উপকার নাই, পরিশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার নাই। আমার অর্থ নাই বলিয়া একটি ছাই ভস্ম লিখিলাম, সাধারণে কেন আমার প্রতি কৃপা করিয়া তাহা ক্রয় করিবে? বিজনবাসিনী ক্রয় যদ্যপি এক প্রকারে দান হয়, তবে দানের ত আরও উপায় আছে—পথও আছে।

আমরা যে বিজনবাসিনী সম্বন্ধে এত কথা বলিলাম তাহা নহে, গ্রন্থকর্ত্রীর মনের ভাবকে বলিলাম। বিজন বাসিনীর যদ্যপি গুণ থাকে, তাহা হইলে বিজন বাসিনী বিক্রয়ের জন্য ভাবিতে হইবে কেন? আপনা হইতে বিনা বিজ্ঞাপনে সহস্র সহস্র খণ্ড বিক্রীত হইবে।

বিজন বাসিনীর ঘটনা বৈচিত্র মন্দ নহে, ভাষা সরল এবং রচয়িত্রী শীক্ষিতা। তিনি পুরুষের কঠিন হৃদয়তা ও কামিনী কুলের দুরবস্থা যাহা সচরাচর আমাদের নয়ন পথে পতিত হয় তাহা অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সংক্ষেপে—আমরা বিজনবাসিনী পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। কিন্তু উপদেশ ছলে গ্রন্থকর্ত্রীকে গুটিকত কথা বলিব——তাঁহার পুস্তকের স্থানে স্থানে ভাষা জটিল ও দোষযুক্ত হইয়াছে, আশা করি অতঃপর তিনি তাহাতে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। আর এক কথা—পুরুষ যাহাই লিখুক, কামিনী গণের ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। বঙ্কিম বাবুর পুস্তকে রসের

তরঙ্গ উঠে বলিয়া, যে শতদল বাসিনী তাঁহার পুস্তকে সেইরূপ রস তরঙ্গ খেলাইতে চেষ্টা করিবেন, এ রুচির আমরা কখনই পক্ষপাতি হইব না। বিজন বাসিনীর গুটিকত গীত বড় মিষ্ট হইয়াছে, মনে করিয়াছিলাম পাঠকগণকে উপহার দিব, কিন্তু স্থানাভাব—পাঠকগণ আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। আর গ্রন্থকর্ত্রীও আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন, কেন না আমরা তাঁহার পুস্তকের ইহা অপেক্ষা বিস্তৃত সমালোচনা করিতে পারিলাম না, তাহারও কারণ—স্থানাভাব। বিজনবাসিনীতে ভাল বলিবার এখনও অনেক বস্তু আছে। কিন্তু আরও অধিক প্রসংশা করিতে বঙ্গদর্শন সম্পাদকের ন্যায় আমাদেরও ভয় হইতেছে—পাছে উৎসাহ দিলে গৃহিনীর দল, গৃহ কর্ম্ম ছাড়িয়া সকলেই কাগজ কলম লইয়া বসেন! তাহা হইলে গরিব পুরুষের দল এক মুঠা অন্ন পাইবে না।

আদরের আর একটুকু। [প্রিয়তমার প্রতি—আলিঙ্গন করিয়া] কলিকাতা।

আমরা ইহা পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। গ্রন্থকারের মানসিক ভাব যেন আপনা হইতে প্রকাশ পাইয়াছে। রুচি প্রসংশনীয় বটে,—কিন্তু এক কথা,—প্রিয়তমাকে আলিঙ্গন করিয়া ডিমাই চারি ফর্ম্মা পদ্য আওড়াইলে প্রিয়তমা হাঁফাইয়া উঠিবেন না ত?

শিব-গৌরী। এখানি পৌরানিক চিত্র। শুকদেবের জন্ম লইয়া ইহা চিত্রিত। একটী বৃক্ষমূলে তাম্পুরা হস্তে মহাদেব, বেদ গান করিতেছেন, বাম পার্শ্বে বসিয়া গৌরী তাহা শ্রবণ করিতেছেন। একদিকে সুসজ্জিত বৃষ, ও অপর দিকে ত্রিশূল হস্তে নন্দী, প্রহরায় নিযুক্ত।

ইহা অতি পারিপাট্যের সহিত চিত্রিত, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে চিত্রটীর প্রসংশা করিতেছি।

সুখী কে ?

পাঠক ! এই পাঞ্চভৌতিক জড় জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া এ বিশ্বসংসারে কে সুখী ? স্বীকার করি যে, প্রাণিমাত্রেই সুখাভিলাষী প্রাণিমাত্রেই সুখের জন্য লালায়িত, কিন্তু প্রকৃতই তাহাদের মধ্যে সুখী কে ? সংসারে বোধ হয় সুখ আছে, যদ্যপি সুখ না থাকিত, তাহা হইলে প্রাণিমাত্রেই কেন জীবিত থাকিতে চায় ? যদি জীবিত থাকিতে বাসনাই সুখের কারণ হয়, তাহা হইলে প্রত্যেকে কেন না সুখী ? এ সংসারে, এ পর্য্যন্ত এমন লোক ত দেখি নাই যে, একমনে মরিতে চায় ; কিন্তু এই সমস্ত দীর্ঘজীবনপ্রত্যাশী লোক কেন হয়, তাহাদের জীবনাকাঙ্ক্ষার উদ্দেশ্য—সুখ না সুখভোগলালসা ?

ক্রন্দন দুঃখজ্ঞাপক। বালক জন্ম গ্রহণ করিয়াই কাঁদে। ক্রমশঃ তাহার বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, কিন্তু ক্রন্দন থামিল না। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, অনিচ্ছায়—ক্রন্দন। আবার যখন কিঞ্চিৎ জ্ঞানের উন্মেষ হইল, তখন আশা বাড়িল, কিন্তু আশার নামই বুঝি ক্রন্দন ! মাতার ক্রোড়ে যাইতে ক্রন্দন, পিতার মুখ চুম্বন করিতে রোদন,—চাঁদ ডাকিয়া তাহাকে না পাইলেও সেই রোদন। সাধারণতঃ লোকের ধারণা আছে যে বালকেই সুখী, সাংসারিক কোন চিন্তা নাই, খায় দায় থাকে। কিন্তু আমরা এ ধারণার বিরোধী, বালক যদি সুখী, তবে সে কাঁদে কেন ? বালক মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে যাহা চায় তাহা পায় না কেন ? তবে এই টুকু সত্য যে বালকের জ্ঞান অল্প, সংসার চিন্তার কোন ধার ধারে না, কিন্তু তাই বলিয়া বালক সুখী নহে। সংসার চিন্তার বিরতি ও হাসি কান্নার ক্ষণ পরিবর্ত্তনই যদ্যপি সুখের কারণ হয়, তাহা হইলে বালক কেন, পাগলও সুখী। কেহ কেহ হয় ত বলিবেন "পাগল ত সুখীই" কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, তাঁহারা পাগল হইয়া সেইরূপ সুখী হইতে কি বাসনা করেন ?

তাহার পরেই কৌমারাবস্থা, "লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি" পঞ্চ বৎসর

পর্য্যন্ত লালন, কিন্তু এ লালন স্বরূপ পিতা মাতা পরিজনবর্গের সোহাগে বালক কত কাঁদিল, তাহার পরেই মর্ম্মভেদী তাড়না। ঘরে বাহিরে তাড়না আরম্ভ হইল, এখন বালক পাঠশালার ভয়ে জড়সড়। প্রাতঃকাল হইলে পীড়া আরম্ভ হয়, সময়ানুসারে সারিয়া যায়। বালকে বালকে দ্বন্দ, গুরু মহাশয়ের বেত্র ইত্যাদি এ অবস্থার দুঃখের কারণ হইয়া উঠে,—পরে যৌবন। এখন জীবনের বৎসরে বসন্ত বিরাজমান, এখন সাহস, উৎসাহ, স্ফূর্ত্তি, উদ্যম অসীম। কিন্তু হইলে হবে কি? হয়ত এই সময়ে ঘোরতর বিপদে পতিত হইলে, হয়ত বিবাহিত হইয়া পত্নী প্রেমে বঞ্চিত হইলে, হয়ত অন্ন চিন্তা ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। যে বাল্য দুঃখময় ভাবিতে, যে যৌবনে পদার্পন করিতে কত উৎসুক হইতে, আজি আবার সেই যৌবন ত্যাগ করিয়া বাল্যাবস্থা তোমার একান্ত স্পৃহনীয় হইয়া উঠিল। ক্রমে যৌবন জীবনের সহিত ঘোরতর আহব চলিল; স্বধু জীবনের সহিত নহে, সমগ্র সংসারের সহিত। সংসার শত সহস্র বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল, তুমি প্রাণে ব্যাকুল হইতে আরম্ভ হইলে। এই রূপে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত কাটিয়া তোমার জীবদ্দশার শেষ হইল। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের মধ্যে, এই দাহ্যমান সংসারের ঘোরতর ঘনান্ধকারময়ী চিন্তার মধ্যে আবার কত আত্মীয়-বিরহজনিত ব্যথা পাইয়া মর্ম্মাহত হইলে।

এই ত সাধারণ জীবনের চিত্র, তাহার পরে আবার একবার সংসারের প্রতি অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে রাজা রাজ্য চিন্তায় আকুল, তাহার জীবন্ত দৃশ্য—রুশ। অতুল সাম্রাজ্য সত্ত্বেও প্রাণ ভয়ে আকুল। প্রাণ রক্ষার জন্য বিব্রত। তবে আর তাহাকে কি করিয়া সুখী বলিব? তাহার অতুল ঐশ্বর্য্যের আর কি করিয়া হিংসা করিব। তাহার পর আবার দেখ—সিংহ অবতার নেপোলিয়ান বোনাপার্টী। নেপোলিয়ান স্বয়ং সমস্ত ইউরোপ প্রকম্পিত করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার পরিণাম স্মরণ কর, প্রাণ কাঁপিয়া উঠিবে। সেই অসমসাহসিক অথচ হতভাগ্য জীবনের সমাধি হইল—অজ্ঞাত দ্বীপে। আবার এক সোপান নামিয়া আইস দেখ সিরাজ—মির্জাফরকেও দেখ, আবার সেদিনের বরোদারাজের প্রতিও দৃষ্টি কর। তাহার পর সাধারণ জীবনে কত প্রকার পতন হইতেছে, তাহার স্থির করা

সাধারণ নহে, ঐ দেখ পতিহীনা যুবতী কাঁদিতেছে, ঐ দেখ পুত্রহীনা মাতা রোরুদ্যমানা, বিরহিণী সজলনয়না। কেহ বা মাতৃ বিয়োগবিধুর। কাহার সহোদর বিচ্ছেদ, কেহ বা সহোদর কর্ত্তৃক হৃত সর্ব্বস্ব বা প্রবঞ্চিত হইয়া বিকল প্রাণ।

দেখ সুখের আশায় আয়েষা জগৎ সিংহকে ভাল বাসিয়াছিল, আবার ওসমান সুখী হইতে আয়েষার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইল। এ সমস্ত ত সংসারে সচরাচর ঘটিয়া থাকে,—দেখ সূর্য্যমুখী সুখিনী হইতে নগেন্দ্রের কুন্দনন্দিনীর সহিত বিবাহ দিল, কুন্দও সুখপ্রত্যাশিনী হইয়া সূর্য্যমুখীর সর্ব্বস্বধন নগেন্দ্রকে আত্ম সমর্পণ করিল। কিন্তু সুখ দেখ—সূর্য্যমুখী দেশ-ত্যাগিণী হইয়া সুখভোগ করিল! কুন্দ প্রাণত্যাগ করিয়া সুখের সীমান্ত করিল। তাই বলি, মানব, তোমার ভাগ্যপটত সদত ঘনঘটাতমসাচ্ছাদিত, মধ্যে মধ্য ক্ষণিক দামিনী বিকাশ হয় বইত নয়, তবে তোমার সুখ কোথায়? সুখের জ্বলন্ত আশা মাত্রই সার!

আবার দেখ ঐ পর্ব্বত গুহায় নির্জ্জনে বসিয়া যোগী যোগে মগ্ন, সংসার চিন্তা বিরত, কিন্তু ইহাও সুখের পথপ্রদর্শক নহে, তাহার হৃদয়ে এক ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ভয়ঙ্কর ঔৎসুক্য আছে, তাহার পরিতৃপ্তির জন্য যোগী লালায়িত, সুতরাং অসুখী।

তবে সুখী কে? ঐ দেখ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া উদরাগ্নি নির্ব্বাণের জন্য যে লালায়িত, তাহার যেমন অন্ন চিন্তা দুঃখ প্রদান করে, আবার অতুল ঐশ্বর্য্যশালী নৃপতি তাহার রাজ্যচিন্তায় সেইরূপ বা ততো-ধিক ব্যাকুল, কেহ অপুত্রক বলিয়া দুঃখ করিতেছে, কেহ বা পুত্র রত্ন হারাইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। জামাতাকে লইয়া সুখী হইবে বলিয়া কন্যার বিবাহ দিলে, কন্যা বিধবা হইল। কেহ অবিবাহিত বলিয়া বিষাদিত, কেহ বা পত্নীর বাক্যবাণবিদগ্ধ। এই চিত্র সংসারের যথাতথা, তবে কাহাকে সুখী বলিব? এ সংসারে বুঝি তবে সুখ নাই। রাজা হইতে ভিখারী পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখ, প্রত্যেকেরই এক একটী ভীষণ যাতনা বা দুঃখ আছে, সেই দুঃখে সে ব্যথিত। তাই বলি সংসারে সুখ নাই, সংসারে কেহই সুখী নহে!

তবে মনুষ্য কি জন্য দীর্ঘ জীবন কামনা করে? কি নিমিত্ত পিতা মাতা পুত্র কন্যাকে আয়ুষ্মন্ বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। যদি সংসারে সুখ নাই, যদি দুঃখই আমাদের একমাত্র নিয়ন্তা,তবে কি সুখাভিলাষে সংসারে স্থায়িত্ব কামনা করি? সুখের নিমিত্ত নহে, তবে কি সুখাভিলাষ না সুখানুসন্ধানে? যাহাই হউক মনুষ্য। তোমার ধৈর্য্য গুণ আকাঙ্ক্ষা ও আশাকে ধন্যবাদ দি। যখন সুখ পাইবার প্রত্যাশায় এত দীর্ঘ জীবন কামনা কর, না জানি সুখ পাইলে তোমরা কি করিতে। ভ্রমান্ধ মানব, তোমার কার্য্যে বলি হারি, তোমার অসাধারণ সহ্য গুণকেও বলিহারি।

দুটি ফুল।

(১)

এই যে সুরম্য আহা ভবের কাননে.
একটি বৃন্তেতে দুটি কুসুম সুন্দর,
ফুটিয়া আছিল মরি হরষিত মনে,
কোথা আজি সে সুন্দর ফুল মনোহর?
শোভাহীন করি এই সুন্দর কানন,
ছিঁড়েছে কি কেহ তায় নিষ্ঠুর অন্তরে.
এ জনমে আর কিরে কাহার নয়ন:
দেখিবেনা সে সুন্দর কুসুমের থরে?
কেমনে নিষ্ঠুর মনে, আহা মরি অযতনে,
ছিঁড়িয়াছে তাহাদের পাষাণ অন্তরে?

(২)

এই না একটী তার পড়িয়া হেথায়,
কোথায় তোমার ফুল চির সহচরী?
হারায়েকে তারে হৃদি দহিতেছে হায়;
কাঁদিছ বিরলে তাই দিবস শর্ব্বরী?

এক কালে তোমাদের ছিল মনোহর,
শোভার মাধুরী, আহা প্রেমের জীবন ;
কেমনে বিষাদময় হইল অন্তর,
বিচ্ছেদে দহিয়া এবে কাঁদ অনুক্ষণ ?
জীবনের ভালবাসা, সেই সে মধুর আশা,
কেমনেতে চির তরে হইল নিধন ?

(৩)

দুইটী কোরক আহা একই কালেতে
হয়েছিল বিকশিত সহ পরিমল ;
দুইটিই পুনঃ মরি এক সমীরেতে,
করিত আনন্দে ধীরে নাচি টল টল ;
ও ভয়ে হেরিত শশী উভয়ে কাঁদিত,
উভয়ে মুদিয়া আঁখি করিত শয়ন :
এক (ই) প্রভঞ্জনে উভে হইত শঙ্কিত,
যুগলেই যুগলের নয়ন নন্দন ;
ওরে বিধি কোন মনে, সে যুগলে অকারণে,
করিলে এ হেন হায় দুঃখ নিরূপন ?

(৪)

দুইটী পড়িল স্রোতে—একটী তাহার,
ভাসিতে ভাসিতে আসি তটিনীর তীরে ;
লাগিয়াছে, মন দুঃখে কাঁদে অনিবার,
ভাসিছে অপর হায় মহাস্রোত নীরে !
স্রোত ভরে হায় তাহা ভাসিছে কখন,
উঠিছে তরঙ্গ সাথে নামিছে আবার :
তরঙ্গ অন্তরে কভু করিছে গমন,
তরঙ্গে নাচিয়া মরি ধায় অনিবার ;
ব্যাকুল তাহার তরে, হ'য়না আর অন্তরে,
সেই প্রেম আশা হায় মিটিবেনা আর।

(৫)

কাঁদিলে কি কভু আর হৃদয় বেদনে,
তোমার বাসনা ফুল হইবে পুরিত ;
কালের তরঙ্গে তাহা ভাসিছে কেমনে,
আসিবে তুষিতে তব আশা আকিঞ্চিত ?
সেই আশা ভালবাসা দাও বিসর্জ্জন,
পুরিবেনা তাহা কভু আর এই ভবে ;
বৃথায় বিষাদময় করিতে জীবন,
নিজ্জনেতে অশ্রুধারা ত্যজনা নীরবে।
দুঃখ স্রোত নীরে হেন, ভাসিবে আবার কেন,
ভুলে যাও তার আশা এ নির্ম্মম ভবে।

বিজয় সিংহ।

নবম পরিচ্ছেদ।

দামিনী বিকাশ।

রমণী প্রতাপসিংহকে একটি গোপনীয় স্থানে লইয়া গেল। সে স্থানটী চতুর্দ্দিক প্রস্তর খণ্ড দ্বারা আবৃত, তাহাতে আবার লতা দ্বারা পরিবেষ্টিত। সেইস্থান হইতে বাহিরের কার্য্য সমস্ত দৃষ্ট হয়, কিন্তু বাহির হইতে তাহার কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না।

স্থানটী ঘন কাণ্টকী বৃক্ষদ্বারা আকীর্ণ, মধ্যস্থল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেখিলেই বোধ হয় যে, কেহ যেন সে স্থানটী যত্নপূর্ব্বক পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। প্রতাপসিংহ তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন,

এ বিজন অরণ্য মধ্যে কে এরূপ গুপ্ত স্থান নির্মান করিয়াছে, তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইলেন।

যে রমণীটি প্রতাপসিংহকে সেই গুপ্ত স্থানে লইয়া গিয়াছিল, তাহার বয়ক্রম অনূ্যন অষ্টাদশ বৎসর, দেখিতে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, পাদচুম্বিত কেশ, নাসা, চক্ষু, কর্ণ, কপোল, ভ্রূ যুগল,—মনোহর ; যৌবনে যে সমস্ত অঙ্গের পরিপুষ্টি হয়, তাহাদের সম্পূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে আবার আঙ্গাবরণ অতি পরিপাটী।

যবন সেনাগণ প্রস্থান করিলে, রমণী মহারাজ প্রতাপসিংহকে জিজ্ঞাসা করিল "মহারাজ! যবন সৈনিকেরা আপনার এত বিরোধী কেন? আপনার বাদসাহের সহিত বিশেষ সখ্যতা আছে না?"

প্রতাপসিংহ কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া বলিলেন "বাদসাহ আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ করেন বটে, কিন্তু অদ্য তাঁহার সৈন্যেরা কেন যে আমাকে বিনাশের জন্য অনুধাবণ করিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না।"

রমণী ব্রীড়া সহকারে বলিল "যদি তাহাই বুঝিবেন, তবে স্বর্ণপ্রসবিনী ভারতের আজি এ দশা কেন?"

প্রতাপসিংহ আরও লজ্জিত হইয়া কহিলেন "প্রথম অশ্বারোহিকে কে হত্যা করিয়াছে, বলিতে পারেন?"

রমণী করপুটে কহিল "এ অধিনীই সেই কৃতান্তের প্রতি শর নিক্ষেপ করে।"

প্রতা। আপনি স্ত্রীলোক হইয়া এ কার্য্য কেন করিলেন?

রমণী। নতুবা আপনি এখন কি আমার সহিত কথা কহিতেন?

প্রতাপসিংহ আবার অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন "আমার প্রাণ রক্ষা আপনার এত ইষ্ট হইল কিসে?"

রমণী। মহারাজ! আপনিও হিন্দু, আমিও হিন্দু, যদি একজন যবন বধ করিয়া একজন হিন্দুরাজার প্রাণরক্ষা করিতে পারি, তাহা কি উত্তম নহে? মহারাজের বোধ হয়, আমি কে তাহা জানিবার জন্য কৌতুহল জন্মিয়াছে। আমি কোন পর্ব্বতক্ রাজ দুহিতা। পর্ব্বতে বাস হেতু পার্ব্বতীয় বলিয়া পরিচিত। পর্ব্বতে পর্ব্বতে প্রচুর সম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে।

আমাদের দেশের কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেরই ধমণীতে স্বাধীন শোণিত বাহিত হয়। পরাধীনতা ও পরপূজা তাহারা অপমান বলিয়া স্বীকার করে। কএক দিন হইল, পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে করিতে এতদূর পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছি। পরে আপনার দশা দেখিয়া বড় দুঃখ হইল। আপনাকে অনেক দিন হইতে জানি। আপনি মধ্যে মধ্যে পার্ব্বতীয় দেশে মৃগয়ায় যাইতেন, সেই অবস্থায় আপনাকে দেখিয়া ছিলাম, আজিও আপনাকে চিনিয়াছি। বস্তুতঃ আমরা আপনার অনেক আশা ভরসা করিয়া থাকি। অনেক দিন হইতে আশা ছিল যে, আপনারা আমাদের সহিত মিলিত হইবেন। তাহা হইলেই ভারতভূমি যবন করচ্যুত হইবে। কিন্তু সমস্তই বিড়ম্বনা মাত্র, আপনাদের এ পর্য্যন্ত চক্ষু ফুটিল না। দেখিতেছেন না, যে আরঙ্গজেব কি করিতেছে। দেশে কি আর কোন পরাক্রমশালী রাজা রাখিতেছে। স্বাধীন রাজা আর নাই বলিলেও হয়। আরঙ্গজেব যে কতদূর প্রবঞ্চক তাহা বোধ করি আপনি এখনও জানেন না। দেখুন—ঘরে ঘরে, রাজায় রাজায়, বিবাদ বাধাইয়া সে পরের বলহ্রাস করিতেছে। স্বকার্য্য উদ্ধারে তাহার ন্যায় সুপক্ক ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত জন্মিয়াছে কি না সন্দেহ; কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে, ভারতের পুনরুত্থানের আর আশা দেখি না। ভবিষ্যতে যে ভারত বিধর্ম্মী যবনদিগের অসীম প্রপীড়নও অম্লানবদনে সহ্য করিবে, তাহা দিব্যচক্ষে দেখা যাইতেছে। আহো! কি পরিতাপ!”

এই কথার পর উভয়েই কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন, পরে রমণী আবার বলিল “আরও দেখুন মহারাজ! ইদানিন্তত অনেকেরই ধারণা হইয়াছে যে, মুসলমান ব্যতিরেকে কেহই দিল্লী-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইতে পারিবে না। এবং সেই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া অনেক প্রতাপশালী নরপতিও, বিনা যুদ্ধে বাদসাহের পদে দলিত হইতেছে। মহারাজ! কি পরিতাপ! যাহারা বাদসাহ বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ, তাহারা বাদসাহ অনুমতিতে প্রবল পরাক্রম ও সাহস সহকারে স্বজাতীয়ের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতেছে। মহারাজ! আপনা আপনি যুদ্ধে, স্বজাতীর বিনাশ দেখিয়া বক্ষের শোণিত শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।

প্রতা। আপনি কি শিবজী——

কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে রমণী কহিল "আমি শিবজী বংশসম্ভূতা বটে।"

প্রতা। তোমার নাম কি মা?

রমণী। সরমা!

প্রতা। সরমে! তুমি বয়সে বালিকা, কিন্তু বালিকা হইয়া ও আজি বৃদ্ধকে জ্ঞান দিলে। আমি যে বিষয়ে অন্ধ ছিলাম, সে সমস্ত বিষয় তুমি আমাকে জলের মত বুঝাইয়াছ। 'মা! আমি নারকী, আমার জন্য মাতৃভূমি ভারতভূমি যে কত যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছে, তাহা কে জানে, কিন্তু এখন গতানুশোচনা বৃথা। আর কোন উপায় ত দেখিনা, যাহাতে আমার প্রাণ দিলেও ভারতের কোন উপকার হয়।

সরমা। কেন মহারাজ?

প্রতাপসিংহ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। সরমা স্থির চিত্তে সে সমস্ত শ্রবণ করিয়া একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল "মহারাজ 'যতক্ষণ আশ ততক্ষণ শ্বাস' এখনি হতাশ হন্ কেন? আরঙ্গজেবের আদেশানুক্রমেই যে ঐ সমস্ত সৈন্যেরা আপনাকে বধ করিতে আসিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। না জানি আপনার রাজ্যে কি হুলস্থূল বাধিয়াছে। মহারাজ! আর কাল বিলম্ব করিবেন না, এই দণ্ডে স্বদেশ যাত্রা করুন, আমি পশ্চাতে আপনাকে সহায়তা করিতে বিংশতি সহস্র সেনা লইয়া অগ্রসর হইতেছি। আর এক কথা—মহারাজ, আপনি যে ইতিপূর্ব্বে একখানি পত্র পাঠ করিতে ছিলেন, তাহাতে কি লিখিত আছে?

প্রতাপসিংহ বলিলেন "আমি এখনও তাহা পাঠ করি নাই।"

রমণী। পাঠ করুন।

প্রতাপসিংহ পত্র পাঠ করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন,——

রমণী জিজ্ঞাসা করিল "কি পড়িলেন মহারাজ?"

প্রতা। বাদসাহ প্রবঞ্চনা দ্বারা আমার কন্যা, পুত্র, ও বিজয় সিংহকে লইয়া যাইতে অনুমতি করিয়াছেন।

রমণী কহিল "মহারাজ! বাদসাহ কে? দিল্লী সিংহাসনারূঢ় দস্যু বলুন।"

প্রতা। সরমে! তবে আর আমি অপেক্ষা করিব না।

রমণী। আপনি শীঘ্র আসুন, কিন্তু সাবধান পথে নানা প্রকার ভীতির সম্ভাবনা।

প্রতা। আমি যে পথে যাই তাহা প্রায় কেহ জানে না, সুতরাং ভয়ের সম্ভাবনা অতি কম।

রমণী। তবে আসুন।

প্রতাপসিংহ অশ্বে আরোহণ পুর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

ঘোর বিপদ।

রাজা প্রতাপসিংহ মনে মনে রমণীকে শত ধন্যবাদ দিয়া সভীত অন্তঃকরণে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যে পথে একাকী যাইতে কখন মনে কোন শঙ্কার উদয় হয় নাই, আজি সেই পথ দিয়া যাইতে প্রতাপ সিংহের হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। স্খলিত পত্র দিয়া কোন বন্য জন্তুর যাতায়াত শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিতে লাগিলেন। দুরে কোন প্রকার শব্দ শুনিতে পাইলে, অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। এদিকে প্রাণের আশঙ্কা, তাহাতে আবার না জানি উদয়ের কি হইয়াছে! নরপিশাচ আরঙ্গজেব না জানি কমলার ও বিজয়ের কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে। বৃদ্ধ প্রাণপণযত্নে অশ্ব চালনা পুর্ব্বক মরিলা দুর্গাভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

বেলা প্রায় অবসান,—পশ্চিম গগনে বিভাবসুর কিরণ মান্দ্য হইয়াছে। আকাশের গায় সেই কিরণ শোভা পাইতেছে, দুই এক খণ্ড মেঘকে মনোহর চিত্র বিধান করিয়া সূর্য্যদেব অস্তাচল আশ্রম সুখাভিলাষ করিতেছেন। মরিলার দুর্গ—স্বায়ং কালীন সূর্য্যের রশ্মীতে মনোহর বেশধারণ করিয়াছে, কিন্তু আজি প্রতাপসিংহের চক্ষে সে শোভা ভাল

লাগিল না। যে মরিলা আসিবার জন্য অশ্বকে কত কশাঘাত করিয়াছেন, এইক্ষণে সেই মরিলার দুর্গ নিকটে উপস্থিত হইয়া, তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে প্রতাপ সিংহের হৃদয়ে যেন কি দারুণ ক্লেশ হইতে লাগিল। বাটীর সংবাদ জ্ঞাত হইবার জন্য কত উদ্বিগ্ন চিত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই বাটীর সংবাদ জানিতে যেন মন কি করিতে লাগিল। মনে মনে কেমন যেন একপ্রকার ভয় হইতে লাগিল। দুর্গের চতুর্দ্দিকে কত রক্ষী প্রহরায় নিযুক্ত আছে. জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা তখনই সংবাদ দেয়, কিন্তু প্রতাপসিংহের তাহাদিগকে দেখিয়া সংবাদ জিজ্ঞাসা করা দূরে থাকুক, হৃদয়ে যেন কেমন একপ্রকার ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল। ক্রমে বিশুষ্ক বদনে দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইলেন। রক্ষীবর্গ সসম্ভ্রমে রাজমর্য্যাদা প্রদান করিল, মহারাজ তাহা গ্রহণ ও প্রতিদান করিয়া ধীরে ধীরে দুর্গমধ্যে প্রবেশ .করিলেন। একেবারে অন্দরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন, কমলার গৃহে প্রবেশ করিলেন, ·দেখিলেন কমলা নাই। কমলার জন্য অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু কমলা আসিল না, বৃদ্ধের হৃদয় দুর দুর করিতে লাগিল, চক্ষে জল আসিল। এমত সময়ে কমলার জনৈক দাসী আসিয়া মহারাজের কুশল জিজ্ঞাসা করিল। প্রতাপসিংহ তাহাকে যথা যথ উত্তর প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন——

"কমলা কোথায়?"

"অনেকক্ষণ হইল বাদসাহ বাহাদুরের নিকট হইতে কএকজন অশ্বারোহী আসিয়া সংবাদ দিল, যে আপনার ভয়ানক পীড়া হইয়াছে, এবং আপনি কুমার, কমলা দেবী, ও মহারাজ বিজয়সিংহকে দেখিবার নিমিত্ত বড় উৎসুক হইয়াছেন। মহারাজ বিজয়সিংহও এখানে ছিলেন, এই সংবাদ শুনিবামাত্র তাঁহারা তিনজনেই প্রায় তিন চারি দণ্ড অতীত হইল দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।"

এই সংবাদ শুনিবামাত্র বৃদ্ধের আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। চক্ষে বেগভরে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। দাসী ভীতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "অধিনী না জানি কি অশুভ সংবাদ দিয়া মহারাজকে অসুখী করিল, দেবী কমলার কি কিছু অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে?"

"যতদূর অশুভের ভয় করা যাইতে পারে, ততদূর অশুভ ঘটিবারই সম্ভাবনা।"

দাসী কাঁপিতে লাগিল। মহারাজ প্রতাপসিংহ মুহূর্ত্ত মধ্যে বহির্দ্দেশে গমন করিলেন। তাঁহার প্রধান সেনানায়ককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "বৎস! আরঙ্গজেব আমার সহিত প্রবঞ্চনা করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তুমি অনতিবিলম্বে ইচ্ছামত দ্রুতগামী অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া আমার প্রাণাধিক পুত্র, কন্যা, ও বিজয়কে সেই রাক্ষসদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়া দাও। বিপদের সময় প্রকৃত বন্ধুর কার্য্যকর, আমাকে প্রাণদান কর।"

রাজা প্রতাপসিংহ কাঁদিতে লাগিলেন। সেনানায়ক "রাজ আজ্ঞা শিরোধার্য্য" এই কথাটি বলিয়া তৎক্ষণাৎ অম্লান দুইশত অশ্বারোহী সেনা লইয়া যে পথ দিয়া কমলা প্রভৃতি গিয়াছে, সেই পথে যাত্রা করিলেন। দ্রুতগামী অশ্ব সকল তীরবেগে ছুটিল। মহারাজ প্রতাপসিংহ সেনানায়ককে বিদায় দিয়া একটি প্রকোষ্ঠে করকপোলিত হইয়া নানাবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তপ্ত অশ্রুবারি তাঁহার হস্ত বহিয়া অনবরত ভূমি চুম্বন করিতে লাগিল। রাজা যখন এইরূপ চিন্তায় মগ্ন, তখন এক জন রক্ষী আসিয়া সংবাদ দিল যে "একটি রমণী আপনার দর্শন অভিলাষিণী" প্রতাপসিংহ সসব্যস্তে কহিলেন "অতি আদরের সহিত তাঁহাকে এইস্থানে লইয়া আইস।"

ক্ষণেক পরে রমণী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, রাজা তাহাকে অতি সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। রমণী কহিল "মহারাজ আমি আপনার নিকট অভ্যর্থনা পাইবার আশায় আসি নাই, আপনার উপস্থিত বিপদের কথা শুনিয়া বড় দুঃখিত হইয়াছি। আপনি যখন সেই পর্ব্বতে আমাকে সমস্ত বলেন, আমি তখনি বুঝিয়াছিলাম, যে এইরূপ কোন একটা বিপদ ঘটিবে। তা যতদুর হইবার হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে কি স্থির করিয়াছেন?"

প্রতা। আমার মাথা মুণ্ড।

রমণী। মহারাজ! আপনার ন্যায় লোকের মুখে ঐ সকল কথা ভাল শুনায় না। আমি যে রমণী আমার ধমনীও বিদ্যুৎ বেগে প্রধাবিত হই-

তেছে। মহারাজ, আমার সৈন্যগণ ঐ প্রান্তরে অবস্থিতি করিতেছে, অনুমতি হয় ত আমিও কুমার কুমারীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই।

মহারাজ প্রতাপসিংহ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "আমার এই আসন্ন বিপদের সময়ে ঈশ্বর তোমায় আমাকে এক প্রকৃত বন্ধু দিয়াছেন। আমি আশীর্ব্বাদ করি যে তোমার এ শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

রমণী প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

লক্ষ্মী *VERSUS* সরস্বতী।

একদিন বৈকুণ্ঠে নারায়ণ কমলার সহিত পাশার রং খেলিতেছিলেন। লক্ষ্মী আড়িমারিতে বড় মজবুত, সুতরাং নারায়ণই হারিতেছিলেন। পাশা খেলায় লক্ষ্মীর বড় ঝোঁক। পাশা পাইলে আর তিনি কিছুই চান না। নারায়ণ কমলার প্রতি তাঁহার প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে, লোকমুখে বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন, যে পাশা খেলিবে তাহার লক্ষ্মী ত্যাগ করিবেন। এটী নারায়ণের অন্যায়—তিনি লক্ষ্মীর সহিত পাশ ক্রীড়া করেন বলিয়া যে আর কেহ পাশা খেলিবে না, বা খেলিলে তাঁহার চক্ষু টাটাইবে, ইহা কি যুক্তি সঙ্গত? সে কথা যাক্। নারায়ণ মহা পেটুক, পাশা খেলিতে খেলিতে বলিলেন "প্রিয়ে একটি কাজ কর্‌বে? কমলা হাসিয়া বলিলেন "আবার কি কাজ! কোন খাওয়া দাওয়ার বিশেষ ফরমাইস আছে বুঝি, তাই এত মধুর স্বরে "প্রিয়ে" সম্বোধন হ'ল, তা না হ'লে সরস্বতী ভিন্ন তোমার প্রিয়ে কোথায়? পেট্টা ঠাণ্ডা কর্‌তেই আমি আছি বইত নয়।"

নারায়ণ বলিলেন "এঃ আজ মেজাজ্‌টা বড় বেতর রয়েছে যে?"

লক্ষ্মী। আমার আর কবে তর মেজাজ্,— এখন খপর কি?

নারা। বলি এমন বাদ্‌লাটায় খাবাদাবার কি হ'বে তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি।

লক্ষ্মী। আমি ত আর সরস্বতী নয়, যে দুট গান গেয়ে, বীণ্ বাজিয়ে সেরে দেব, তুমি আজ যা খাবার ইচ্ছে করেছ, তাত আমার আর অজানিত নাই।

নারায়ণ ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিলেন "তা হ'লেই হ'ল।"

লক্ষ্মী বলিলেন "তাত হ'বে, এখন তোমায় এক কাজ্ কর্‌তে হ'বে।"

কাজের নাম শুনিয়া বিষ্ণুর বদন শুকাইয়া গেল। জড়িত স্বরে কহিলেন "কি কাজ?"

লক্ষ্মী। তোমায় এই দণ্ডে ভারতে যেতে হ'বে, তুমি যে বড় সরস্বতীর সুখ্যাত কর, ভাল আজ সেখানে গিয়ে দেখে এস দেখি, যে সেখানে আমার আদর বেশি কি তোমার সরস্বতীর আদর বেশি।

বিষ্ণু। কি বিপদ, আমি এই বাদলে কল্‌কাতায় যাব?

লক্ষ্মী। কেন যাবেনা, সেদিন সরস্বতী বল্‌বামাত্র ছুট্‌লে যে।

বিষ্ণু। সেদিন সরস্বতী বল্‌লে হারল্‌ডের বাড়ি থেকে, একটা পিওনো আর একটা ক্লেরেটীনা কিনে এনে দাও। তাই গিছ্‌লাম।

লক্ষ্মী। এও'ত একটা কাজ।

বিষ্ণু। এ যে মিছে কাজ, এই কাজের জন্যে ভিজতে ভিজতে কল্‌কাতা যাব? আবার সর্দ্দি হয়ে পাল্‌সাটিলা খেয়ে মরি।

লক্ষ্মী। ছাতা মাথায় দিয়ে যাও।

নারায়ণ মহা বিপদগ্রস্থ, কি করিবেন ভাবিতেছেন, এমত সময়ে তথায় সরস্বতী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সরস্বতীকে দেখিয়া নারায়ণ বলিলেন "আচ্ছা সরস্বতীর মত্‌টা জানা যাক্।"

এই কথা শুনিবামাত্র লক্ষ্মী মহা রাগ করিয়া কহিলেন "সরস্বতী বল্‌লে ত যাবেই—সরস্বতীই সব, আমি ভেসে এসেছি কিনা।"

সরস্বতী হাসিয়া বলিলেন "হয়েছে কি?"

লক্ষ্মী বলিলেন "বল—বলনা।"

নারায়ণ বোবা। লক্ষ্মী বলিলেন "তার আর ভয়টা কি, আমি বল্‌ছি।" এই বলিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবৃত করিলেন।

সরস্বতী শুনিয়া হাসিয়া কহিলেন "এই—আমি বলি কি একটা গুরুতর ঘটনা ঘটিয়াছে।"

লক্ষ্মী দম্ভভরে কহিলেন "এ গুরুতর ঘটনাই বটে—এতে তোমার যে দর্পচূর্ণ হবে।"

সরস্বতী বলিলেন "তা হউক আর না হউক, মিন্‌সেটাকে অনর্থক কষ্ট দেবে কেন?"

লক্ষ্মী। তুমি যখন পাঠাও, তখন বুঝি কষ্ট হয় না? তোমারই সব, আমার কিছুই নয়। আমার কি এক আনাও হিস্যা নাই নাকি?

সরস্বতী বলিলেন "আর কলহে কাজ নাই, আইস আমরা সকলে মিলিয়া মর্ত্তে যাইয়া কাহাকে লোকে অধিক ভক্তি করে, সচক্ষে দেখিয়া আসি।".

এই কথা শুনিয়া নারায়ণের অধরে হাসি আসিল, নারায়ণ বলিলেন "বাঁচ্‌লাম—কাহার নিন্দা বা কাহার সুখ্যাতি করিতাম, আর আমার প্রাণটা যেত।

সরস্বতী বলিলেন "নাথ! তবে মর্ত্তে যাইবার শীঘ্র আয়োজন কর।"

বিষ্ণু বলিলেন "কিসে যাওয়া হইবে?"

লক্ষ্মী বলিলেন "সেদিন যে স্বর্ণ নির্ম্মিত গ্রাণ্ড ডাচেস্ বেরুস্ আনাইয়াছি, তাহাতেই চল।"

বিষ্ণু গাড়ি তৈয়ারী করিতে আদেশ করিলেন, নিমেষ মধ্যে বাঁধা পাগড়ি সইস্‌, কোচমান্ সম্বলিত সুন্দর অশ্বদ্বয় সংযোজিত বেরুস আসিয়া উপস্থিত হইল, সইস্ লম্বা পাদান খুলিয়া দিল, বিষ্ণু একে একে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর হাত ধরিয়া গাড়িতে চাপাইয়া, আপনি একাকী তাঁহাদের সম্মুখে অর্থাৎ কোচমানের দিকে পিছু হইয়া বসিয়া, 'আজি না জানি কি এক কাণ্ড হইবে', এইকথা ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছেন, এমত সময়ে গাড়ি বোটানিকেল গার্ডনের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে শিবপুর পুলিশের কাছে আসিল, তথায় দেখিলেন একটী উপবীতধারি যুবক, একটি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিতেছেন। সরস্বতী বলিলেন "এই যুবাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি ও কাহারে অধিক সমাদর করে।" গাড়ি একটী গাছ তলায়

থামিল, বিষ্ণু গাড়ি হইতে নামিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ও গো বাবুটী লক্ষ্মী সরস্বতীকে জান ?"

বাবুটী বলিলেন "সরস্বতী আবার কে ? লক্ষ্মী ব'লে একটা মাগিকে কাল চালান দিয়াছি, তাই জানি।"

বিষ্ণু চমকিয়া বলিলেন "চালান্ দিয়াছেন কি বল্‌তেছেন ?"

বাবুটী ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন "যান্ না—জ্বলান কেন ?"

বিষ্ণু। আমি আপনার কথা বুঝিলাম না।

বাবু। বলি সে মাগিটা আপনার কে ?

বিষ্ণু। আমার স্ত্রী।

বাবু হাসিয়া বলিলেন "আরে গেল, তুমি ব্রাহ্মণ হ'য়ে সেই হাড়ি মাগিটার সঙ্গে আছ ?"

বিষ্ণু রাগিয়া উঠিলেন, লক্ষ্মী দেখিলেন বেগতিক ; সরস্বতী মুখে রুমাল দিয়া হাসিতেছেন। এমন সময়ে তথায় বরুণ আসিয়া উপস্থিত। বরুণ তাহাদিগকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "একি আপনারা এখানে ?"

লক্ষ্মী বলিলেন "সে কথা বল্‌ব এখন, বিষ্ণুকে এদিকে ডেকে আন দেখি ?"

বরুণ দেখিলেন অদূরে বিষ্ণু মহা ঝগ্‌ড়া আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাকে ত অনেক কষ্টে ফিরাইলেন। পরে গাড়িতে আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন "বলি হয়েছে কি ?"

সরস্বতী সমস্ত বলিলেন।

বরুণ শুনিয়া বলিলেন "আপনাদের বুদ্ধি সুদ্ধি লোপ পেয়েছে নাকি ? এই রকম সেজে কুজে গাড়ি করে কল্‌কাতা যাচ্চ—হয়েছে !

বিষ্ণু বলিলেন "কেন ?"

বরুণ। কেন ?—কলকাতা কি সহজ যায়গা।

বিষ্ণু। দেব দেবীর অপমান করবে ?

বরুণ। তারাকি দেব দেবী মানে।

লক্ষ্মী। কেন সেখানে লক্ষ্মী পূজা হয় না !

বরুণ। তাদের কি আছে যে লক্ষ্মী পূজা কর্‌বে। আর করতেওত ভক্তি হয় না! তারা তোমার পূজা ক'রে দুবেলা দুমুট ভাত পায় না, আর ইংরেজ্‌রা তোমায় ভ্রুক্ষেপও করেনা, কিন্তু তুমি তাদের কাছেযেন কপিকলে বাঁধা।

লক্ষ্মী। বলকি আমায়ও মানেনা।

বরুণ। ছাই মানে, পূজ করতে হয় তাই করে, আর ২০।২৫ বৎসর বাদে তাও করবে না। বরং সরস্বতীর দিন দিন প্রতিপত্তি হচ্চে। ওঁকে যে ভজে তার সুখ হয়, আর ভারত কেন, আমার ত পৃথিবীর সর্ব্বত্রেই গতায়াত আছে, আমি ত দেখ্‌তে পাচ্চি যে সকল দেশের লোকেই বিদ্যাবুদ্ধির জন্য ধনী মানী সুখী। যদিও লক্ষ্মী দুই একটা রামকান্তর এঁড়েকে বিপুল অর্থ দিয়ে বড়লোক করেন বটে, কিন্তু সরস্বতীর অনুকম্পা না থাকায় তাহাও তাদের যায়—লক্ষ্মী ছাড়া হয়। তাই সরস্বতীর লোকে আদর বেশী করে, সরস্বতী যেখানে নাই, সেখানে কার সাধ্য যে লক্ষ্মীকে রাখতে পারে। বরং যেখানে সরস্বতী আছেন সেখানে আপনি লক্ষ্মী আসেন।

লক্ষ্মী অধোবদন। বরুণের উপর রাগ রাগ বলিলেন "তা হ'বেনা আমি স্বয়ং দেখ্‌তে যাব।"

বরুণ বলিলেন "যাও ক্ষতি নাই কিন্তু রাস্তায় চেঁচাচেঁচি করনা।"

লক্ষ্মী। কেন?

বরুণ। পুলিষে ধরে নিয়ে যাবে। এত আর স্বর্গ নয়। অধিক কি এখানেও গোল করা ভাল নয়। শীবপুরের ইনসপেক্‌টরটী ও বড় সহজ লোক নয়।

এতগুলি কথার পর বরুণের চটক ভাঙ্গিল, তখন মনে মনে ভাবিলেন "তাইত লক্ষ্মীকে চটান ভাল হয় নাই, বিষ্ণুলোকে লক্ষ্মীর অনুগ্রহে আহারের বন্দোবস্তটা ভাল হয়, লক্ষ্মীকে চটাইলে আর হইবে না।" প্রকাশ্যে বলিলেন "সেই ভাল সকলের যাইয়াই দেখা উচিত। আমার যদি ভ্রমই হয়। কিন্তু এ বেশে যাওয়া হইবে না আজ স্বর্গে যাই চল; আর

একদিন ভাল দিন দেখে গুপ্ত ভাবে আসা যাবে।” সকলের তাহাই মত হইলে, স্বর্গে ফিরিয়া গেলেন।

চিকিৎসা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য কি?

ভূমণ্ডলের আদিম অবস্থায় মনুষ্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই বোধহয় চিকিৎসা শাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। মানব জীবনে আরোগ্যই যাবতীয় সুখের ভিত্তিভূমি। শরীর সুস্থ না থাকিলে পৃথিবীর একটী যৎসামান্য কার্য্যও যৎপরোনাস্তি কৃচ্ছ্রসাধ্য হইয়া উঠে। সুতরাং যেমন একদিকে মনুষ্য সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, শরীরে নিত্য নূতন নূতন রোগের আবির্ভাব হইয়া সহস্র সহস্র জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল, এবং বহুসংখ্যক মানব দুর্দ্দমনীয় রোগের ভীষণ তাড়নায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া অকালে মানব-লীলা সম্বরণ করত তত্তৎকালীন সরলচেতা সজাতিবর্গের বিস্ময়াকুল অন্তঃ-করণে ভীতি উৎপাদন করিতে লাগিল, তেমনই আবার অন্যদিকে মনুষ্যের অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি আপনা হইতেই প্রবলা হইয়া প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান যাব-তীয় রোগের কারণ, লক্ষণ, নির্ণয়োপায় ও চিকিৎসাতত্ত্ব সম্বন্ধে যথাসাধ্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে ক্রমশই সহজ হইতে কঠিন, কঠিন হইতে কঠিনতর, স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ হইল। ক্রমশই নূতন রোগ, নূতন তত্ত্ব, নূতন ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়া চিকিৎসা প্রণালী পরিবর্ত্তিত ও চিকিৎসা শাস্ত্র উন্নতি পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

সেই আদিম সৃষ্টির সময় হইতে যে সকল ঘটনাবলী আয়ত্ত করিয়া বর্ত্তমান চিকিৎসা শাস্ত্র সংগঠিত হইয়াছে; স্থূল দৃষ্টিতে অবলোকন করিলেও তাহাতে অসংখ্য ভ্রম পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবীস্থ চিকিৎসা শাস্ত্রবিশারদ প্রধানতম পণ্ডিত মণ্ডলী আজিও চিকিৎসা বিজ্ঞানের নিতান্ত শৈশবাবস্থা বলিয়া যে সমানভাবে দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, চিকিৎসা বিদ্যা অভ্যাস

পূর্ব্বক কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করতঃ অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিবন্ধন অনেক সময়েই হৃদয়ে যে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইতেছেন, এবং সহস্র লোক নানা প্রকার দুশ্চিকিৎস পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া যে অসহ্য যাতনা সহ্য করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছেন, চিকিৎসাশাস্ত্রের অসম্পূর্ণতাই তাহার একমাত্র কারণ। বস্তুতঃ এই অসম্পূর্ণতা জন্য সকল কালে সকল দেশে সকলবিধ চিকিৎসকগণেরই মস্তিষ্কে নিত্য নিত্য নূতন নূতন অভাবের অনুভূতি হইতেছে, এবং পৃথিবীর মহামূল্যবান শত শত জীবন নিরবচ্ছিন্ন ঐ অভাব পূরণ চেষ্টাতেই ব্যতিব্যস্ত রহিয়া যেমন একদিকে চিকিৎসা শাস্ত্রের কলেবর পরিপুষ্ট করিতেছে, তেমনই আবার অন্যদিকে পূর্ব্বাপেক্ষা জটিলতর বহুসংখ্যক অভাব চক্ষু সান্নিধ্যে উপস্থিত হওয়াতে জগতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্বাভাবিক অসম্পূর্ণতা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। বাস্তবিক অন্যান্য বিজ্ঞান শাস্ত্রের ন্যায় চিকিৎসা শাস্ত্রও বিজ্ঞান শাস্ত্র। বৈজ্ঞানিক উন্নতি পৃথিবীতে আপেক্ষিক ভিন্ন কখনও সম্পূর্ণ বা সীমা বদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং অনন্তকাল পর্য্যন্ত ইহার উন্নত গতি অব্যাহত থাকিবে ; অনন্তকাল পর্য্যন্ত ক্রমশই নূতন অভাবের সূত্রপাত, নূতন চেষ্টার অবতারণা, নূতন আবিষ্ক্রিয়া সংঘটন এবং নৈদানিক তত্ত্ব ও নূতনভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া অসীম উন্নতি পথে অগ্রসর হইবে ; কিন্তু চিকিৎসা শাস্ত্র কোন কালেও অসম্পূর্ণতা দোষশূন্য বা সম্পূর্ণ উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হইবে না।

জীবদেহ জড় পদার্থ। জড় পদার্থ হইলেও উহা একটী অজড় অসীম শক্তির সহিত চির সম্বন্ধে আবদ্ধ। এইরূপ শক্তি-সম্বন্ধ আছে বলিয়াই পৃথিবীস্থ যাবতীয় জড় বস্তু হইতে প্রাণীগণ জীব বা প্রাণী শব্দ দ্বারা পৃথক হইয়াছে। বিবিধ প্রকার মতভেদ বর্ত্তমানেও আমরা এস্থলে সাধারণের বোধ সৌকার্য্যার্থে উক্ত অজড় শক্তিকেই জীবন বলিয়া ব্যাখ্যা করিলাম। দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়া নিচয়ের স্বাভাবিক গতি যথারীতি সম্পাদিত হইলে শরীরের সহিত জীবনের সম্বন্ধ ও অব্যাহত থাকিয়া যায়। যে কোন কারণেই হউক না কেন পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়া নিচয়ের স্বাভাবিক সামঞ্জস্য যে পরিমাণে বিলুপ্ত হইবে, শরীর ও জীবনের সম্বন্ধ ও ঠিক সেই

পরিমাণে হ্রাসতা প্রাপ্ত হইবে। বাস্তবিক শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়া নিচয়ের স্বাভাবিক গত্যাবরোধকতা উপস্থিত হইলে জীবিতাবস্থার কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হইতে পারে না। হয়ত জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠে, না হয় উক্ত অবরোধকতার সাংঘাতিকতায় একবারে শরীর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। শরীর জীবনী শক্তি বিরহে ক্ষণকাল মধ্যেই বিকৃত ও ধ্বংশ হইয়া যায়। এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে রোগ বা পীড়া প্রাগুক্ত ক্রিয়া নিচয়ের অস্বাভাবিক গতি বা স্বাভাবিক গত্যবরোধকতারই নামান্তর মাত্র। সুতরাং রোগ প্রভাবেই দেহ জীবনী শক্তি বিহীন হইয়া পড়ে। যদি তাহাই হইল, তবে রোগ হইলেই প্রত্যেক মনুষ্যের জীবন তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয় না কেন? দীর্ঘকাল দুর্দ্দমনীয় রোগের অসহ্য তাড়না সহ্য করিয়াও মনুষ্য দেহ পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইতেছে কি জন্য? শারীরিক ক্রিয়াকলাপ অযথা বিধানে পরিচালিত হইয়াও পুনরায় প্রকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে কেন? অনেক সময়ে জীবন যায় যায় হইয়াও একবারে বিলুপ্ত হয় না কি জন্য?—একটী শক্তি আছে। শরীরের সহিত জীবনের পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধ সুদৃঢ় রাখিবার জন্য একটী শক্তি আছে। শরীরের যাবতীয় বিকৃত ক্রিয়া দুরীভূত করিবার জন্য, রোগাক্রমণ হইতে শরীরকে সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখিবার জন্য, অব্যাহতরূপে শারীরিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করিবার জন্য প্রাণী-মাত্রেরই অন্তর্ণিহিত একটী বিশেষ শক্তি আছে। এই মঙ্গলময় মহাশক্তির পূর্ণ অভাব সংঘটন হইলে কেবল মনুষ্য নয়, প্রাণী জগতের বিশাল অস্তিত্ব ও মুহূর্ত্ত মধ্যে বিনষ্ট হইয়া জীব শব্দ পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইত। সংক্ষেপে সকলেরই অবগত হওয়া উচিত যে চিকিৎসা বিজ্ঞান জীব শরীরের এই বিপুলা শক্তিকেই স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধিকা বা প্রাকৃতিক নিরাময়িকশক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

জড় জগতে সকল পদার্থই নিয়মাধীন। স্বাভাবিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া কোন পদার্থই স্থায়ী হইতে পারে না। বিশেষতঃ শরীরি জীবমাত্রই সর্ব্বদা বাহ্য বস্তু নিচয়ের সহিত বিবিধ প্রকার সম্বন্ধে চির সম্বদ্ধ। মুহূর্ত্ত কালের জন্য ও এই সম্বন্ধ ব্যতিক্রম সংঘটন হইলেই শরীর রোগ প্রবণতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বোধ হয় পৃথিবীতে এমন মনুষ্য কেহই জন্মগ্রহণ করেন

নাই, যিনি আজীবন নিরবচ্ছিন্ন যথার্থ স্বাস্থ্য সম্ভোগ করতঃ প্রাকৃতিক নিয়মে দেহত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত রোগ প্রবণতা শক্তি স্বভাব সিদ্ধ না হইলেও শারীরিক জ্ঞাত বা অজ্ঞাত সম্বন্ধ ব্যতিক্রম নিবন্ধন উহা এক সময়ে, বা সময়ে সময়ে প্রত্যেক শরীরেই আপন ক্ষমতা বিস্তার করিয়া বসে। অতএব কোন ব্যক্তিই আজীবন পূর্ণ স্বাস্থ্য সম্ভোগে সক্ষম নহেন। এই জন্যই শরীর ব্যাধিমন্দির বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

রোগ বা ব্যাধি দেহ সম্বন্ধে কোন আগন্তুক বস্তু নহে। উহা পৃথক্ রূপে স্থানান্তর হইতে আসিয়া শরীরে আশ্রয় গ্রহণ করে না। জীবদেহের এক কিম্বা ততোধিক অঙ্গের বিধান কিম্বা ক্রিয়া, বা এতদুভয়ের বিকৃত অবস্থাই রোগ শব্দের প্রকৃত প্রতিপাদ্য। যদিও ক্রিয়া বিকার হইলেই নির্ম্মাণ বিকার, এবং নির্ম্মাণ বিকার হইলেই ক্রিয়াবিকার আবশ্যম্ভাবী, তথাপি এতদুভয়ের একতর বিষয় অবলম্বন করিয়াই প্রথমে রোগ প্রকাশ পায়। প্রায় সমুদায় রোগেরই মূল উৎপত্তি ঐ দ্বিবিধ প্রকারেই সংগঠিত হয়। যেমন যকৃতে অতিরিক্ত সুরাপান জনিত রক্তাধিক্য হইয়া প্রথমে উহার ক্রিয়াবিকার উৎপন্ন করে, পরে ঐ রক্তাধিক্যের ফলস্বরূপ বৈধানিক পরিবর্ত্তন সংগঠিত হইয়া যকৃত নানাপ্রকার অপকৃষ্টাবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ যদি ক্যান্সার্ প্রভৃতি দূষিত অর্ব্বুদ উৎপন্ন হইয়া প্রথমেই যকৃতের নির্ম্মাণ বিকার উৎপাদন করে, তবে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রিয়াবিকার উপস্থিত হইয়া পরিপাক কার্য্যাদিব নানা বিশৃঙ্খলা সম্পাদিত হয়। রোগ মাত্রেরই উৎপত্তি এইরূপ শারীরিক ক্রিয়া বা নির্ম্মাণ বিকার জনিত হইলেও, অনেকে বলিতে পারেন যে সমুদায় রোগ না হউক, কতকগুলি (সংক্রামক ও স্পর্শাক্রামক) পীড়া ঠিক আগন্তুক বস্তুর ন্যায়ই স্থান হইতে স্থানান্তরে, দেহ হইতে দেহান্তরে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। বস্তুতঃ তাহা ঠিক নহে। মনে করুণ, বসন্ত রোগের বিষাক্ত পুয়কণা যতদিন শরীরে প্রবেশ পথ না পায়, ততদিন শরীর ঐ রোগে আক্রান্ত হয় না। কিন্তু একবার উহা দেহস্থ সাধারণ রক্তে সংশ্লিষ্ট হইলে ঐ বিষাক্ত পুয় দূরীকৃত করিবার জন্য শরীরের যে প্রাকৃতিক চেষ্টা উপস্থিত হয়, ঐ চেষ্টাই বাস্তবিক দুর্দ্দমনীয় বসন্ত রোগ রূপে প্রকাশিত হইয়া, হয়ত বিষ দূরীকৃত

করে, নচেৎ আপনি উহার তীব্র তাড়ণে পরাজিত হওয়াতে জীবন বিনষ্ট হইয়া যায়।

প্রাগুক্ত বাহ্য সম্বন্ধ বহুলতা নিবন্ধন যেমন একদিকে প্রাণী শরীর মুহুর্মুহুঃ রোগ প্রবণতা প্রাপ্ত হইতেছে, তেমনই আবার অন্যদিকে স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধিকা শক্তি উহাকে দূরীভূত করিবার জন্য, যথার্থ স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করিবার জন্য, খরশানিত অসি হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়া, শরীরের জীবন সম্বন্ধ অটল রাখিতে প্রয়াস পাইতেছে। ফলতঃ জীবন বিনাশক কারণ জীবদেহে সংশ্লিষ্ট হইয়াই শরীরের জীবন সম্বন্ধ বিকৃত করিতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু প্রাকৃতিক নিরাময়িক শক্তি উহাকে দূরীভূত করিতে যত্ন করে। সুতরাং এই উভয় শক্তির পরস্পর সংঘর্ষণই রোগ রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। মনে করুন, কম্পজ্বর একটী রোগ; ম্যালেরিয়া নামক প্রসিদ্ধ বিষ এই রোগের উৎপাদক কারণ। ম্যালেরিয়া মানব শরীরে প্রবেশ করতঃ স্বকীয় বিষাক্ত ক্ষমতা প্রভাবে শারীরিক যাবতীয় যন্ত্রাদির ক্রিয়াবৈগুণ্য জন্মাইতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু স্বাভাবিক রোগ, প্রতিরোধিকা শক্তি উহাকে দেহ হইতে বহিস্কৃত করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পায়; রোগোৎপাদক কারণ শরীর পরিত্যাগ করিতে চায় না, কিন্তু প্রাকৃতিক শক্তিও আর উহাকে থাকিতে দেয় না। সুতরাং এই উভয় শক্তির উভয় চেষ্টার সংঘর্ষণই কম্পজ্বরে পরিণত হয়। কম্পজ্বর বা ম্যালেরিয়া জনিত জ্বরের প্রত্যেক পর্য্যায় সময়েই ম্যালেরিয়া নামক বিষ কিয়ৎপরিমাণে শরীর হইতে পরিত্যক্ত হয় সত্য, কিন্তু ম্যালেরিয়ার মাত্রাধিক্যতা প্রযুক্ত প্রাকৃতিক নিরাময়িক শক্তি দুর্ব্বলা হইয়া পড়িলে, এবং উপযুক্ত চিকিৎসার সম্যক অভাব হইলে, ক্রমশঃ জীবনের যাবতীয় ক্রিয়াগুলিই বিলুপ্ত হইয়া অচিরেই রোগী মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়; অন্যথা ম্যালেরিয়ার স্বল্পতা প্রযুক্ত পূর্ব্বোক্ত শক্তিই প্রবলা থাকিলে, এক, দুই, তিন কিম্বা ততোধিক পর্য্যায় পরেই সমস্ত বিষ বিনষ্ট হইলে স্বাভাবিক স্বাস্থ্য প্রত্যাগমন করে। এই শেষোক্ত প্রণালীর বশবর্ত্তী হইয়াই অনেক সময়ে আমরা সামান্য জ্বরের হস্ত হইতে চিকিৎসা ব্যতিরেকে ও মুক্ত হইতেছি। কেবল সামান্য জ্বর কেন, রোগ প্রতিরোধিকা শক্তি প্রবলা থাকিলে সর্দ্দি,

কাশি, শিরঃপীড়া, অজীর্ণতা, কোষ্ঠবদ্ধ, প্রভৃতি বহুবিধ পীড়া আমাদিগকে কিছুকাল উৎপীড়ন করতঃ অবশেষে আপনা হইতেই আরোগ্য হইয়া যায়। ঔষধ প্রয়োগ বা চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণের বিন্দুমাত্রও প্রয়োজন হয় না। আবার অধিকাংশ স্থলে প্রাকৃতিক নিরাময়িক শক্তির সাতিশয় প্রবলতা নিবন্ধন রোগোৎপাদিক কারণ প্রকাশ্যরূপে দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াও তৎক্ষণাৎ দূরীকৃত হইতেছে। এই জন্যই আমরা দূষিত বায়ুর আঘ্রাণ, অস্বাস্থ্যকর পান ভোজন, অতিরিক্ত পরিশ্রম, হিমাবৃত স্থানে ভ্রমণ ইত্যাদি নানা প্রকার স্বেচ্ছাচারিতা সম্পাদন করিয়াও, অসংখ্য বাস্থ্য সম্বন্ধ উল্লঙ্ঘন করিয়াও, এবং বিবিধ দুরারোগ্য রোগের উদ্দীপক কারণ সমূহ সর্ব্বদা আহ্বান করিয়াও যথারীতি স্বাস্থ্য সম্ভোগে সমর্থ হইতেছি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই রোগ প্রতিরোধিকা শক্তি মনুষ্যাপেক্ষা ইতর জন্তুতেই সমধিক বলবতী। তাহাদের পীড়া হইলে উপযুক্ত চিকিৎসার সম্ভাবনা নাই বটে, কিন্তু জগদীশ্বরের অসীম করুণাবলে অসাধ্য বা কৃচ্ছ্রসাধ্য পীড়াদি হইতেও সহজেই তাহারা মুক্তিলাভ করিতেছে।

রোগ নিবারণ পূর্ব্বক যথার্থ স্বাস্থ্য সংস্থাপনই চিকিৎসা শাস্ত্রের স্থূল উদ্দেশ্য। স্থূল উদ্দেশ্য হইলেও চিকিৎসা বিদ্যা রোগ নিবারণে সমর্থ নহে, উপযুক্ত চিকিৎসক দ্বারা যথারীতি পরিচালিত হইলেও রোগ নিবারণে সমর্থ নহে। চিকিৎসা বিজ্ঞানবিদ্ প্রধানতম পণ্ডিত মণ্ডলীও স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন যে জগতে এমন চিকিৎসক কেহই নাই যিনি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারেন যে "আমি অমুক রোগ দূরীকৃত করিতে পারি।" বস্তুতঃ চিকিৎসক বা ঔষধের ক্ষমতা রোগ তাড়াইতে সক্ষম নহে। তবে কি চিকিৎসা শাস্ত্রের কোন মূল নাই? উহা কি একটী অন্তঃসার-শূন্য অমৌলিক পদার্থ? রোগ সম্বন্ধে চিকিৎসক কি নিতান্তই অকর্ম্মণ্য ব্যক্তি? রুগ্নশরীরে ঔষধ প্রয়োগ কি কাল্পনিক জগতের ক্রিয়ামাত্র?—তাহা কদাপি নহে। আমরা ইতিপূর্ব্বে স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধিকা বা প্রকৃতিক নিরাময়িক শক্তির যে ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ করিয়াছি, সেই মহানশক্তি নিস্তেজ হইলে তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করাই চিকিৎসা তত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য।

সেই মহানূশক্তির বলবিধানই চিকিৎসা বিজ্ঞান ও চিকিৎসকের একমাত্র কার্য্য। চিকিৎসক ব্যবস্থা ও ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ মানব শরীর রুগ্ন হইলে চিকিৎসক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সহায়তায় সর্ব্বাগ্রে রোগ নির্ণয় পূর্ব্বক তত্তৎপীড়ার উৎপত্তিগত কারণানুসারে এক এক প্রকার রোগে এক এক প্রকার ঔষধ প্রয়োগকরতঃ পূর্ব্বোক্ত প্রাকৃতিক শক্তিকে উত্তেজিত করেন; এবং ঐ শক্তির উপযুক্ত উত্তেজনা সম্পাদিত হইলেই যাবতীয় রোগ দূরীকৃত হয়। সুতরাং স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধিকা শক্তিই রোগ নিবারণে সক্ষম। চিকিৎসাশাস্ত্র চিকিৎসা দ্বারা, এবং চিকিৎসক ঔষধদ্বারা কেবল ঐ শক্তির সাহায্য করেন মাত্র।

ডাক্তার—শ্রীক্ষীরোদলাল ভট্টাচার্য্য।

সংসারে সার কি?

সংসার অসার—জগৎ দুঃখময়—"আজি যথা সুধাময় কালি তথা হলাহল।" শৈশবে খেলাধূলায় আমোদ আহ্লাদে থাকিয়াও বয়ঃপ্রাপ্তির লালসা; অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন থাকিয়া মূঢ় শিশু বিবেচনা করিতে পারে না যে এ বিষময় ধরায় কি অমূল্য দিব্য সুখসম্ভোগ করিতেছে—আপন অবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া অবস্থান্তরের সুতরাং প্রত্যাশা করে। যৌবনে প্রণয়-প্রমত্ততায় উত্তেজিত হইয়া বার্দ্ধক্যের আশা; বলবুদ্ধি ভরসার ক্রমশঃ নিস্তেজে, ও প্রণয়ের মাদকতা অসহনীয়া হইলে—শান্তিময় বার্দ্ধক্যের জন্য সুতরাং প্রত্যাশা জন্মে। বার্দ্ধক্যে ধর্ম্ম-নীতির ভাবনায় চিত্ত উদ্বেলিত; একবার মরণ কামনা, পুনরায় করাল কালের ভীষণ রদাবলিযুক্ত ভয়াবহ মুখব্যাদান মানস-নেত্রে দেখিয়া ও জীবিত থাকিবার সাধ, স্থবির চরমের অপরিহার্য্য ধর্ম্মচিন্তায় নিরত হয়েন; ধর্ম্ম-চিন্তা সাগরের পারাপার নাই—যতই সে চিন্তার অনুশীলন কর ততই সে বর্দ্ধমানা; শেষে বৃদ্ধ হাবু ডুবু খান।

একবার মরিতে কৃতসংকল্প, আবার বাঁচিবার বাসনা—হরি! হরি! তাই কি সংসার অসার, জগৎ দুঃখভারাক্রান্ত।

পাঠক! তবে কি নিশ্চয়ই সংসার অসার, দুঃখকৃচ্ছ্রপূর্ণ? এ পৃথিবীতে কি কিছুই সার নাই? পদ্মপত্রে জলের ন্যায়, কাচ পারদ মত এই ক্ষণভঙ্গুর জীবন কি কোন কণামাত্র সারও উপভোগ করিতে আসেনা? সংসার নাট্য-রঙ্গাঙ্গনে সতত বিবিধ রঙ্গের নব নব অভিনেতৃবর্গের নব মার্গানুসারী অভিনয়ন নয়নগোচর হইতেছে, কিন্তু সকলই কি উদাসীনবৎ অসার দুঃখময়? কিছুতেই কি হৃদয়-স্পর্শী মানস-সম্মোহনী আকর্ষণ নাই? কিছুতেই মনের উপভোগতৃষা মিটে না? কিছুতেই কি সারবত্তা লক্ষিতা হয় না? সুখে দুঃখে মরণে ব্যসনে এক মহামন্ত্র এক মহাভেষজ এমন কোন রত্নসার কি এ পৃথিবীতে নাই? অবনীতে স্বর্গধামের পূর্ব্বাসাদ প্রদান করিতে পারে এমন এক মহামন্ত্রের শক্তিসার কি এ জগতে নাই? দীন হও,—কুটীরের প্রাঙ্গনস্থ তৃণরাজিতে বসাইয়া দারিদ্র্য যন্ত্রণার বিরাম করিতে পারে এমন মহাভেষজের শক্তিসার কি এ সংসারে নাই? পাঠক! আছে—সে মহামন্ত্র-শক্তি সে মহাভেষজ-শক্তি—বন্ধুতা।

বন্ধুতা সংসারের সার—ইহা দেবাকাঙ্খ্য দিব্য-চ্যুত প্রেম! "সংসার-মরুতে নির্ঝরিণী জল!" "জীবন-মরু-ভূমির ওয়েসিস্!" দুঃখ-ব্যাধির একমাত্র ভেষজ! ইহার মায়ায় সম্মোহিত, ইহার মমতায় সংপৃক্ত স্নেহামৃত পানে পরিবর্দ্ধিত, ইহার সুবিস্তৃত সুখদ কোমল পল্লবাশ্রিত লোকপালের পক্ষে এই চরাচর বিশ্বসংসার বিবিধ দুঃখ পঙ্কিল হইলেও, অসার বোধ হইলেও, কি অসীম সুখের আস্পদ! সুখে দুঃখে, হর্ষে বিষাদে যিনি ইহার পদসেবায় অভিরত তিনি ব্যতীত পাপময় অসার সংসারে পুণ্যবান্ আর নাই।

ঐহিকে প্রকৃত সুখ কোথায়? চিরকাল সুখের প্রত্যাশায় জীবনাতিপাত হইতেছে। "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানি চ" এইটি কেবল দুঃখ শান্তি হইবে বলিয়া মনকে প্রবোধ বা আশ্বাস দিবার বাক্য। ফলে ঐ উক্তির সার অত্যল্প, এমন কি নাই বলিলেই হয়।

যাহা হউক যদি ইহ সংসারে কিঞ্চিন্মাত্র সুখ বা সুখচ্ছায়া থাকে তাহা

হইলে একটি দুঃখ অপনয়ন করিতে সক্ষম হইবার কাল হইতে অন্য একটী দুঃখারম্ভ কালের মধ্যবর্ত্তী পলক পরিমিত কালেই যাহা যৎস্বল্প থাকিবার সম্ভাবনা। অথবা দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়াই সুখ। বন্ধুতা সেই ক্ষণিক সুখকে দ্বিগুণমিত করে, আর ভবের অলঙ্ঘনীয় দুঃখকে আর্দ্ধকমিত করে; য়্যাডিসান বলেন,মহাত্মা টালি প্রথমে তদ্বিষয় পর্য্যাবলোকন করেন :—" Friendship improves happiness and abates misery, by the doubling of our joy and dividing of our grief."

বন্ধু মানব-জীবনের মধুরভাষী সদুপদেশক প্রত্যক্ষ দেব, কি তদপেক্ষা আরও কিঞ্চিৎ অধিকতর পুজ্যপাদ! জীবন সংগ্রামে, সহায় সম্বল সম্বন্ধে বন্ধু প্রত্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণ! শৈশবে বন্ধুর সমাদর বুঝিতে পারা যায় না; তখন "গাড়ি আড়ি" বলিয়া বন্ধুর সহিত একবার বাক্য রহিত; পুনরায় অবিলম্বেই "ভাব ভাব" বলিয়া মিলন হইত; সুতরাং তৎকালে মার্জ্জারের ন্যায় কলহ সম্ভাষ! কৈশোর যৌবন সন্ধির স্থলটী অবনতি উন্নতির যোজক স্থল; সেইস্থলে সেই চালে ভুল হইলে ক্রমাগত মাত বই জিত হয় না। কিন্তু সেই সংশয় স্থলে বন্ধুই একমাত্র সম্বল; তিনিই রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রভৃতি সন্মার্গের নিয়ন্তা। বার্দ্ধক্যেও যৌবন কালের ন্যায় বন্ধুই একমাত্র সহায়। এক্ষণে, ইহলোক যদি পরীক্ষা স্থল হইল, দেবতারা যদি পরীক্ষক হইলেন, তবে আমার ঐহিক সন্মার্গের নিয়ন্তা বন্ধু দেবতাপেক্ষাও পূজ্যতর তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি সৎকর্ম্ম করিলে যখন দেবতা সন্নিধে সদ্গতির ভাজন হইব, তখন আমার সৎকর্ম্মে মনোনিয়োজক বন্ধু দেবারাধ্য অথবা তদধিক তাহা স্বীকার করিতে মনাক্ * কুণ্ঠিত হইব না। দেববর্গ ষড়-রিপু ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত রূপ রসাদি প্রবল প্ররোচনা দ্বারা ইহজন্মে আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন, বন্ধু আমাকে সদুপদেশ দ্বারা তৎ তৎ বস্তু হইতে সাধ্যমত নিবৃত্ত রাখিতেছেন—উৎপথ প্রতিপন্ন হইতে নিবারণ করিয়াছেন। বন্ধুবাক্য অনুসরণ করিয়া বেশ্যাশক্তি, পানশৌণ্ডতা এবং অশেষবিধ পাপ পঙ্ক হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি;

* সর্ব্বনাশ! লেখক প্রকৃতই ভাষার উপর জুলুম আরম্ভ করিয়াছেন।———আ সং

সুতরাং বন্ধু আমার পক্ষে দেবতা ; আমি দেবারাধনায় তাঁহাকে পূজা করিতে প্রশস্তমনা হইয়াছি।

পাঠক! অদ্য শরৎপর্ব্ব। বিভাবরী কাঞ্চনাভা। গঙ্গার সৈকত পুলিন বিভিন্ন-বিদেশস্থিত বন্ধুদ্বয়ের আনন্দোচ্ছ্বাস স্থল। মহামায়ার আগমনে অবকাশ পাইয়া বন্ধুদ্বয় নিভৃতে মিলিত হইয়াছেন ; বিশ্বস্ত-চিত্তে পরস্পরে হৃদয়-দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া মনের অকপট ভাব কদম্বক ব্যক্ত করিতেছেন। কি বিমল সৌহার্দ্দ! কি সুখেরই বিশ্রাম্ভালাপ! কি হৃদয়ের অকপটতা। কি চিত্তের অনির্ব্বচনীয় একাবেশ! উভয়ের প্রীতি-বাক্যে উভয়ের হৃদয় উচ্ছ্বলিত! উভয়ের শোচনীয় বাক্যে উভয়ের হৃদয়-তন্ত্রীচয় কম্পিত! একবার উভয়েই শোকবিহ্বল হইয়া ক্রন্দন করিতে-ছেন! আবার আনন্দোচ্ছ্বসিত হইয়া পুলকিত হইতেছেন! কি মধুর ভাব! কি হৃদয়ের অকপট মিলন। উভয়ের হৃদয় যেন দ্রবীভূত ও মিলিত হইয়া একটী ক্ষুদ্র স্রোত প্রবহমান হইতেছে ; তাহাতে আবার যথাক্রমে একবার আনন্দ-লহরী পুনরায় শোক-লহরী সমুদ্ভূতা হইতেছে। কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ বিকাশ! পাঠক! এ বিকাশ অতি দুর্ল্লভ— ইহা ধনীতেও দুর্ল্লভ ; জ্ঞানীতে ও দুর্ল্লভ। এ স্বর্গীয়ভাব দাম্পত্য প্রণয়অপেক্ষাও উচ্চতর, বিশ্বাসজনক এবং সুখপ্রদ—এ ভাব ললিত লীলাবতীতেও হয় নাই ; হেমচন্দ্র মৃণালিনীতেও হয় নাই ; এ ভাব সোমতারাতেও ছিল না, দুষ্মন্ত শকুন্তলাতেও ছিল না ; * এ এক স্বতন্ত্র অমায়িক কমনীয় ভাব। এ ভাব কখন পিতাপুত্রে কিম্বা মাতা পুত্রে বিরাজ করে নাই—এ ভাব দশরথ দাশরথির মধ্যেও বিকাশ পায় নাই ; সুমিত্রা সৌমিত্রির মধ্যেও বিকাশ পায় নাই। এ মনোহর ব্রীড়াহীন সখ্যতা-ভাব (?) সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রীতিদায়ক, বিশ্বাসজনক ও পবিত্র। উপসংহার কালে আমাদের আত্মন্ত সমর্থনের জন্য ও পাঠকবর্গের হৃদয়ে বন্ধুর যথাযথ ভাব উত্থিত করিবার নিমিত্ত আমরা নিম্নলিখিত পদ্যাংশটী উদ্ধৃত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না :——

* ভাবে বোধ হয় লেখক কাহাকে দাম্পত্যপ্রণয় বলে, জানেন না। প্রকৃত দাম্পত্য প্রণয় যে বন্ধুত্ব ব্যতীত হয় না, তাহা প্রণয়ী দম্পতী মাত্রেই স্বীকার করিবেন। আ সং

" Many sounds were sweet,
Most ravishing and pleasing to the ear ;
But sweeter none than voice of a faithful friend,
Sweet always, sweetest heard in loudest storm.
Some I remember, and will ne'er forget,
My early friends, friends of my chequered day ;
Friends in my mirth, friends in my misery too,
Friends given by God in mercy and in love.
My councellors, my comforters and guides,
My joy in grief, my second bliss in joy ;
Companions of my young desires in doubt ;
My Oracles, my wings in high pursuit,
Our meeting-spots, our chosen sacred hours ;
Our burning words that uttered all the soul ;
Our faces beaming with unearthly love,
Sorrow with sorrow sighing hope with hope ;
Exaulting, heart embracing heart entire. "

শ্রীগোপালচন্দ্র গুপ্ত। *
বাবুগঞ্জ।

---

* আমরা ভবিষ্যতে লেখককে সরল ভাষায় লিখিতে অনুরোধ করি। এরূপ শব্দ-প্রিয়তার প্রশংসা করিতে আমরা নিতান্তই অনিচ্ছুক।

আ সং

নৈশ বিহার।

শৈল শিখরে।

বসন্তের নব অভ্যুদয়,—নব শ্যামবরণে যখন প্রকৃতি সতী সজ্জিতা, যখন মলয়হিল্লোল কি জীব কি উদ্ভিদ্ সকলকেই নবরসে উত্তেজিত করে, পিকবর আপন সুমধুর স্বরে জগৎস্থ জীব সম্প্রদায়ের হৃদয়ে নবভাব সমুদিত করে, যে সময়ে লতায় পাতায় মহীরুহে অপূর্ব্ব আরণ্য প্রণয়ের মোহিনীমূর্ত্তি বিরাজমান, আমি সেই মনোহর সময়ে একদা কোন পর্ব্বতে শ্রান্তিদূর করিতে যাই। সেই নবমীর রাত্রে পর্ব্বতের কৃষ্ণ কলেবরে যেন জ্যোৎস্না হাসিতেছিল। সে দৃশ্য অভূতপূর্ব্ব মনোহর; আমি অনেকক্ষণ অতৃপ্ত নয়নে সেই সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিলাম, পরে তাহার সেই কুটিল পথাবলম্বন করিয়া সেই পর্ব্বত-শিখরে উপস্থিত হইলাম। এ আবার নূতন দৃশ্য, আমার মস্তকোপরি সুনীল নৈশাম্বরে মধুর হাসি হাসিয়া বাসন্তীয় চন্দ্র ক্রীড়া করিতেছে; পাঠক! চাঁদের ক্রীড়া দেখিয়াছ? এ ক্রীড়া তোমার আমার সহিত নহে,—কাদম্বিনীর সহিত, মধ্যে মধ্যে দুই একখণ্ড সুদৃশ্য শ্বেত মেঘ খণ্ডের সহিত সেই নবমীর শশধর ক্রীড়া করিতেছিল, এক একবার নীরদখণ্ডে প্রবিষ্ট হইয়া আপন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের মৃদু আভা প্রকাশ করিয়া জগতে এক অপূর্ব্ব দৃশ্যের সৃজন করিতেছিল, আবার কখন বা সহসা তন্মধ্য হইতে বাহির হইয়া জগৎসংসারকে হাসির তরঙ্গে ভাসাইতেছিল। জানিনা যে প্রকৃতির সহিত চন্দ্রের কি সম্বন্ধ, কিন্তু আমি সেই অত্যুচ্চ স্থল হইতে দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছিলাম যে চন্দ্রের সহিত প্রকৃতির অতি নিকট সম্বন্ধ; প্রকৃতি চন্দ্রের অদর্শনে যেন মলিন ও বিষন্ন এবং তাহার দর্শনে আনন্দে উন্মত্ত হইতেছিল। আহা! চন্দ্র যখন তাহার ক্ষুদ্রবদন জলদখণ্ডে আবৃত করিতেছিল, তখন দূরস্থ নদীর এক অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় নদীর সহিত

চন্দ্রের বড় সখ্যতা; চন্দ্রের অদর্শনে নদী যেন ভয়াবহ শোকের চিহ্ন প্রকাশ করিতেছিল: সে চিহ্ন কি তাহা একবার এইরূপ সময়ে দেখিও তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে। দ্বিতীয়তঃ আবার যখন সহাস্যবদনে সুধাংশু দেখা দিতেছিল, তখন তাহার আনন্দের কথা কি বলিল। নদী-বক্ষ যেন শতভাগে বিভক্ত হইয়া নৃত্য করিতেছিল। আমি নিঃশঙ্কহৃদয়ে শৈলশিখরে উপবিষ্ট হইয়া কখন নিশানাথের হাসি, কখন প্রকৃতির মধুর ভাব, কখন বৃক্ষবল্লরীর নৃত্য, কখন বা অরণ্য প্রণয় দৃষ্টে আনন্দে বিভোর হইয়া মূহুর্ত্তে মূহুর্ত্তে হৃদয়ে নবীন ভাবকে প্রতিষ্ঠা করিতেছিলাম। আমি আর একটী আরও সুন্দর দৃশ্য অবলোকন করিয়াছিলাম, তাহা দূরবর্ত্তী শিখরদেশ হইতে নিম্নস্থ চন্দ্রকিরণের, কখন বৃক্ষপত্রের সহিত, কখন বা নদীর জলের সহিত ক্রীড়া। সে সৌন্দর্য্য যে কি অপূর্ব্ব তাহা কি বলিব! সে সৌন্দর্য্য যদিও আমার হৃদয়ে গাঢ়রূপে অঙ্কিত রহিয়াছে তথাপি তাহা বর্ণনা করা আমার সাধ্যয়ত্ত্ব নহে। সে মনোহারিতা মন বুঝে, কিন্তু বুঝাইতে পারে না। আমি অনেকক্ষণ এইরূপে প্রকৃতি-শোভাবিমোহিত হইয়া উপবিষ্ট রহিলাম, পরে পর্ব্বতসম্বন্ধে আমার হৃদয়ে আর একটী নব ভাবের উদয় হইল।

আমি সেই শৈল শিখর হইতে সুদূরস্থিত পল্লীবাসিগণের অবস্থা ভাবিতে লাগিলাম। মনে হইল মনুষ্য তোমারা এক, কিন্তু তোমাদের হৃদয়ের এত বিভিন্নতা কেন? এই ত রজনীকালে কি ধর্ম্ম-ভীরু, কি পাপী কি জ্ঞানী, কি মূর্খ সকলেই অচেতনপ্রায় নিদ্রিত, সকলেরই এক কার্য্য-কারিতা, কিন্তু যেই নিদ্রা ভাঙ্গিবে আর পরস্পরে বিভিন্ন হৃদয় ধারণ করিয়া জড় জগতের ভীতি সম্পাদন করিতে থাকিবে। তখন মনে হইল রজনী তোমার ক্ষমতা ধন্য, তুমি এই অসংখ্য জীব সম্প্রদায়কে কি অদ্ভুত ইন্দ্রজালবলে অকর্ম্মণ্য অবস্থায় অবস্থাপিত কর! নরকে শিক্ষা দাও যে মনুষ্য তোমার ক্ষমতা অতি অল্প, অতি সামান্য, তুমি মোহমদে ভ্রান্ত হইয়া আর আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করিও না। তোমার জ্ঞানের বিনোদপথ রজনী ঐ দেখ তোমাকে ঈঙ্গিত করিয়া, তাহার বিনোদচক্রে নিক্ষিপ্ত করিয়া তোমায় শিক্ষা দিতেছে,—নর তুমি নম্র হও, ধীর হও,

স্বভাবের নিকট আত্মপরীক্ষা দাও, বিনীত হইতে শিক্ষা কর, তাহা হইলে তোমার জীবনপথ নির্ব্বিঘ্ন হইবে, নতুবা এই জীবনে পদে পদ স্খলিত হইবে, আত্মজ্ঞান হারাইবে, আর আর্ত্তনাদ করিবে।

দেখ, মানবজীবন কি আশ্চর্য্য, কি অদ্ভুদ, আবার কি কিম্ভূতকিমাকার, ইহা একপক্ষে কত প্রীতিপ্রদ ও অপরপক্ষে কি ভয়াবহ; দেখ এই অসংখ্য শরীরিমধ্যে কত ধার্ম্মিক কত পরহিতকারী কত প্রাণী আত্মসিবর্জ্জন দিয়া পরহিতসাধনে যত্নপর, পরসুখে সুখী আবার কত পাপী, পরশ্রীকাতর নিঃস্বার্থেও পরানিষ্টকারী, কত উন্নতমনা, সরল, কত নীচহৃদয়সম্পন্ন ক্রুর। দেখ প্রত্যেকেই জন্মগ্রহণ করে, প্রত্যেকেই পিতামাতা দ্বারা যত্নে প্রতিপালিত, প্রত্যেকেই শিক্ষা পায়, কিন্তু কি আশ্চর্য্য যে বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহাদের হৃদয়গত ভাবের কত বিপর্য্যয় ও কত ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। শৈশবের খেলা ধূলা, যৌবনের প্রমত্ততা, কত লোকের বার্দ্ধক্যের অনুশোচনার কারণ হয়, আবার কত শত প্রাণী তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করে না। সংসার যে কি ঘোর পরীক্ষার স্থল তাহা সাংসারী মাত্রেই অবগত আছেন। পাঠক! তুমি একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখ, দেখিবে আমার আশ্রয় পর্ব্বত এই জড়জগতের প্রধান আদর্শ, এই জগৎসাংসারের মনুষ্যজীবনে যাহা আছে, তাহা এই পর্ব্বতে দেদীপ্যমান। দেখ এই অভ্রভেদী পর্ব্বত অসংখ্য জীবজন্তু ও পাদপশ্রেণীকে অক্ষুণ্ণমনে আশ্রয় প্রদান করিয়া উন্নত মনের পরিচয় প্রদান করিতেছে। ইহার কুটিল পথ ক্রুর হৃদয়ের আদর্শ। তরুগণে লতাবেষ্টনী প্রেমিকার আদর্শ, উচ্চশির মহীরুহ যোগীর প্রতিমূর্ত্তি, সরিজ্জল তৃপ্তির আলয়, ফল সঙ্কুল বৃক্ষ দাতার প্রতিরূপ, গন্ধবিহীন কীটাকীর্ণ পুষ্প বারবনিতার স্থানীয়। তিক্ত ফলাবনতবৃক্ষ কৃপণ সদৃশ। দেখ এখানে কত সুরভিপুষ্প নির্জ্জনে বিকশিত হইয়া অলক্ষ্যভাবে লয়প্রাপ্ত হইতেছে, ইহা সংসারের জ্ঞানীর জ্ঞান প্রকাশের অনুপায়, বা অনেচ্ছার পরিচায়ক। আবার ঐ দেখ কণ্টক বৃক্ষমধ্যে একটী সুধাধার ফলের বৃক্ষ। কণ্টকবৃক্ষ তাহার বিকাশ ধ্বংশ করিয়া, তাহাকে ফলাবনত হইতে দেয় না। ইহা সংসারের কুসংসর্গের দেদীপ্যমান মূর্ত্তি।

আবার দেখ, কোথাও শার্দ্দূল, কোথাও সিংহ, কোথাও বা নিরীহ মেষ বাস করিতেছে। উদার চেতা নদী—সন্তোষের সহিত সকলকেই পরিতৃপ্ত করে, মেষকে যেরূপ শীতল সলিল প্রদান করে, মেষহন্তা শার্দ্দূলকেও তদপেক্ষা নিকৃষ্ট পানীয় দেয় না। শার্দ্দূলের পরিতৃপ্তি মেষে, আবার মেষের সন্তোষ তৃণে, নদী তাহার বিচার করে না; স্রোতস্বতী আপন কার্য্য আপনি করিতেছে, তাহাদের ফল তাহারা আপনি পাইবে। ব্যাঘ্র বৃদ্ধাবস্থায় অনাহারে দিনযাপন করে, কিন্তু মেষের বৃদ্ধাবস্থাতেও আহার্য্য প্রচুর। ইহারা মনুষ্যকে দুরাকাঙ্ক্ষা ও মিতাকাঙ্ক্ষার শিক্ষা প্রদান করে। ব্যাঘ্রগণ ইহ জগতের নরহত্যাকারী নরব্যাঘ্রের আদর্শ, মেষ ভদ্রশ্রেণী।

আমি অনেকক্ষণ এইরূপে চিন্তা করিতেছি, এমত সময়ে নবমীর শশধর বিশ্রাম গ্রহণ করিল, আমি একাকী সেই জনশূন্য দুরারোহ শৈল শিখরে ভীতিবিহ্বলচিত্তে উপবিষ্ট রহিলাম। উপায়ান্তর নাই, সেই ঘোর অন্ধকারে পর্ব্বতের সেই কুটিল পথাবলম্বন করিয়া অবতরণ করা মনুষ্যসাধ্যায়ত্ত্ব নহে। একে একাকী তাহাতে সেই শ্বাপদ-শঙ্কুল স্থান, বাঙ্গালির হৃদয়ে এতদবস্থায় পতিত হইলে যে কি ভাবের উদয় হয়, তাহা বাঙ্গালিকে বুঝাইতে হইবে না। যতদূর সাধ্য একটী নিরাপদ স্থান বাছিয়া লইলাম। সাহসে ভর করিয়া তথায় রাত্রিযাপন করিতে বাধ্য হইলাম, তখন পর্ব্বত ভয়াবহ কৃষ্ণাম্বর ধারণ করিয়াছে; সে মূর্ত্তি অবলোকন করিলে হৃদ্‌কম্প হয়, আমি এক একবার ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করি, আর আতঙ্কে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে, আকাশের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলাম, দেখিলাম সে পূর্ব্বশ্রী নাই, ঘোর কৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, শশধরকে না দেখিতে পাইয়া তারকাগণ যেন তাহাদের চক্ষু উন্মীলিত করিয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতেছে, প্রকৃতির এই বিভীষিকাময়ী দৃশ্য অবলোকন করিয়া আমি সমধিক বিস্ময়াপ্লুত হইলাম। দেখিতে দেখিতে গগন প্রাঙ্গণে দুই এক খণ্ড মেঘ দেখা দিল, ক্রমশঃ মেঘমালা ঘনীভূত হইয়া গগনপট সমাচ্ছাদিত হইল, একে একে একটী একটী করিয়া সকল তারাই যেন বিষাদে আপন আপন চক্ষু মুদিল। ক্রমে মুষলধারে বারিবর্ষণ হইতে লাগিল, বোধ হইল যেন চন্দ্র-

বিহনে তারকারাজি শোক প্রকাশ করিয়া কাঁদিতেছে। চপলা ছুটিয়া ছুটিয়া যেন চতুর্দ্দিকে শশধরের অনুসন্ধান করিতে লাগিল, দেখিতে না পাইয়া মধ্যে মধ্যে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বিষাদের চিহ্ন জ্ঞাপন করিতে লাগিল। আমার বক্ষ দুর দুর করিতে লাগিল, আমার সেই পূর্ব্ব আশ্রয়ে আমি ভীতিবিহ্বলচিত্তে বিকম্পিত হৃদয়ে, নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থিত রহিলাম। ক্রমে আমার অজ্ঞাতসারে নিদ্রাকর্ষণ হইল, আমি অচেতন হইয়া তথায় নিদ্রাভিভূত হইলাম। যখন নিদ্রা ভঙ্গ হইল তখন দেখি পূর্ব্বাকাশে রক্তিমবরণে তপনদেব সমুদিত, তাঁহার প্রখর রশ্মি শৈল শিখর আচ্ছাদিত করিয়াছে, তখন আমার মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল, মনে করিলাম প্রকৃতি যেন আমার বিষদমগ্ন চিত্তকে শান্তি শিক্ষা প্রদান করিতে গত নিশিতে সেই মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। ভাবিলাম মানব তুমি প্রকৃতির এই মূর্ত্তি হইতে শান্তি শিক্ষা কর, ধৈর্য্য শিক্ষা কর—তোমার জীবনের দিনে চির-পূর্ণিমা রহিবেনা, বা চিরকাল তাহা ঘনঘটাতমসাচ্ছাদিত থাকিবে না, জীবনে সুখ দুঃখের ওতপ্রোত ভাব অবশ্যম্ভাবী। ধৈর্য্য চ্যুত হইও না, নিরাশ হইও না, ক্রমে তোমার হৃদয়গগণাকাশ হইতে মেঘমালা বিদূরিত হইয়া সূর্য্যের প্রখর-রশ্মি দেখা দিবে। আর মনুষ্য তোমার জীবনের গগণে সুধাংশু সমুদিত দেখিয়া একেবারে আহ্লাদে অধৈর্য্যও হইও না, তাহাতে আবার ঘনঘটার সমাবেশ অসম্ভব নহে। সে যাহাই হউক পর্ব্বতের কি দুঃখে কি সুখে এই সমভাব ও প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছিলাম। আমি পর্ব্বতের এতাদৃশ উন্নত ভাবকে মনে মনে ধন্যবাদ দিতে দিতে তাহার সেই কুটিল পথাবলম্বন করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। তখন আমার মনে হইল যে মনুষ্য তুমি সংসার পথে বিচরণ করিলে যত কেন সাবধান হওনা, তোমায় কুটিল লোকদিগের চক্রে কখন না কখন পড়িতেই হইবে!

—————

আশা লিপি।

১

হৃদয় যন্ত্রের শিথিল গ্রথিত,
কে বাজাল তার—সহসা প্রবল ?
তান লয় রাগে করিয়া মিলিত,
কে তুলিল আশা সঙ্গীত তরল ?

২

আজি কে বাজিল, বহুদিন ধ'রে,
কইত এ বীণা বাজেনি আমার ;
নিরাশ জীবন আশার সাগরে,
কই ত দেয়নি আনন্দে সাঁতার।

৩

তবে কেন বীণা বাজিল এখন !
শুধু কি কেবল কুহক বিস্তার ?
আশা লিপি প্রেম চারু নিদর্শন,
বাড়াতে বিরহ বিষাদ বিকার ?

৪

আর আশা—প্রিয়ে নাহিক বাসনা,
আশার কুহকে নেচেছি ঢের,
সহেছি আশায় নিরাশ যাতনা,
বুঝেছি জগতে আশার ফের।

৫

প্রেমের অমর বরণে লিখিত,
আশা লিপি প্রাণ তোষেণা আমার,
আশায় আশায় দিবস বাহিত,
পারিনা বহিতে বুকে করি ভার।

৬

জানি আশা লিপি হৃদয়ের ধন,
জানি আশা লিপি শান্তি নিকেতন,
জানি আশা লিপি বিদেশী জীবন,
জানি আশা লিপি পূণ্য দরশন।

৭

জানি আমি তার মূল্যের নিয়ম,
জানি আমি তার আদর কেমন,
জানি আমি তাহা বিরহী ভূষণ,
জানি আমি তাহা বিশ্ব মনোরম।

৮

জানি, কিন্তু কই অবোধ পরাণ,
আশার প্রবোধ মানে না যে আর,
ইচ্ছা করে দেখি ভরিয়া নয়ান,
মানস মোহিনী মূরতি তোমার।

৯

ইচ্ছা করে হৃদে করিয়া তোমায়,
বিষম বিচ্ছেদ অনল নিবাই,
ইচ্ছা করে প্রেম মোহিনী মায়ায়,
হৃদয় বাসনা সতত মিটাই।

১০

যাক্—আশা লিপি চাহিনারে আর,
আয় করি বুকে আয় প্রাণ ধন,
ভাবময়ী চাঁদ বদনে তোমার,
শত শত লিপি পড়িব এখন।

শ্রীভঃ——

———

* বলকি ?———আ নং*

বিজয় সিংহ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বিপাকে বন্দী।

দিল্লীশ্বরের প্রধান সভাগৃহের নাম "আমখাস।" ইহা একটী প্রকাণ্ড গৃহ, সুবৃহৎ বৃহৎ স্তম্ভ দ্বারা পরিশোভিত। ঐ সমস্ত স্তম্ভ ও উহার উপরস্থ ছাদ স্বর্ণ বিমণ্ডিত। ঐ গৃহের দক্ষিণদিকে একটী স্বর্ণবেদী ছিল। সেই বেদি উপরস্থ ময়ুরসিংহাসনে আরঙ্গজেব উপবিষ্ট রহিয়াছেন। পরিচ্ছদের জন্য যেন বাদসাহের সর্ব্বশরীর দীপ্তিমান দৃষ্ট হইতেছিল। সর্ব্বশরীরে বহুমুল্য প্রস্তররাশি জ্বলিতে ছিল। সিংহাসনোপরে গম্ভীরভাবে বাদসাহ বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখ, সুবর্ণ রেইল দ্বারা পরিবেষ্টিত, সেই রেইলের বামপার্শ্বে আপন আপন বক্ষে করসংলগ্ন করিয়া নতশিরে পারিষদবর্গ দণ্ডায়মান। বেদির নিচের স্থানটী সুবর্ণ রেইল দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত। একদিকে মনসব্দার প্রভৃতি যোদ্ধৃগণ বাঙ্নিষ্পত্তি বিনা সশস্ত্রে দণ্ডায়মান, ও অপর দিকে অসংখ্য ভৃত্যবর্গ অজ্ঞানুযায়ী কার্য্য সম্পাদনার্থ দণ্ডায়মান ছিল। বাদসাহের ঠিক্ সম্মুখে একটী সুন্দর পটমণ্ডল সংস্থাপিত ছিল। তাহা এরূপ সুন্দর রূপে চিত্রিত যে তন্মধ্যে প্রবেশ মাত্রেই বোধ হইত, যে কি রমণীয় উদ্যান মধ্যেই প্রবেশ করিলাম। তথায় নানাবিধ সুন্দর সুন্দর সুবর্ণের কারুকার্য্য সম্পন্ন আলেখ্য ছিল। সেই সুন্দর লতামণ্ডপে প্রার্থনাকারীগণ স্ব স্ব আবেদন পত্রসহ দণ্ডায়মান থাকিত, আরঙ্গজেব নিষ্কর্ম্মা ছিলেন না, তিনি স্বহস্তেই প্রায় অধিক কার্য্য নিষ্পাদিত করিতেন। প্রার্থণাকারীদিগের আবেদন সমস্তই নিজে শ্রবণ করিয়া যথা যথ অনুজ্ঞা প্রদান করিতেন।

রাজকার্য্য সমস্ত সম্পন্ন হইলে বাদসাহ আবেদনকারীদিগকে বিচার সঙ্গত আজ্ঞা প্রদান করিয়া বিদায় দিয়া আমখাসের সভা ভঙ্গ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমত সময়ে দূর হইতে নকীব বিজয়সিংহ, উদয়সিংহ, ও কমলা দেবীর আগমন বার্ত্তা গোচর করিল। বাদসাহ ঈষৎ হাস্যসহকারে বিজয়সিংহ ও উদয়সিংহকে সভাস্থলে আনয়ন করিতে অনুমতি দিলেন। অনতি বিলম্বেই রক্ষীবর্গ পরিবেষ্টিত রাজপুত্রদ্বয় সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন।

বাদসাহ আরাঙ্গজেব ব্রীড়াব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন "কি বিজয় সিংহ সম্রাজ্য স্থাপনে কৃতসংকল্প হইয়াছ নাকি?"

বিজয়সিংহ প্রথমে কি উত্তর দিবেন স্থির করিতে পারিলেন না, ক্ষণেক পরে কহিলেন "আমরা বাদসাহের সামান্য করদ প্রজামাত্র, আমাদের সামান্য রাজ্য রক্ষা করিতে পারিলে চরিতার্থ হই, আমাদের কি সাধ্য যে আমরা সাম্রাজ্য স্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হইব।"

বাদসাহ ঈষৎ হাসিয়া উদয়সিংহের প্রতি কহিলেন "কি উদয়সিংহ তোমার ভগিনী কমলা কোথায়?"

উদয়সিংহ বিশেষ অপ্রতিভ হইয়া বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। পরে বাদসাহ জনৈক দৌবারিককে কহিলেন যে "শিবিকাসহ কমলা দেবীকে সভাস্থলে আনয়ন কর।" রাজ আজ্ঞা তখনি সম্পাদিত হইল। বাদসাহ শিবিকার একটি দ্বার উন্মোচন করিয়া কহিলেন "দেখি কমলা তোমার চারুবদন আমার পুত্রের উপযোগিনী কিনা?" শিবিকা মধ্যস্থ রমণীটি আরও অধিক অবগুণ্ঠন দিল। সভাস্থ কাহার মুখে কথা নাই, সকলেই মস্তক অবনত করিয়া দণ্ডায়মান। কেবল মাত্র কুমার উদয়সিংহের চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইল, এবং বিজয়সিংহের নয়ন রক্তিমাবর্ণ ধারণ করিল। বাদসাহ একবার তাঁহাদের প্রতি অবলোকন করিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "কমলাকে অন্দরে লইয়া যাও।"

বাহকেরা কমলাকে লইয়া প্রস্থান করিল। এই দৃশ্য অবলোকন করিয়া বিজয়সিংহ আর থাকিতে পারিলেন না। কহিলেন "বাদসাহ! জানিতাম না যে দিল্লীশ্বরের সিংহাসনও প্রবঞ্চনা পরিপূর্ণ।"

বাদসাহ। বিজয়সিংহ তুমি বালক, একথা কি জাননা যে রাজনীতির নামই প্রবঞ্চনা।

বিজয়। আমরা ক্ষুদ্র রাজা, ধর্ম্মই আমাদের সার পদার্থ বলিয়া জ্ঞান আছে. কিন্তু সামান্য মুসলমান হইতে দিল্লিশ্বর পর্য্যন্ত যে কপটাচারী তাহা জানিতাম না।

বাদসাহের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল কহিলেন "বর্ব্বর তুমি জাননা যে কাহার সহিত কথা কহিতেছ।"

বিজয় সিংহ হাসিয়া উত্তর করিলেন "জনৈক কপট বিধর্ম্মির সহিত।"

বাদসাহ। বিজয় সিংহ আমার দোষ নাই, তুমি আপনার পায়ে আপনি কুঠারাঘাত করিতেছ।

বিজয় সিংহ পুনরপি হাসিয়া বলিলেন "কি আপনার নিকট দয়ার প্রত্যাশা করিতে হইবে? বাদসাহ আমি না হয় আমার পায়ে কুঠারা-ঘাত করিতেছি, কিন্তু সরলা কমলা কি অপরাধে ধর্ম্মচ্যুতা হইবে?" বিজয়ের চক্ষু আরও রক্তিমাবর্ণ ধারণ করিল, কহিলেন "কোথায় আপনি অসহায়া রমণীর ধর্ম্মরক্ষা করিবেন, তাহা দূরে থাকুক আপনি তাহার বুদ্ধি কারক; যিনি রক্ষক তিনিই ভক্ষক হইলে আর নিস্তার কোথায়?"

বাদসাহ বলিলেন "যাহা তোমার পিতা পিতামহ সকলে আহ্লাদের সহিত করিয়াছেন, তাহা তুমি না করিবে কেন? ক্ষত্রীরকুলের মনোহর কুসুমগুলি বিধাতা যে দিল্লিশ্বরের পদ সেবার্থ সৃজন করিয়াছেন তাহা কে না জানে?"

বিজয় সিংহ। বন্দীর সহিত বিদ্রূপ করা আপনার ন্যায় বীর পুরুষের কাপুরুষতা মাত্র।

বাদসাহ হাসিয়া কহিলেন "বিজয় সিংহ এতক্ষণে কি জ্ঞান জন্মিল যে তুমি আমার বন্দী।

বিজয়। সে জ্ঞান অনেকক্ষণ জন্মিয়াছে।

বাদসাহ। তবে প্রাণের প্রত্যাশা ত্যাগ করিতেছ কেন?

বিজয়। তোমার ন্যায় পশুর নিকট ক্ষত্রিয় কুমার হইয়া জীবন ভিক্ষা করিব? ধিক্ জীবনে!

বাদসাহ। বিজয় সাবধান! তোমার দিন গণিত হইয়াছে।

বিজয় সিংহ হাসিয়া কহিলেন "ক্ষত্রিয়কুমারকে ভয় প্রদর্শন বৃথা।"

বাদসাহ রক্ষীবর্গেরদিকে ফিরিয়া কহিলেন "অনতিবিলম্বে প্রতাপ সিংহকে আমার সমীপে উপস্থিত কর, আর এই দুই জনকে একটী সতন্ত্র বাসায় রাখিও। আবশ্যক মত সভায় উপস্থিত করিবে। তাহারা "আজ্ঞাশিরোধার্য্য" বলিয়া অভিবাদন করিল; সভাভঙ্গ হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পাষাণে নলিনী।

আরঙ্গজেব বিজয় ও উদয়সিংহ বন্দি হইবার পরেই প্রতাপ সিংহকে কৌশল ক্রমে বধ করিবার নিমিত্ত অনুচর প্রেরণ করেন। রাজপুত্র দ্বয়ের পুনর্ব্বিচার কালে অনুচরগণ আপনাপন কার্য্য সুসিদ্ধ করিয়া প্রতাপ সিংহের ছিন্ন মস্তক সভাস্থলে উপস্থিত করে। পামর দৃকপাত-শূন্য বাদসাহ চিরহিতৈষী বৃদ্ধ রাজার মস্তকে পদাঘাত করিয়া বলেন "উদয় তোমার পিতার অবস্থা দেখ।" কোন কাপুরুষের হৃদয়ে এ দৃশ্য অবলোকন করিলে রাগ না হয়। সুতরাং বিজয় ও উদয় সিংহের ক্রোধাগ্নিতে এ দৃশ্য ঘৃতাহুতি স্বরূপ হইয়াছিল। বন্দিভাব বিস্মৃত হইয়া যদৃচ্ছ কটু বলেন। এই সুযোগে আরঙ্গজেবের ক্ষমা করিবার বাসনা থাকিলেও সেই কটুবাক্যই যেন বাদসাহকে বিশেষ রাগান্বিত করিল, এবং সেই নিমিত্তই তিনি যেন তাঁহাদিগের বধাজ্ঞা দিয়াছেন এই ভাব প্রকাশ করিলেন।

আজি তিন দিবস মাত্র হইল রাজপুত্রদ্বয়ের প্রাণবধের আজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু এখন ও রাজকুমারেরা প্রাণে বিনষ্ট হয়েন নাই। বাদসাহ আরঙ্গজেব বিজয়সিংহের জীবন নিধন করিতে স্থির সঙ্কল্প হইয়াছেন। কমলা দেবীর পানি পীড়ন আশাই কি বিজয়ের মৃত্যুর কারণ হইল? কখনই না, আরঙ্গজেবের হৃদয় দয়াশূন্য হইলেও নিতান্ত পাষাণবৎ ছিল

না। প্রকৃতই আরঙ্গজেব এক জন অবিবেচক রাজপুরুষ ছিলেন না, কিন্তু আরঙ্গজেবের নিকট তাঁহার সিংহাসন অপেক্ষা প্রিয় পদার্থ আর ছিল না, সেই সিংহাসনে অটুট আধিপত্য বিস্তার করিতে আরঙ্গজেব অন্যায় কার্য্যও করিতে পারিতেন, তাহা প্রায় সকলেই স্বীকার করিবেন। বাস্তবিক কি বিজয়সিংহ কোন রাজবিদ্রোহিতা করিয়াছিল! না। তবে কেন বাদসাহ বিজয়সিংহের প্রাণ ব্যতীত সন্তুষ্ট হইবেন না? যে বাদসাহ আপন বৃদ্ধ পিতাকে অম্লানবদনে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে পারিল, যে প্রাণতম প্রিয়পুত্রকে আজীবন কারাবাস আজ্ঞা প্রদান করিতে কুণ্ঠিত নয়, যে পুত্রকে শার্দ্দুলের সহিত সংগ্রাম করিতে অনুমতি প্রদান করিতে পারে, সে যে একজন প্রতাপশালী প্রকৃত ক্ষত্রীয় বীরপুরুষকে যে কোন প্রকারে মৃত দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? এবং সেই বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া যে অন্যায় রূপে প্রতাপ সিংহকে নিধন করিয়াছে, তাহাতেই বা সন্দেহ কি?

বেলা প্রায় সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর, অন্দরের একটি প্রশস্ত প্রকোষ্ঠে পালঙ্কে শয়ন করিয়া বাদসাহ তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে ধুমপান করিতেছেন, পদদেশে একটী রমণী বসিয়া বীজন করিতেছে। রমণীর চক্ষের ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছিল যে রমণী কি বলিবে, কিন্তু কথা আসিতে ছিল না। বাদসাহ বলিলেন "অমিলা! ভাবে বোধ হইতেছে তুমি আমায় কিছু বলিবে।"

অমিলা বিশেষ লজ্জিতা হইয়া বলিল "না, কই না।"

বাদসাহ। আজি তুমি এরূপ ভাবে কথা কহিলে কেন, বোধ হইতেছে যে তুমি আমায় সে কথা বলিতে কুণ্ঠিতা হইতেছ।

অমিলা। আমার একটি অনুরোধ আছে, কিন্তু আপনি রাখিবেন কি?

বাদসাহ। আমি তোমার কোন অনুরোধ না রাখিয়াছি?

অমিলা। সেই জন্য অদ্যও বলিতে সাহসিনী হইয়াছি।

বাদসাহ। তবে বল।

অমিলা। রাজা বিজয়সিংহের প্রাণ আমায় ভিক্ষা দিন।

বাদসাহ। অমিলা তুমি আমার নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ অভিলাষ কর, না রাজবিদ্রোহী বিজয়ের প্রাণ রক্ষা বাসনা কর?

অমিলা যেন শিহরিয়া উঠিল, বলিল "ঈশ্বর জানেন যে আপনার নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ অধিনীর কতদূর বাঞ্ছনীয়, কিন্তু যদি বিজয়সিংহ বিদ্রোহী হয় তাহা হইলে তাহাকে সম্মুখ যুদ্ধে বন্দি করুন, ছলনা দ্বারা বন্দি করিয়া প্রাণবধ করা আপনার ন্যায় বাদসাহের ভাল দেখায় না।

বাদসাহ। যে কোন প্রকারেই হউক না, কেশরী পাশ বদ্ধ হইলেই হইল।

অমিলা। সিংহাসন রক্ষার পথ কি এত হেয়?

বাদসাহের চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, অমিলা করপুটে কহিল "অধিনী না জানি কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছে, আমাকে ক্ষমা করুন।"

বাদসাহ। অমিলা এবার তোমায় ক্ষমা করিলাম, কিন্তু সাবধান আরঙ্গজেবকে যেন ক্ষুদ্র বালিকা হইয়া উপদেশ দিতে ইচ্ছা না করে, লোকে বলে আমার হৃদয় পাষাণ প্রতিম, কিন্তু আমি জানি তাহা পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন, আমি তোমাকে স্নেহ করি তাহা স্বীকার করি, কিন্তু যখন এই পাষাণ উত্তপ্ত হয়" এই বলিয়া আরঙ্গজেব হৃদয় দেখাইলেন "তখন তোমার ন্যায় শত সহস্র স্নেহময়ী কন্যারও অশ্রুসম্পাতে তাহা সিক্ত হইবে না। আমার অবাধ্যতাচরণ করিয়া তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কারাগারে আবদ্ধ রহিয়াছে, মধ্যমেরও সেই দশা করিতাম, কিন্তু সে আমার নিতান্ত বাধ্যবোধে তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়াছি। অমিলা জান যে এ সমস্তই এই দিল্লির সিংহাসন নিষ্কণ্টক করিবার নিমিত্ত। আমি বর্ত্তমানে সকলেরই এইরূপে পক্ষ ছেদিত হইবে। তুমি আজি সেই বিদ্রোহির প্রাণ ভিক্ষা করিয়া গুরুতর অপরাধ করিয়াছ। আবার বালিকা হইয়া আমার ন্যায় বাদসাহকে রাজনীতি শিক্ষা দিতে রত হইয়াছিলে, অমিলা কার্য্য কি উত্তম হইয়াছে? পিতৃ স্নেহ কি তোমার আর সহ্য হয় না?

অমিলা। না পিতঃ আমি সে ভাবে কোন কথা বলি নাই, আমার ইচ্ছা যে আপনার যশ ব্যতীত অযশ যেন ঘোষিত না হয়।

বাদসাহ। আমার অযশ করে এমন লোক কে আছে?

অমিলা। সম্মুখে না করুক, পশ্চাতেও ত করিবে।

বাদসাহ। আমার রাজ্যে বাস করিয়া আমার অযশ করিবে?

অমিলা। পিতা মানব ত চিরস্থায়ী নহে।

বাদসাহ। দিল্লীর সিংহাসন ত' চিরস্থায়ী?

অমিলা। দিল্লীর সিংহাসন চিরস্থায়ী হইতে পারে, কিন্তু এই দিল্লীর সিংহাসনে ত আরও অনেকে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। কই আকবর সাহেবের নাম হিন্দুরা যতদূর প্রাতঃস্মরণীয় বিবেচনা করে, এমন আর কাহার করিয়া থাকে?

বাদসাহ। আকবর সাহ কি আরঙ্গজেব অপেক্ষা রাজ্য সুশাসন করিয়াছিল।

অমিলা। সে কথা এখন কে বলিবে।

বাদসাহ। অমিলা আমি স্ত্রীলোকের মুখে রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা শুনিয়া সুখী হই না।

অমিলা। অধিনী আর এরূপ অপরাধ করিবে না। কিন্তু আমার প্রার্থনার কি হইল?

বাদসাহ কহিলেন "অমিলা আবার ঐ কথা? তুমি কি দিল্লীশ্বরকে বালকের ক্রীড়া কন্দুক বলিয়া বিবেচনা কর?"

অমিলা আর কোন কথা কহিল না। বাদসাহও কোন কথা না কহিয়া সে গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন। অমিলা অবনত মস্তকে অনেকক্ষণ কি ভাবিল। চক্ষে জল আসিল। ধীরে ধীরে চক্ষু মুছিয়া বলিল "আর লজ্জা করিয়া কি করিব, আজি পিতাকে সকল কথাই বলিব।" আবার কি ভাবিয়া বলিল "হয়ত তিনি রাগ করিবেন।" পুনর্ব্বার ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিল "করিলেনই বা, আমার যে সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা অপেক্ষা আর অধিক কিছু কি হইতে পারে?"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

কথা ফুটিল।

বাদসাহ আরঙ্গজেব কাহাকেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন না, পাছে কাহাকেও বিশ্বাস করিয়া পরে প্রতারিত হইতে হয়, এই ভয়ে গোপনীয় কথা কাহাকেও বলিতেন না, বা গোপনীয় কার্য্যের ভারার্পণ করিতেন না, যদিও করিতেন তাহা হইলে সতত উদ্বিগ্ন থাকিতেন। তাঁহার ইচ্ছা হইত যে সকল কার্য্য যেন তিনি স্বয়ং করিতে পারেন, নতুবা সকল অভিষ্ট সিদ্ধ হয় না। রাজ্য সম্বন্ধে অতি গোপনীয় পত্রাদি বাদসাহ স্বয়ং লিখিতেন। অপরাপর বাদসাহের ন্যায় আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি কদর্য্য মত্ততায় দিবা অতিবাহিত না করিয়া তিনি অনেক সময়ে রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণা করিতেন। আরঙ্গজেবের সকল দোষাপেক্ষা এটী মহৎ গুণ ছিল। আজি প্রায় রাত্রি দশ ঘটিকা উত্তীর্ণ হইয়াছে, বাদসাহ বসিয়া ধূমপান করিতে করিতে কি লিখিতেছিলেন। এমত সময়ে অমিলা ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবিষ্টা হইল। বাদসাহ বিশেষ কার্য্যনিবিষ্ট থাকায় তৎকালে তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। রমণী ধীরে ধীরে বাদসাহের অতি নিকটে আসিল, পরে কহিল,—" পিতঃ আমার একটি অনুরোধ আছে। "

বাদসাহ চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন " অমিলা তুমি কি জান না, যে রাত্রে আমি রাজকার্য্যে ব্যস্ত থাকি ? অনুরোধের কি সময় বিচার নাই ? "

অমিলা। পিতঃ যদি তাহাই থাকিবে তবে আপনাকে এ সময়ে বিরক্ত করিয়া কেন অপরাধিনী হইব।

বাদসাহ হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক আলস্য ত্যাগ করিয়া ঈষৎ হাস্যসহকারে কহিলেন "আবার কি অনুরোধ ?"

অমিলা। সেই পূর্ব্ব অনুরোধ, বিজয় সিংহের প্রাণ ভিক্ষা।

বাদসাহ। তোমার ন্যায় বালিকার কি আমার সহিত বাদানুবাদ করা উচিত।

অমিলা। যদি সর্ব্বতোভাবে শ্রেয় না হইবে তবে আপনার চরণে এত ভিক্ষা কেন? বিজয় সিংহের ন্যায় অনেক রাজপুত্রের প্রাণ সংহার স্বচক্ষে দেখিয়াছি, মর্ম্মে ব্যথা পাইয়াছি, কিন্তু আপনার নিকট কবে তাহাদের প্রাণের নিমিত্ত এত অপরাধিনী হইয়াও পুনঃ প্রার্থনা করিয়াছি?

বাদসাহ। বিজয় সিংহের প্রাণ তোমার এত প্রিয় কেন?

অমিলা। বিজয়সিংহ আমার জীবন দাতা, আমার রক্ষা কর্ত্তা, পিতঃ বলিতে কি যদি বিজয়সিংহ না থাকিতেন তাহা হইলে আজ কি আপনার দুহিতাকে দেখিতে পাইতেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃত হই, তখন বিজয়সিংহই আমাকে রক্ষা করেন, আজ যদি আমার রক্ষা কর্ত্তার প্রাণ আপনার চরণে ধরিয়া রক্ষা করিতে পারি তাহা হইলে জীবন সার্থক জ্ঞান করিব।

বাদসাহ হাসিয়া কহিলেন "যিনি সর্ব্বরক্ষক তিনিই তোমার রক্ষা করিয়াছিলেন বিজয়সিংহ কে?

অমিলা। তবে কি উপকারের প্রত্যুপকার নাই?

বাদসাহ রোষ সহকারে কহিলেন "আছে, কিন্তু বিরুদ্ধাচারীর নহে।

অমিলা। বিজয়সিংহ কি প্রকৃতই কোন বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে।

বাদসাহ চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিলেন "সর্ব্বতোভাবে করিয়াছে।"

অমিলা আর থাকিতে পারিল না, কাঁদিতে লাগিল; বাদসাহ বলিলেন "রমণীর ক্রন্দনে আরঙ্গজেবের হৃদয় বিগলিত হইবে না।"

অমিলা কাঁদিতে কাঁদিতে জানু পাতিয়া উর্দ্ধমুখে করপুটে মনে মনে বলিল "হে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর এই ভয়ানক সময়ে অধিনীকে রক্ষা কর, হে দয়াময় যে অতুল্য দয়া পরবশ হইয়া একদা এ হতভাগিনীর প্রাণ ও সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন আজি সেই দয়া প্রভাবে অধিনীর সর্ব্বস্বধন বিজয়সিংহের প্রাণ রক্ষা কর।" পরে বাদসাহের দিকে ফিরিয়া বলিল "পিতঃ যিনি আমার শৈশবাবধি কেবল আমার সুখ সাচ্ছন্দ্য খুঁজিয়া আসিতেছেন, আজি তিনি কি আমায় বিষাদের অতল সাগরে নিমগ্ন করিবেন? জিনি আমার জীবন রক্ষার জন্য কত ক্লেশ কত আয়াস স্বীকার করিয়াছেন, তিনি কি আজি আমায় বিনষ্টা ও বিগতপ্রাণা দেখিয়া

খী হইবেন? পিতঃ! বলিতে কি যদি বিজয়সিংহ কল্য বধ্য ভূমিতে প্রাণত্যাগ করেন, তাহা হইলে এ অধিনীকে আর এ জন্মে দেখিতে পাইবেন না, কাণ্ড ছেদিত হইলে কি শাখা প্রশাখা শুকায় না? বলিতে কি বিজয় সিংহই আমার প্রাণেশ্বর, বিজয়সিংহের চরণে আমি বহুদিন হইতে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি, অতঃ অধিনীর প্রতি দয়া প্রকাশ করুন, আমার বিজয়সিংহের প্রাণ ভিক্ষা দিন।"

বাদসাহ চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন "সয়তানি! সিংহ-সুতা হইয়া শৃগাল সহবাস অভিলাষ করিয়াছ? তোমার জীবনে ধিক্!"

অমিলা নীরবে রোদন করিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে বাদসাহ বলিলেন "অমিলে! একথা বোধকরি তোমার অবিদিত নাই যে আমার সকল সন্তান অপেক্ষা আমি তোমায় অধিক ভালবাসি, কিন্তু সেই ভালবাসার কি এই বিনিময়? কোথায় তোমায় কোন যবন কুল তিলক নবাবের হস্তে সমর্পণ করিয়া সুখী হইব, না তুমি অস্পৃশ্য হিন্দু প্রেমাসক্ত। অমিলা তুমি আমার নিকট স্বীকার কর যে আর তুমি বিজয়সিংহের প্রতি ফিরিয়াও তাকাইবে না।"

অমিলা কাঁদিতে লাগিল কোন উত্তর করিল না। বাদসাহ পুনরপি কহিলেন "অমিলে! বল, আমায় পরিতৃপ্ত কর।"

অমিলা। আপনি স্বীকার করুন যে বিজয়সিংহের প্রাণ ভিক্ষা দিবেন।

বাদসাহ। পুনর্ব্বার আমার আজ্ঞা অবহেলা।

অমিলা। আপনি আমার একটি প্রার্থনা শুনিতে পারিলেন না, তবে আমি কোন আশায় আমার ফল ফুলে পরিশোভিত আশা লতা ছিন্ন করিব?

বাদসাহ। অমিলা তুমি বালিকা বুদ্ধিহীনা, বিজয়সিংহ ত মরিবে, আমি তোমার সুখানুসন্ধান করিতেছিলাম কিন্তু তুমি আপনার পায় আপনি কুঠারাঘাত করিতেছ। এখনও আমার প্রস্তাবে সম্মত হও।

অমিলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "বাদসাহ আমায় একটি ভিক্ষা দিন, বিজয়সিংহকে প্রাণে বধ করিবেন না।"

বাদসাহ চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিলেন "আবার সেই কথা, অবাধ্যাচরণ করিয়া তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা কারাগারে কত কষ্টে দিনযাপন করিতেছে তাহা কি তুমি জান না?

অমিলা। পিতঃ কি ভয় দেখাইতেছেন। অমিলাকে এত দুর্ব্বলা বিবেচনা করিবেন না। যদি বাসনা হইয়া থাকে তবে না হয় আমারও সেই দশা করুন?

বাদসাহ। পাপিয়সি তোর ভাগ্যে কারাবাস ত সৌভাগ্যের কথা।

অমিলা। না হয় পিতৃদত্ত শোণিতে তাঁহারই চরণ বিধৌত করিব।

বাদসাহ। তাহাই হইবে, অগ্রে তোমার প্রতি অনুরক্ত বিজয়সিংহের দুরাবস্থা কল্য স্বচক্ষে দেখিও। কল্য প্রাতেই তাহার মাংস শত শত কুক্কুরের ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করিবে।

অমিলা বাদসাহের পদপ্রান্তে পড়িয়া কহিল "পিতা এরূপ কঠিন আজ্ঞা দিবেন না, না জানিয়া কত অপরাধ করিয়াছি আমায় ক্ষমা করুন। বিজয়সিংহের কোন অপরাধ নাই।

বাদসাহ। কুক্কুর সাবক বিজয়, বামন হইয়া চন্দ্রস্পর্শ সাধ? কাফের হইয়া আমার কন্যা অমিলার পানিপীড়নে অভিলাষ? কুক্কুর দংশনে প্রাণত্যাগ অপেক্ষা কোন গুরুতর শাস্তি থাকিলে তাহাই তোর প্রতি আজ্ঞা করিতাম।

অমিলা। পিতঃ ক্ষমা করুন, বিজয়সিংহ আমার প্রতি অনুরক্ত নহেন, হতভাগিনীই তাহার প্রতি অনুরাগিণী।

বাদসাহ। সে সয়তান কোন্ সাহসে দিল্লীশ্বরের কন্যাকে এতদিন স্বগৃহে রাখিয়াছিল?

অমিলা। পিতঃ বিজয়সিংহ জানিতেন না যে আমি আপনার কন্যা।

"আমি দুশ্চরিত্রার কথা শুনিতে চাই না।" এই কথা বলিয়া বাদসাহ সজোরে পদস্খলিত করিয়া অমিলাকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। পতনকালে পালঙ্কের আঘাত তাহার মস্তকে গুরুতর রূপে

লাগিল। অমিলা মূর্চ্ছিতা হইয়া নিবাতনিষ্কম্প ছিন্ন তরুর ন্যায় পতিতা হইল। বাদসাহ চলিয়া গেলেন। মূর্চ্ছিতা দুহিতার প্রতি ফিরিয়াও দেখিলেন না।

সমাজ-রহস্য।

সধবার বিবাহ।

প্রাচীন ভারতের পুরুষগণ যখন স্বচ্ছন্দবিহারী ও রমণীমণ্ডলী যে সময়ে যথেচ্ছবিহারিণী ছিলেন, পবিত্র দাম্পত্য-প্রণয়-সুখ-উপভোগ করিতে জানিতেন না, সে সময়ের কথা বলিতে পারি না এবং তাহার অনুসন্ধান করিতেও অদ্য অভিলাষী নহি। কিন্তু যে সময়ে পবিত্র বিবাহ-বন্ধন-প্রথা ভারতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; যখন পুরুষেরা নারীগণকে দেহের অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপ এবং রমণীগণ স্ব স্ব পতিকে পরম-আরাধ্যদেবতা-জ্ঞান করিয়া পবিত্র দাম্পত্য-প্রণয় সুখে জীবন অতিবাহিত করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, তখন ভারতের কি মোহিনীমূর্ত্তি ছিল। সে মূর্ত্তি আর্য্য-ঋষিগণের নিকট কিরূপ আদরনীয় ছিল, তাহা তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন।

কতকাল এ মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছে তাহার প্রকৃত সময় অবধারণ করিবার উপায় নাই। অনেকের মতে আর্য্যদিগের প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র বেদের সারভাগ উপনিষদে যে ত্রিকালজ্ঞ বেদবিৎ ঈশ্বরতত্ত্বানুসন্ধায়ী বালক শ্বেতকেতুর নাম অবগত হওয়া যায়, সেই শ্বেতকেতুর জননীই নাকি প্রথম বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধা হইয়াছিলেন। একথা সত্য হইলে বলিতে পারা যায়, বহু যুগযুগান্ত হইল যখন পৃথিবীর অন্যান্য জাতিরা অসভ্যাবস্থায় বনে বনে ভ্রমণপূর্ব্বক ফল মূল মৃগমাংসাদি ভক্ষণ করিয়া জীবন-

যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, তখন ভারতবাসিরা দাম্পত্য-প্রণয়ের পবিত্র-সুখ উপভোগ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ভারত বহুদিন হইতে সতীত্বের জন্য বিখ্যাত হইয়াছে। অতুলনীয়া ভারতললনার সতীত্বের তুলনা নাই। সতীত্বই ভারতীয় রমণীগণের একমাত্র ভূষণ। পতিরতা সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী, আর কোন্ দেশে দেখিতে পাওয়া যায়? পাঠক! কল্পনা-চক্ষে সাবিত্রী সতীর সেই ঘোর দুর্দ্দিনের কাল-নিশীথিনীর সেই দারুণ অবস্থা দেখুন দেখি, কৃষ্ণপক্ষীর চতুর্দ্দশী তিথিতে আকাশমণ্ডল ঘোর ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছে, অল্প অল্প বারিপাত হইতেছে, বিদ্যুৎ-ঝল্‌সিতেছে, বজ্রপাত হইতেছে, এমত কালরজনীতে সিংহ ব্যাঘ্রাদি সিংহশ্বাপদ-সঙ্কুল ঘোর বিজন অরণ্যমধ্যে একাকিনী অন্ধরাজ দ্যুমৎসেন তনয় স্বীয় মৃত পতি সত্যবানকে বক্ষে ধারণ করিয়া বীরা রমণীর ন্যায় নির্ভয়চিত্তে নয়নজলে কেমন তাঁহার চরণ ধৌত করিয়া দিতেছেন! বলুন দেখি এরূপ পতিব্রতা রমণী আর্য্যকুলের লক্ষ্মীস্বরূপিনী কিনা? কোন্ দেশের কয়জন রমণী জীবনকে তৃণজ্ঞান করিয়া এরূপ দুরূহ প্রশংসনীয় কার্য্যানুষ্ঠান করিতে সক্ষম?

পূর্ব্বে ভারত শৌর্য্য, বীর্য্য, বিদ্যাবুদ্ধি সকল বিষয়েই পৃথিবীর আদর্শ স্বরূপ ছিল। আমাদিগের মন্দবুদ্ধিবশতঃ সে সকলেরই ক্রমশঃ লোপাপত্তি হইয়া যাইতেছে। ভারতীয় ললনাগণের সতীত্ব ভিন্ন আর কোন বিষয়ে আমাদিগের গৌরব ও শ্লাঘা প্রকাশ করিবার পথ নাই। কিন্তু দেখা যাইতেছে কতকগুলি কারণ পরম্পরায় সে পথও বন্ধ হইতে চলিল। বৈদ্যশাস্ত্রে সুশ্রুতে লিখিত আছে, "উনষোড়শ বর্ষায়াম প্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিং যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে। দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ তস্মাদত্যন্ত বালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ।" অর্থ,—পঞ্চবিংশতি বর্ষের ন্যূন বয়স্ক পুরুষের দ্বারা যদি ষোড়শ বৎসরের ন্যূন বয়স্কা কন্যার গর্ভ উপস্থিত হয়, তবে সেই গর্ভ নষ্ট বা পুত্র জন্মিলে অল্পায়ুবিশিষ্ট বা জীবিত থাকিলে ইন্দ্রিয়ের দৌর্ব্বল্য ঘটে; অতএব বালিকার গর্ভাধান সর্ব্বতোভাবে অকর্ত্তব্য। এই সুসময় ও হিতজনক পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া যে স্মৃতিশাস্ত্রকার "অষ্টবর্ষা ভবেদ্গৌরী নববর্ষাতু রোহিনী।

দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥ সংপ্রাপ্তে দশমেবর্ষে কন্যাং যো ন প্রযচ্ছতি। মাসি মাসি রজস্তস্যাং পিতা পিবতি শোণিতং॥ মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তথৈবচ। ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্টা কন্যাং রজস্বলাং।” এই শাস্ত্রদ্বারা আট বৎসরের কন্যার বিবাহ দিলে গৌরী-দানের ফল হইবে বলিয়া ব্যবস্থা প্রণয়ন পূর্ব্বক দশ, এগার বৎসর বয়স্কা বালিকাকেঁ (১) সন্তানের জননী হইতে ও অল্পবয়সে বিধবা হইয়া সংসার-সুখে জলাঞ্জলি দিতে পরামর্শ দিয়াছেন যে বল্লালসেন (২) কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রচলন ও দেবীবর ঘটক মেলবন্ধন করিয়া দিয়া অল্পবয়স্কা কুলীন কন্যাকে অযোগ্য বানপ্রস্থ ধর্ম্মের উপযুক্ত বয়স্ক পাত্রে অর্পণ করিতে দিয়া প্রায় যৌবনসুখ পরিতৃপ্ত করিবার পূর্ব্বে সিমন্তের সুন্দর সিন্দুর বিন্দু মুছিয়া ফেলিতে দিয়াছেন, বলিতে কি তাহারা ও অন্যান্য ব্যক্তিরা প্রকারান্তরে আমাদের এই গৌরবের পথ বন্ধ করিয়াছেন!

আর পূর্ব্বের ন্যায় আর্য্যরমণীগণের প্রায় সৎশিক্ষা ও সত্যনিষ্ঠা নাই। এ অবস্থায় বাল্য কালে বিবাহ পাশে বদ্ধ হইয়া যৌবনের পূর্ব্বে কি যৌবন সুখ পরিতৃপ্তির সময় স্বামিধনে বঞ্চিতা হইলে রমণীগণ কিরূপে বিশুদ্ধ ভাবে দীর্ঘজীবন অতিবাহিত করিতে পারেন? ব্রহ্মচর্য্যব্রতানুষ্ঠান বড় সহজ কথা নহে। সহমরণ ত পাপাত্মাগণের ব্যবস্থা! সুতরাং তাহারা বিষমসঙ্কটে পড়িয়া—ইন্দ্রিয় সংযমন করিতে না পারিয়া সতীত্ব ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া ভারতকে ভ্রূণ হত্যা রূপ ঘোর পাপে কলঙ্কিত না করিয়া যে পুনরায় বিবাহার্থিনী হইবে, এ বড় আশ্চর্য্যের কথা নহে। এ প্রস্তাব বহুগুণে উত্তম বটে। ভারতের কয়জন পুরুষ স্ত্রীবিয়োগে পুনরায় বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক?

প্রতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গীয় হিন্দু বিধবা রমণীগণের

(১) বালিকা বলিব না পূর্ণ যুবতী বলিব পাঠক! কি বলিব? মানবধর্ম্মসাস্ত্র প্রণেতা ভগবান্ মনু কিন্তু ষোড়শ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কন্যা কাল বলিয়া গিয়াছেন।

(২) বল্লালসেন নবধাগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সম্মানার্থ কুলিন উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু কালক্রমে গুণগত না হইয়া কুলীন উপাধি বংশগত হইয়া পড়িয়াছে। এ দোষ তাঁহার নহে। তিনি যথার্থ গুণজ্ঞ মানুষ ছিলেন। এ দোষ হতভাগিনী কুলীন কন্যাদের অদৃষ্টের।

পুনর্ব্বিবাহের জন্য যে রূপ কঠিন যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন, এতদিনের পর আমরা দেখিতেছি মান্দ্রাজ বাসিনী রমণী মণ্ডলী তাঁহার সেই পরিশ্রমের পুরস্কার দিতে যত্নবতী হইয়াছেন। সংপ্রতি তথাকার কতকগুলি বিধবা একত্রিত হইয়া মহারাজ্ঞী ভারতেশ্বরীর নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, এবং প্রার্থনা করিয়াছেন যাহাতে হিন্দুবিধবা রমণীগণের পুনর্ব্বার বিবাহ হয় তাহার জন্য যেন একটী আইন প্রণয়ন করিয়া দেন। এ আবেদনের ফল কি হইল, তাহা অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই।

মান্দ্রাজবাসিনী যে সকল যুবতী হিন্দু বিধবা রমণীরা আবেদন করিয়াছেন, তাঁহাদের অদৃষ্ট বৃক্ষে কি ফল ফলিবে, তাহা মহারাজ্ঞীই বলিতে পারেন। সে পরিণাম চিন্তা করিবার এস্থলে কোন আবশ্যকতা দেখিতেছি না। কিন্তু এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, ভারতীয় রমণী গণের চরিত্র অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; তাঁহারা উন্নতি সোপানে আরোহণ করিতে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। এই সময়ে কতকগুলি হিন্দু-সধবা রমণীগণেরও যাহাতে পুনর্ব্বার বিবাহ হয়, আইনানুসারে যাহাতে তাঁহারাও বিবাহ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করা নারীহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। যে কারণে হিন্দুবিধবারা আইনানুসারে পতিপ্রার্থিনী হইয়াছেন, যদি সে কারণ কতকগুলি হিন্দুসধবা রমণীগণের পক্ষে বিদ্যমান থাকে, তবে তাঁহাদের জন্যও যত্ন করা কেন না কর্ত্তব্য হইবে? যদি এক উদ্যোগে দুইটি কার্য্য সম্পন্ন হয়, তবে তাহার অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে? যে নারী সমাজের অর্দ্ধাঙ্গিণী স্বরূপিনী, আর তাঁহাদিগকে অন্তঃপুরাবদ্ধা রাখিয়া দারুণ ক্লেশে দিনযাপন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। পক্ষিনীকে যদি সুবর্ণ পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখা যায়, আর তাহাকে অমৃতসম উপাদেয় ফল ভোজন করিতে দেওয়া হয়, তাহার পক্ষে সে যেমন প্রার্থনীয় নহে, প্রত্যুত দারুণ ক্লেশকর হইয়া থাকে; সেই অবলা রমণী পক্ষিণীকে পিঞ্জর-রূপ অন্তঃপুরে বদ্ধ রাখিয়া তাহাকে সহস্র অলঙ্কার দেও, লক্ষ উত্তম খাদ্য প্রদান কর, একমাত্র স্বাধীনতা ও স্বামীসুখ বিহনে তাহার সে স্বর্গ সুখও নরকতুল্য বোধ হইয়া থাকে। স্বামীধন রমণীর পক্ষে দেবদুর্ল্লভ অমূল্যরত্ন।

যাহা হউক একথা যাউক—সধবাদিগের বিবাহের কথা শুনিয়া হয়ত অনেক পাঠকেরা আমাদিগের উপর একবারে খড়্গহস্ত হইবেন এবং বলিলেন, "এ প্রলাপগ্রস্থ ব্যক্তি কোথা হইতে আসিল? সধবাদিগের আবার বিবাহ কেন?" বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? যাহাদের স্বামী বর্ত্তমান তাহাদের বিবাহের প্রস্তাব কি প্রলাপগ্রস্থ ব্যক্তির প্রলাপ বাক্য নহে? যদি কেহ এরূপ বলেন, তবে বলিতে হইল আমরা প্রলাপগ্রস্থ নহি, সত্য কথাই বলিতেছি। বিবাহের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। পবিত্র-দাম্পত্য সুখ উপভোগের জন্যই বিবাহ। যে বিবাহে নর নারী পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসার ন্যায় জগৎসংসারকে ভালবাসিতে শিক্ষা করিতে পারেন; যাহার পবিত্র বীজ হইতে সেই স্বর্গীয় অক্ষয় প্রণয় বৃক্ষোৎপন্ন হইতে পারে তাহার নামই প্রকৃত বিবাহ। কিন্তু এরূপ বিবাহ কয়জনে করিয়া থাকেন? অধিকাংশ ব্যক্তির সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিই কি বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে? যদি প্রকৃত উদ্দেশ্য না হইবে তবে বঙ্গদেশের বহুতর বৃদ্ধ ৩। ৪ বিবাহ ও পুন্নাম নরকোদ্ধারের জন্য চারি পাঁচটি পুত্র-রত্নলাভ করিয়াও আবার স্ত্রীবিয়োগ হইতে না হইতে কেন আইবড় সুতা হস্তে বাঁধিয়া থাকেন? বাঙ্গলার কয়জন লোকে পত্নীবিয়োগে আর বিবাহ করেন না? তাই বলি আমাদের অনেকের বিবাহ আদৌ বিবাহ নামের যোগ্য হইতে পারে না। এই বিবাহ কেবল ইন্দ্রিয়সুখ পরি-তৃপ্তির জন্য; পবিত্র প্রণয়সুখ ইহাতে কোথায়?

যদি বঙ্গসমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য ইহাই হইল, তবে বিধবারা এ সুখভোগে অধিকারিণী কেন না হইবে? এ সুখে বঞ্চিতা হইয়া জীবনধারণ করা কি বাস্তবিকই তাহাদের পক্ষে বিড়ম্বনার বিষয় নহে? এখন যেরূপ সময় পড়িয়াছে, হিন্দুরমণীগণের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়াছে; তাঁহারা যেরূপ জ্ঞান ধর্ম্মবিহীনা; তাহাতে রক্ত মাংসের শরীরে জীবিত মনুষ্য হইয়া চিরদিন বৈধব্যানলে দগ্ধ হইতে হইতে ইন্দ্রিয়গণের সহিত ঘোর যুদ্ধ করা কি সহজ কথা? স্বভাবের সহিত বিবাদ করিয়া যখন দেবাদীদেব মহাদেব পর্য্যন্ত পরাস্ত হইয়াছেন, তখন অবলা রমণীগণের পক্ষে দুর্ব্বার নিসর্গবিকার দমন বড়

অসম্ভব কথা! এই সময়ে পরাস্ত হইয়া যদি কেহ গোপনে অসৎপথাবলম্বিনী হইয়া পড়েন, তবে আমাদের সমাজ যেরূপ কঠিন, ঘুণাক্ষরে সে কথা শুনিতে পাইলে সে রমণীকে সমাজচ্যুত করিয়া একবারে তাহাকে কলঙ্কসাগরে ভাসাইয়া দেন। আর তাহার উদ্ধারের কোন উপায় থাকে না। সেই জন্য ভারত ভ্রূণহত্যারূপ ঘোর পাপভারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ভারতমাতাকে ঘোর পাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই বিধবারা বিবাহ প্রার্থিনী হইয়াছেন। উত্তম পরামর্শ করিয়াছেন।

যে কারণে বিধবারা পুনঃ পরিণীতা হইতে অভিলাষিনী হইয়াছেন, সে কারণ সমাজস্থ অনেক সধবা রমণীর পক্ষে বিদ্যমান আছে কিনা এস্থলে ইহা দেখা আবশ্যক হইতেছে। যদি থাকে তবে তাঁহাদিগেরও পুনরায় বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য, এ বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। কেননা বিধবারাও যেমন রক্তমাংসে নির্ম্মিতা, তাঁহারাও সেইরূপ রক্তমাংসে নির্ম্মিতা! আর তাঁহাদেরও বিধবাদিগের ন্যায় নিসর্গ-বিকার আছে। ও সেই বিবাহের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সর্ব্বদা দারুণ অভিলাষ জন্মিয়া থাকে। যদি না বুঝিতে পারিয়া দারুণ বিকারের সময় কুপথ্য করিয়া কেহ ভয়ানক রোগ করিয়া বসেন, তবে তাহা সমাজের পক্ষে নিন্দনীয় ও কলঙ্ককর বিষয় হয় কিনা? সত্য বটে সধবারা বিধবাদিগের অপেক্ষা এ বিষয় অনেকাংশে গোপন করিতে পারেন এবং সমাজ ও স্বামীকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইয়া আপন সতীত্ব প্রদর্শনের জন্য জনৈক সতীভানকারিণী রমণীর ন্যায় সদর্পে বলিতে পারেন, "আমি যেই সতী নারী অন্য নারী হলে; কুপথ্য করিত কত জম্মে যেত পীলে।" এই কথা বলিয়া সমাজের ন্যায় কি ঈশ্বরকে প্রতারিত করিতে পারেন? কখনই না। ধর্ম্মদ্বারে তাঁহাকে অবশ্যই কলঙ্কিনী হইতে হয়। বাহ্যশত্রু, বাহ্যরোগ অপেক্ষা গুপ্তশত্রু, গুপ্তরোগ যে ভয়ানক অনিষ্টকারী, একথা সকলে স্বীকার করুন আর না করুন, দেববৈদ্য ধন্বন্তরীকে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। বাহ্যশত্রু, কি বাহ্যরোগের প্রতিকার আছে কিন্তু গুপ্ত শত্রুর, গুপ্তরোগের প্রতিকার নাই। ইহার প্রতিকার শিবের পিতামহের অসাধ্য? তাই বলিতেছি, অগ্রে অন্তর্শত্রুর প্রতিকার করা সর্ব্ব-

তোভাবে কর্ত্তব্য। ইহাতেও গুপ্তভাবে, অনেকস্থলে প্রকাশ্য ভাবেও সমাজের বহু অনিষ্ট হইতেছে।

আমাদের এই কথায় পাঠকেরা আবার বলিতে পারেন; আমাদের সমাজে এরূপ গুপ্তশত্রু কি সত্য সত্যই আছে? যদি থাকে তবে তাহারা কে? তদুত্তরে বলি—যখন সমাজের মঙ্গলসাধন ও অনাথিনী স্বামীসত্বেও বিধবা রমণীগণের জন্য আমাদিগকে লেখনী ধারণ করিতে হইয়াছে—তখন চক্ষু লজ্জায় পড়িয়া সত্য কথা গোপনে ফল কি? ইহাতে ন্যায়তঃ পাপ আছে। যাঁহারা সংবাদ পত্র পাঠ করিয়া থাকেন, কিম্বা সমাজের অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া দেখেন; তাঁহারা অবশ্যই অবগত আছেন বৎসর বৎসর কত লোক এই গুপ্ত শত্রুর হস্তে পড়িয়া ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া শান্তিভঙ্গ করতঃ রাজদ্বারে অভিযুক্ত ও দণ্ডপ্রাপ্ত হইতেছেন। তবে আর অধিক কথা বলিবার আবশ্যকতা কি? গুপ্তশত্রুর, গুপ্তরোগের গোপনে গোপনে শীঘ্র প্রতিকার করাই কি কর্ত্তব্য নহে?

অতঃপর বলা আবশ্যক কোন্ সধবারা সমাজের গুপ্ত শত্রু। যাঁহারা স্বামীসত্বেও বিধবা, বিধবার ন্যায় চিরদিন মহাক্লেশে দিনযাপন করিয়া থাকেন; এক দিনও প্রাণ ভরিয়া স্বামীমুখ নিরীক্ষণ করিতে পান না বলিয়া ইন্দ্রিয় বিকার দমনের জন্য গোপনে অসৎ পথাবলম্বিনী হইয়া থাকেন; তাঁহারাই সমাজের অন্তর্শত্রু। বলিতে কি আশা করি সত্য কথা প্রকাশে কেহই অসন্তুষ্ট হইবেন না—বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে (অন্য সমাজের কথা বলিতেছি না) যে সমস্ত কুলীন সন্তান বিবাহ ব্যবসায়ী হইয়া একবারে বহুবিবাহ করিয়া অনেক অবলার সংসার-সমুদ্রের একমাত্র ধ্রুবনক্ষত্র হইয়া থাকেন; ভার্য্যাকে ভরণ পোষণ করেন না; তাঁহাদের সুখ দুঃখ দেখেন না, সাংখ্যদর্শন কারের বর্ণিত পুরুষের ন্যায় প্রকৃতিতে নিঃসঙ্গ ও নির্লিপ্ত হইয়া অবস্থিতি করেন; যাঁহাদের প্রকৃতিতেই কেবল সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বশক্তি আছে সেই সকল মহাকুলীনগণের—যে সকল ব্যক্তি বিবাহ করিয়া অধিকাংশ সময় প্রবাসে একাকী বাস করিয়া থাকেন সেই সকল দীর্ঘপ্রবাসী গণের—যাঁহারা চিররুগ্নাবস্থায় বিবাহ করিয়া পত্নীকে যাবজ্জীবনের জন্য অনন্ত দুঃখসাগরে ভাসাইয়া থাকেন

সেই সকল চিররোগী ব্যক্তিগণের—আর যে সকল ব্যক্তিরা অবলা সহধর্ম্মিনীকে উপেক্ষা করিয়া সর্ব্বদা সুধাপানে উন্মত্ত হইয়া বারবিলাসিনী লইয়া দিন অতিবাহিত করেন, ভুলিয়াও একদিনের জন্য গৃহে অবস্থিতি করেন না; স্বগৃহ যাঁহাদের পক্ষে কারাগার স্বরূপ; সেই সকল সুরাপায়ী ব্যভিচারাসক্ত ব্যক্তিগণের অধিকাংশ সধবা রমণীরাই আমাদের সমাজের গুপ্তশত্রু। সকলেই যে শত্রু একথা কে বলিতে পারে? একথা বলায় মহা প্রত্যবায় আছে। যাঁহাদের অভাব আছে তাঁহারাই সমাজের প্রায় শত্রু হইয়া থাকেন; কিন্তু যাঁহাদের কোন অভাব নাই বা যাঁহারা জ্ঞানধর্ম্মে বিভূষিতা দারুণ সঙ্কটেও তাঁহারা কথন ধর্ম্মপথভ্রষ্ট হয়েন না।

ক্রমশঃ

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

বিজ্ঞান দর্পণ। সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচন। শ্রীপ্রাণানন্দ কবিভূষণ সম্পাদিত চিকিৎসাতত্ত্ব যন্ত্র—কলিকাতা।

এতদিনে বিজ্ঞান বিষয় সম্বন্ধীয় মাসিক পত্র প্রচারিত হইল। এতদিন যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ কোন মাসিক পত্রে প্রচারিত হইতেছিল না, তাহা বলিতেছি না। তবে কোন পত্রিকা বিজ্ঞান আলোচনায় বাধ্য ছিলেন না। আমাদের বোধ হয় বিজ্ঞান দর্পণ সমধিক বিজ্ঞান আলোচনা করিতে বাধ্য, এবং সেই নিমিত্তই পত্রটীর নাম বিজ্ঞান দর্পণ হইয়াছে।

অনেক মাসিক পত্রে বহুল বা অল্প পরিমাণে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ না থাকায় অনেক সম্পাদক তত্তৎপত্র সমালোচনায় তাহা উল্লেখ করিতে ক্রটী করেন নাই, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় যে সকল পত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য

সাহিত্যের উন্নতি চেষ্টা মাত্র, তাহাতে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত না হইলে তাহার সম্পাদককে দোষ দিতে পারি না। বিজ্ঞান পাগলামি আজ কাল অনেকের ইংরাজির অনুকরণ; ইংলণ্ড নাকি আজকাল বিজ্ঞান বিজ্ঞান বলিয়া চীৎকার করিতেছে, এ অবস্থায় বঙ্গের শিক্ষিত ও A হইতে Z পর্য্যন্ত উপাধিধারী হইয়া কেননা বিজ্ঞানের নিমিত্ত পাগল হইবেন। প্রকৃত পক্ষে ইংলণ্ডে—সাহিত্য উন্নতির শেষ সোপানে আরূঢ়, এবং বিজ্ঞানের অভাব হইয়াছে বটে, কিন্তু আমাদের কি?—সাহিত্য এখন বালিকা, তাহার পূর্ণ যৌবন যে কবে হইবে তাহারও স্থির নাই। এ অবস্থায় বিজ্ঞানের জন্য বিশেষ পাগল হইবার কারণ দেখি না। তবে যে একেবারে বিজ্ঞানালোচনার আবশ্যক নাই তাহা বলিতেছি না। প্রথমতঃ সাহিত্যের যাহাতে বিশেষ উন্নতি হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত। যে বাঙ্গলার এখন ব্যাকরণ হইল না, সেই বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি করিয়া শেষ বিজ্ঞানে মনোনিবেশ করিলে আরও ভাল দেখায়।

আমরা আশা করি যে সকল পাঠকেরা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ভালবাসেন, মাথা ঘুরাইতে যাঁহারা বারেকও ইচ্ছুক, তাঁহারা যেন বিজ্ঞান দর্পণ গ্রহণ করেন। ইহাতে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি অতি পরিষ্কার রূপে সরলভাষায় লিখিত হইয়াছে। ইহাতে "মনোযোগ" "আর্য্যজাতির জ্ঞান বিজ্ঞান" "দীপশিখা" "চার্লস্ রবার্ট ডারুইন্" "আর্য্যজাতির ব্যাকরণ শাস্ত্র" এই কয়েকটী বিষয় লিখিত হইয়াছে, সকল গুলিই লেখকগণের বিজ্ঞতার পরিচয় দিতেছে। বিজ্ঞান দর্পণ যদ্যপি বাঙ্গালির নিকট আদর পায় তাহা হইলে বাঙ্গালির বিজ্ঞানে প্রকৃত কি মৌখিক আদর জন্মিয়াছে বুঝা যাইবে। যাহাই হউক আমরা বিজ্ঞান দর্পণের স্থায়িত্ব কামনা করি।

দশাস্য সংহার। (কাব্য) শ্রীশশিভূষণ মজুমদার বিরচিত। কলিকাতা রায় যন্ত্র। মূল্য ১৲ টাকা।

এই কাব্যখানি গদ্য ও অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত। পাঠকালীন প্রতীতি জন্মে যে গ্রন্থকারের অমিত্রাক্ষর ছন্দে পদ্য লিখিবার বিশেষ ক্ষমতা আছে,

তাঁহার কবিতা শব্দাড়ম্বরময়ী হইলেও মধুর এবং ভাবযুক্ত, পাঠে পরিতৃপ্তি জন্মে। গ্রন্থকার মাইকেল উপাসক। সুতরাং বোধহয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক স্থানে মাইকেলের অনেক ভাব অনেক কথা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। গদ্যাংশে গ্রন্থকার ততদূর কৃতকার্য্য হয়েন নাই, শব্দ প্রিয়তাই তাহার মূলীভূত কারণ। শব্দাড়ম্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ভাষার মধুরতা সম্পাদন করিতে পারেন নাই। যাহাই হউক সংক্ষেপতঃ আমরা ইহা স্বীকার করিতে পারি যে দর্শাস্থ্য সংহার পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। আমরা মনে করিয়াছিলাম যে গ্রন্থকারের শব্দাড়ম্বর প্রিয়তার কতকটা পরিচয় দিব, কিন্তু স্থানাভাবে তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। সে যাহাই হউক পাঠকগণ পুস্তকের নাম পাঠ করিয়াই, আমাদের বাক্যের কতকটা সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

কুসুমাঞ্জলি। শ্রীমোজাম্মেল হক্ কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। করপ্রেস্ কলিকাতা।

আমরা গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। ভাষা মুসলমানের ন্যায় নহে। স্থানে স্থানে কবিত্বের স্ফূর্ত্তি আছে। তবে মধ্যে মধ্যে শব্দের প্রতি কিছু বেশী দৃষ্টি দেখাগেল, আশা করি কালে এরূপ অতি রঞ্জনের হ্রাস হইবে। যাহাই হউক আমরা গ্রন্থকারকে প্রসংশা করি।

উষাহরণ। (গীতিনাট্য বা অপেরা) শ্রীরাধানাথ মিত্র কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা।

এ অপেরাখানি নিতান্ত মন্দ নয়। বোধকরি ইহার অভিনয় সুন্দর রূপে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ইহার অধিকাংশ গীতগুলিই মধুর ও সতর্কতার সহিত সুরলয়ে গঠিত।

পলায়িত অপরাধীর অনুসন্ধান।

মনুষ্য যখন যে কার্য্যে থাকে তখন তাহার মন তদ্বিষয়ের চিন্তাতেই মত্ত থাকে—অন্য চিন্তা করে না; রাজা রাজপদে থাকিয়া রাজ্যের চিন্তা করেন, কিসে তাঁহার প্রকৃতি পুঞ্জের সুখসমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হইয়া রাজ্যের শ্রী, সৌভাগ্য বৃদ্ধি পাইবে তাহারই চিন্তা করেন, আবার নিষধের নল, অযোধ্যার রামচন্দ্র, ইন্দ্র প্রস্থের যুধীষ্ঠির, ফরাসীর বোণাপার্টি এবং লুই-নেপোলিয়ন প্রভৃতি সম্রাট দিগের ন্যায় অদৃষ্ট স্রোতের ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত হইয়া তিনি যখন হৃত সর্ব্বস্ব হয়েন তখন তাঁহার মন অন্ন চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা করিতে পায় না। এক সময়ে যাঁহার মন রাজ্য শাসনাদি গুরুতর কার্য্যের চিন্তায় অভিনিবিষ্ট, অবস্থার পরিবর্ত্তনে তাঁহার মন অন্য সময়ে সামান্য শ্রামিকের ন্যায় উদরান্ন চিন্তায় ব্যাকুল। অবস্থার পরিবর্ত্তনে মনের গতি পরিবর্ত্তিত হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে আমার মন মসী-জীবীর কার্য্যে থাকিয়া সাংসারিক নানা বিষয়িনী চিন্তায় অস্থির ছিল, আজিকালি পুলিশের কার্য্যে প্রকৃতি পুঞ্জের শান্তিরক্ষার চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত। এক্ষণে বাদী, প্রতিবাদী, অপরাধ, দণ্ড ইত্যাদির চিন্তা করিতেছি; অন্য চিন্তা আমার মনোমধ্যে স্থান পায় না। বিগত ফাল্গুন মাসের কিয়দ্দিবস হইতে এক ব্যক্তি আপন পত্নীর হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছে। আমি এক্ষণে সেই নরঘাতকের অনুসন্ধানে নিযুক্ত—আমার উপরিতন কর্ম্মচারীরা অপরাধীর অনুসন্ধানের জন্য কখন পুরস্কারের লোভ দিতেছেন, কত উচ্চ আশা দেখাইতেছেন, কত প্রকার উপদেশ দিতেছেন, আবার অনুসন্ধানে অপারগতায় নানা প্রকার দুর্ভাবনার উত্তেজনা ও বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছেন। অপরাধীর অনুসন্ধানে আমার মন অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। আমি নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, প্রান্তরে প্রান্তরে, বনে বনে, দিবা দ্বিপ্রহরে, আঁধার নিশীথে অপরাধীর দর্শন কামনায় আহার নিদ্রাত্যাগ করিয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেছি, কুত্রাপি সাক্ষাৎ

পাইতেছি না। গত ফাল্গুনী পূর্ণিমার রজতময়ী শুক্লা যামিনীতে জাহানাবাদের পশ্চিমাঞ্চলবর্ত্তী, একটি বন প্রান্তে দেবালয় সম্মুখস্থ শীলাখণ্ডে বসিয়া অপরাধীর অনুসন্ধান চিন্তা করিতেছিলাম, সমীপবনের বিহগ কণ্ঠ মারুত হিল্লোলে শ্রবণ মধ্যে ক্ষণে আসিয়া ক্ষণে সরিয়া যাইতেছিল; চোখের উপর নীল শুভ্রাভ আকাশের গায়ে হীরকদ্যুতি আকাশ কন্যা তারকাগণ পূর্ণচন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া নাচিতে নাচিতে চলিতেছিল। আমার মন রমণীয় শোভার দিকে চাহিয়াও দেখে নাই কেবল অপরাধীর অনুসন্ধান চিন্তা করিতেছিল। ইতিমধ্যে সেই নিস্তব্ধ স্থানে এক মানবমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। তাঁহার দর্শনেই মন চমকিত, ও শরীর শিহরিয়া উঠিল; সেই মানবমূর্ত্তি দীর্ঘ—নাতি স্থূল নাতি ক্ষীণ—শিরের জটাধারণ পৃষ্ঠ বিলম্বিত—প্রশস্ত ললাট,—নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ ভ্রূ—লোহিত আকর্ণ লোচন—শ্মশ্রুরাজি বক্ষাচ্ছাদী—বাহু আজানুলম্বিত—পরিধানে কটিমাত্র আবরণ—কৌপিন। মূর্ত্তি দর্শনেই আমার মন হইতে অপরাধীর চিন্তা দূরে পলায়ন করিল। মনে এক অভূতপূর্ব্ব রসের আবির্ভাব হইল—শরীরে শীতানুভব হইল—মন যেন গলিয়া গেল। অবাক হইয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলাম। আগন্তুক কিয়ৎক্ষণ পরে গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে?" আমি শশব্যস্ত হইয়া বলিয়া ফেলিলাম "পুলিশ কর্ম্মচারী।"

আগ। পুলিশ?

আমি। শান্তি রক্ষক!

আগ। এ বনে শান্তি চির বিরাজিত—এখানে শান্তি রক্ষার প্রয়োজন?

আমি। এখানকার শান্তি রক্ষার জন্য আসি নাই—এক ব্যক্তি নগরে শান্তি ভঙ্গ করিয়া পলায়ন করিয়াছে—তাহার অনুসন্ধানে আসিয়াছি।

আগ। এই বনে পলাইয়া আসিয়াছে!

আমি। কোথায় গিয়াছে তাহার স্থিরতা নাই।

আগ। কি রূপে শান্তি ভঙ্গ করিয়াছে?

আমি। আপনার কোন আত্মীয় ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছে!

আগ। অপরাধীর আকার প্রকার কিরূপ ?

আমি। বড় দীর্ঘও নয় হ্রস্বও নয় গৌরবর্ণ, নাতি স্থূল, নাতি খর্ব্ব, চক্ষু কর্ণ মুখে শ্মশ্রু নাই; ললাটে একটী ক্ষত চিহ্ন আছে! বয়স আন্দাজ ৩২। ৩৩ বৎসর।

আগ। নাম কি কোথায় নিবাস ?

আমি। নাম রাধানাথ, নিবাস মহেশ্বরপুর।

আগ। তুমি তাহাকে দেখিয়াছ ?

আমি। না—তাহার আত্মীয় কুটুম্ব দিগের মুখে এ সকল কথা শুনিয়াছি।

আগ। কোন সন্ধান পাইয়াছ ?

আমি। নানা লোকে নানা কথা বলে—তাহার অবস্থিতি স্থানের নিশ্চয়তা হয় নাই। কেহ বলে সে ব্যক্তি বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছে। কেহবলে অরণ্যে লুকাইয়াছে!

আগ। তবে তুমি আমি এক উদ্দেশ্যে এবং এক কর্ম্মেই ব্রতী।

আমি। (শশব্যস্তে) মাহাশয় ও কি পুলিস কর্ম্মচারী ?

আগ। আমি তোমার মত পুলিস কর্ম্মচারী না হইলেও—একজন লোকের অনুসন্ধান করিতেছি বটে—আর যদি লোকে বলে তবে পুলিস কর্ম্মচারী ও বটে।

আমি। মহাশয় যে অপরাধীর অনুসন্ধানেব্রতী তাহাকে কোন্ কোন্ স্থানে অন্বেষণ করিয়াছেন এবং তাহার বর্ণনা পরিচয়াদির বিষয় আমাকে কহিলে আমি যে যে স্থানে যাইব তাহার অনুসন্ধান করিব, কিন্তু আপনাকে ও আমার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

আগ। যে অপরাধীর চেষ্টা করিতেছি তাঁহাকে পাইলে—তোমার—সে অপরাধী সহজেই মিলিবে।

আমি। তবে তাহার আকৃতি আদির বর্ণন করুন, আমি আজি হইতে অনুসন্ধানে ব্রতী হইব। সেব্যক্তি কোন্ কোন্ স্থানে সর্ব্বদা যাতায়াত—করে বলুন ?

আগ। দেখ তুমি যেমন বলিলে তোমার অপরাধীকে তুমি কখন

দেখ নাই তাঁহার আত্মীয় স্বজনের মুখে তাঁহার রূপ বর্ণন শুনিয়াছ। আমিও সেইরূপ তাঁহাকে কখন দেখি নাই তবে তাঁহার ব্যাসদেব নামে একজন আত্মীয় আছেন তিনি বলেন তাঁহাকে দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, বঙ্কিম নয়ন, বিম্বের ন্যায় রক্তবর্ণ ওষ্ঠ, অষ্টাঙ্গ বক্র, বক্ষে কৌস্তুভ নামে মহামূল্য রত্ন অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত, জগজ্জন মনোমুগ্ধকারী—বক্ষে আর একটি বিশেষ চিহ্ন আছে, কোন মতে লুপ্ত হইবার নহে—উহা পদাঘাতের চিহ্ন। শিরে রমণীয় শীখীপুচ্ছ—তন্নিম্নে ললাটে চন্দনচিত্রিত সুন্দর অলকাবলী, কর্ণে স্বর্ণ কুণ্ডল, অধরে মূরলী, সর্ব্বদা সেই মধুর মূরলী-বাদনে অনুরক্ত, গলে শুক্ল বনফুলের মালা, পরিধানে পীতাম্বর, চরণে সুবর্ণ নুপুর, এবং ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন, দেখিবামাত্র চিনিতে পারিবে তিনিই আমার অনুসন্ধিতব্য। ব্যাসদেবেরই নিকট শুনিয়াছি তিনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া পাদমাত্র গমন করেন না। কিন্তু আমি বৃন্দাবন তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া ও তাঁহার সাক্ষাৎ পাই নাই। ইহাতে আমার প্রতীতি হইতেছে, তিনি তাঁহাকে গোপন রাখিয়া আমাকে বঞ্চনা করিয়াছেন। আমার এই প্রতীতি নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক ও নহে; যেহেতু তাঁহার জন্ম এবং ব্যবহারের ব্যভিচারের কথা শুনিতে এবং তাঁহার বর্ণনার অতিশয়োক্তির বহুলতা দেখিতে পাই।

আর এক মহাত্মা বলেন তিনি শুভ্রাঙ্গ, রূপ প্রভায় রজতকে লাঞ্ছনা দেন—মহাকায়; সর্ব্বাঙ্গ ভস্মমাখা—শিরে জটাজাল তাহাতে ত্রিদিব তরঙ্গিনী; সর্পরজ্জু দ্বারা অবরুদ্ধা; আয়ত ললাটপট্টে প্রজ্জ্বলিত অনল; কর্ণ যুগলে কমনীয় ধুস্তুর কুসুম; জবাকুসুম সঙ্কাশ অর্দ্ধ মুদিত নেত্রদ্বয়; সদা সহাস্যবদন; নিরন্তর বিষ ভোজনে কণ্ঠদেশ গাঢ়তম নীল; পরিধানে দ্বীপিচর্ম্ম; চরণে রমণীয় নুপূর, হস্তে শিঙ্গডম্বরু; সদা প্রসন্ন চিত্ত; আপন চিন্তায় আপনি মত্ত; দেখিলেই উন্মাদগ্রস্থ বলিয়া ভ্রম জন্মে। তিনি আরও বলেন আমি যাহার অনুসন্ধান করিতেছি তিনি পুরুষ নহেন স্ত্রী। কখন শ্যামা কখন তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভা বা বালার্ক কান্তি; দানবদলনে অতিভীষণা, উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি, ভক্তজনে প্রসন্নতাময়ী; কখন স্বর্গে কখন মর্ত্তে আবির্ভূতা।

আর এক মহাত্মা বলেন তিনি একদিন বনে ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহার জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "আপনি কে?" তিনি উত্তর করিয়াছিলেন "I am that I am" অর্থাৎ আমি, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মানামে এক ব্যক্তি বলেন তিনি কখন সাকার কখন নিরাকার, কখন চর্ম্ম চক্ষের গোচর কখন অগোচর, সদা জ্ঞান চক্ষুর সুগোচর; তিনি বলেন হস্তপদ এবং ইন্দ্রিয়বিহীন হইয়াও তিনি দর্শন, শ্রবণ আঘ্রাণাদি ঐন্দ্রিক কার্য্য কুশল। শূন্যপথে ভ্রাম্যমান, পৃথিবী নক্ষত্রাদি পরিবেষ্টিত বিশ্ব তাঁহার রূপ, চক্ষুরূপে চন্দ্র সূর্য্য, অতি উর্দ্ধ আকাশ পথ বিক্ষিপ্ত নক্ষত্রকুল তাঁহার মস্তক শোভা কীরিট, আকাশ তাঁহার শ্রুতি, সমীরণ তাঁহার নিশ্বাস, পৃথিবী গ্রহ নক্ষত্রাদির পৃষ্ঠাবরণ মৃত্তিকাদি তাঁহার ত্বক ও স্পর্শেন্দ্রিয়, সুতরাং জগতের জলস্থল শূন্যদেশে যখন যাহা সংঘটিত হয় কিছুই তাঁহার অগোচর থাকে না। সাগর কল্লোল তাঁহার বাক্য, গভীর বজ্রনির্ঘোষ পাপী সন্তাড়নরব, কুসুম সুবাসিত তরুণ অরুণ বিশোভিনী বাসন্তী প্রভাত সুষমা তাঁহার মধুর হাসি; মানবদেহে তাঁহার অবস্থিতি।

আমি। মহাশয় তবে ত সহজ উপায়—শবব্যবচ্ছেদী শাস্ত্র চিকিৎসা বিশারদ পণ্ডিত দিগের সাহায্যে তাঁহাকে অনায়াসেই পাওয়া যাইতে পারে!

আগ। মৃত দেহে নয়—জীবিত দেহে।

আমি। তবে ত আপন আপন দেহ অনুসন্ধান করিলেই তাঁহাকে ধরা যাইবে?

আগ। তোমার ভ্রম! তুমি আপনাকে চিনিতে পারিয়াছ? তোমার কি আছে বলিতে পার?

আমি। আজ্ঞা হাঁ—আমি অমুকের পুত্র, অমুকের পৌত্র, আমার নাম অমুক। আমি অমুক কার্য্য করি। আমার এই পরিচয়ে সকলে আমাকে চিনে, আমি আপনাকে আপনি চিনিতে পারি না? এ যে আপনার অন্যায় কথা—আমি শরীরতত্ত্ব জানিলে আমার দেহের কোথায় কোন শিরা কোন মাংসপেশী আছে বলিতে পারিতাম।

আগ। দেখ—তোমাকে দেখিতে শুনিতে বেশ, কিন্তু তুমি লোক ভাল নও!

আমি। কি বলেন—আমি ভাল লোক নই?

আগ। তবে তোমার এই যে পঞ্চেন্দ্রিক দেহ—এ তুমি নও?

আমি। কেন?

আগ। তোমার ত এই ভৌতিক দেহের নিন্দা করিলাম না—তোমার নিন্দা করিলাম।

আমি। তবে আমার ব্যবহারগত নিন্দা করিলেন—সে আমার নিন্দা হইল না?

আগ। তবে তোমার দেহ এবং তোমার ব্যবহার এই দুইয়ে "তুমি?"

আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, আমি কে বুঝিতে পারিলাম না। ইহ সংসারে আসিয়া ঘর, দ্বার, পুষ্করণী, বাগান, এত সখের জিনিষ করিলাম কিন্তু বিপদে পড়িলাম—ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না, "আমি কে" তখন চক্ষু তুলিয়া দেখি সেই আগন্তুক নাই। যেন আকাশে তাঁহার সেই পবিত্র দেহ মিশিয়া গেল। হতবুদ্ধি হইয়া "আমি কে?" ভাবিতে ভাবিতে সেই অরণ্য ভূমি হইতে লোকালয়ে ফিরিলাম। পাঠকবর্গ হতাশ হইবেন না "আমি কে?" বারান্তরে চিন্তা করিব।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

জয়মঙ্গল গীত।*

(১)

(শাখা কোরস্।)

কাছে এসো ভাই   করি আশীর্ব্বাদ
চিরসুখে হর কাল।
তোমার কল্যাণে   ভারত-বিপিনে
উদিল চন্দ্রিকাজাল॥

(পূর্ণ কোরস্।)

উদিল চন্দ্রিকা   ভারত-বিপিনে—
অই শুন বাজে ভেরি।
জয় জয় জয়   ধ্বনি ছড়াইয়া
আনন্দে নিনাদ করি॥

(শাখা কোরস্।)

অই শুন বাজে   মৃদঙ্গ মুরলী
বিপুল ভারত যুড়ে।
জয় জয় জয়   ধ্বনি ছড়াইয়া
তব কীর্ত্তিধ্বজা উড়ে॥

(পূর্ণ কোরস্।)

আজি হে উজ্জল   বাঙালির নাম
উজ্জল ভারতভূমি।
বঙ্গের প্রধান   বিচার আসনে
আজি হে প্রধান তুমি॥—

---

* মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্রের একটীং চীফ্ জষ্টিসের পদপ্রাপ্তি উপলক্ষে এই কবিতাটী সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক লিখিত হয়। আমরা সাদরে তাহা উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম।

আ সং—

কাছে এসো ভাই করি আশীর্ব্বাদ ;
আনন্দে বাজিছে ভেরি।
"রিপণের জয় রমেশের জয়"
সঘনে নিনাদ করি॥

(২)

(শাখা কোরস্।)

ঋটিষের বেশে ঋষিতুল্য নর
এদেশে উদয় যবে।
ভারতের লক্ষ্মী ফিরিয়ে আবার
ভারতে উদয় হবে॥

(সকলে একত্রে)

আজি রে এ রবে কেবা রবে ঘরে
আনন্দে বাজিছে ভেরি।
ভারত ভিতর ঋষিতুল্য নর
এত দিন পরে হেরি॥
চলো সবে যাই দিয়া করতালি
আনন্দে তাঁহারে ঘেরি।
"রিপণের জয় রিপণের জয়"
সঘনে নিনাদ করি।
বাজ্‌রে আনন্দে মৃদঙ্গ মুরলী
বাজ্‌রে আনন্দে ভেরি॥

(৩)

(শাখা কোরস্।)

কৈ বরণ্‌ডালা আনো আনো আনো
ফুলসাজে আজ সাজাব।
আগে দিব তুলে রিপণের গলে
পরে প্রিয় জনে পরাব॥

(পূর্ণ কোরস।)

আনো বরণ ডালা বাটী বাটী বাটী
সুগন্ধ তাহাতে থাকিবে।
ভোর বেলা তুলি গোটা গোটা ফুল
পরিপাটী করে রাখিবে॥
অগুরু চন্দনে ছিটা দিয়া তায়
মাঙ্গল্যবিধানে ধরিবে॥—
আনো বরণ ডালা আনো আনো আনো
প্রিয় জনে আজ সাজাব।
আগে দিব তুলে রমেশের গলে
পরে রিপণেরে পরাব—
আনো বরণ ডালা প্রিয় জনে আজ
সুগন্ধ মাল্যেতে সাজাব॥

(৪)

(সকলে একত্রে)

অন্নদা চন্দর ঈশ্বর সারথি।
ঘেরিল চৌধার দেশী বিলাতি॥
"গ্রেগরি" "ইউসুফ্" "টুইডেল্" সঙ্গে।
আরতি করিল কৌতুক রঙ্গে—
দিল সুখে সবে চন্দন ভালে,
দিল সুখে সবে দুর্ব্বার দলে
তণ্ডুলে গাঙ্গেয় ঢালি,
হোম ভস্মেতে অভিষেক দিল
ললাটে ছোঁয়ায়ে ডালি॥

(পূর্ণ কোরস।)

আনন্দে সকলে মিলিত তায়।
সুখেতে আরতি-সঙ্গীত গায়॥

হেরিয়া আরতি অন্দরে রামা
হুলুধ্বনি দিল সুন্দরী বামা॥
অন্নদা চন্দর ঈশ্বর সারথি
চৌদিকে ঘেরিল করিয়া আরতি ;—
সুখে দিল সবে চন্দন ভালে
সুখে দিল সবে দূর্ব্বার দলে
তণ্ডুলে গাঙ্গেয় ঢালি।
হোম ভস্মেতে অভিষেক দিল
কপালে ছোঁয়ায়ে ডালি॥

(৫)

(পূর্ণ কোরস।)

আওয়ল সখাগণ গাওয়ল পেয়ারে।
ভাগলাছমী আজু বাঢ়ল জুয়ারে॥
তুয়া সনে মো সবে বেরি বেরি মেলি।
পাঠ পঢ়ঁহু কতি কতনহি খেলি॥
অবহুঁ তুহারে চাহি প্রীত ভগবান।
হাম্ সব আশীষে তুয়া ভগবান॥
কহল কহুজন কর যোরী বাণী।
করল সেলাম কহু পরশল পাণি।
হিন্দি, পারসি, আংরেজি ভাখা।
খং ভেজল কহু চন্দন মাখা।
হলাহল ঢাকল হুস্মন যেহি।
ক্ষীর উগারল পদরজঃ লেহি॥
ভেটল সখিগণ গাওয়ল পেয়ারে।
ভাগলছমী আজু বাঢ়ল জুয়ারে॥

(৬)

(শাখা) তুলিল সঙ্গী মালতীমাল—
(একক) গন্ধে মোদিল দেহ।

(শাখা) তুলিল মল্লিকা যূথিকাজাল—
(একক) পরাণে জাগিল স্নেহ ॥
(পূর্ণ কোরস।)
মোদিল দেহ মালতীমাল
মোদিল দেহ মল্লিকাজাল
মোদিল দিশ পূরে।
"রিপণের জয় রিপণের জয়"
বংশী বাজিছে দূরে ॥
(শাখা) তুলিল সঙ্গী সুগন্ধা শিউলি—
(একক) সোহাগে হৃদয়ে দেল।
(শাখা) তুলিল যতনে রজনীগন্ধা—
(একক) পবনা মাতিয়া গেল ॥
আনন্দে তুলল গুলাবগুচ্ছ
চিকণ গাঁথনি হারে—
(একক) "রিপণের জয় রমেশের জয়"
বংশী বাজিছে দূরে ॥
(পূর্ণ কোরস।)
মোদিল পুরি সেঁউতি হার
মোদিল পুরি কামিনীভার
মোদিল পুরি গুলাবগুচ্ছ—
চিকণ গাঁথনি হারে।
"রমেশের জয় রমেশের জয়"
বংশী বাজিছে দূরে ॥

(৭)

(সকলে একত্রে)
বংশী বাজিছে রমেন্দ্রের জয়,
আজরে হৃদয়ে বড় সুখোদয়—

কাছে আয় ভাই করি আশীর্ব্বাদ
চিরসুখে হর কাল।
তোমার কল্যাণে ভারত-বিপিনে
উদিল চন্দ্রিকাজাল॥
উজ্জল আজি হে বাঙালির নাম
উজ্জল ভারতভূমি।
বঙ্গের প্রধান বিচার আসনে
আজি হে প্রধান তুমি॥—
বাজ্‌রে আনন্দে মৃদঙ্গ মুরলী
সঘনে নিনাদ করি।
জয় জয় জয় ধ্বনি ছাড়াইয়া
আনন্দে বাজ্‌রে ভেরি॥

বিজয় সিংহ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

তোমরা কে?

অমিলার প্রিয় সখী মোনিয়া গৃহান্তরাল হইতে সমস্ত অবলোকন করিতেছিল। বাদসাহ কক্ষান্তর্গত হইবা মাত্র গৃহে প্রবেশ করিয়া অমিলার সংজ্ঞা আনয়ন করিবার বহুবিধ চেষ্টা করিতে লাগিল। সুবর্ণ গোলাপপাস অনবরত সঞ্চালন পূর্ব্বক মুখ মণ্ডল গোলাপনীরে সিক্ত করিতে লাগিল। নয়ন যুগলে বারি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এইরূপ অনেকক্ষণ করিলে অমিলার জ্ঞানের সঞ্চার হইল, অমিলা ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মিলন করিয়া

চমকিয়া উঠিল। সখী মোনিয়া কহিল "নবাবপুত্রি এরূপ চমকিয়া উঠিলে যে?"

আমিলা কহিল "প্রিয় সখী মোনিয়া রজনী কি প্রভাতা?"

মোনিয়া। সে কি নবাবপুত্রি এখন রাত্রি দ্বিপ্রহর ও হয় নাই।

অমিলা। মোনিয়া আমি কি নিদ্রিত হইয়াছিলাম।

মোনিয়া। হাঁ নিদ্রিত—ই বটে, আমি না থাকিলে ইহ জন্মে বুঝি আর সে নিদ্রা ভাঙ্গিত না।

অমিলা। তবে তুমি আমার সে নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া শত্রুর ন্যায় কার্য্য করিয়াছ। সখি! আমি যদি আজি মরিতাম তাহা হইলে আমার সুখের সীমা রহিত না।

মোনিয়া। বাদসাহ পুত্রি মরণকে ডাকিতে হয় না, সে আপনি আইসে।

অমিলা। না মোনিয়া এটি তোমার ভ্রম, যাহারা ভাগ্যবতী তাহারাই মরে, কিন্তু হতভাগিনীদিগকে মরণও সম্ভাষণ করেনা।

মোনিয়া। এখন কি উপায় স্থির করিলে?

অমিলা। এই রাত্রেই আত্মহত্যা করিয়া সকল যন্ত্রণার শেষ করিব।

মোনিয়া। আর কিছু।

অমিলা। এজন্মে না।

মোনিয়া। আমি যদি তোমার বিজয়কে বাচাইতে পারি।

অমিলা। পারিবে? না—হয়ত তুমি ও আমার যন্ত্রণায় আনন্দ প্রকাশ করিতেছ।

মোনিয়া। না প্রিয় সখি একি উপহাসের সময়, আমি বাক্যে হউক অর্থে হউক রক্ষীগণকে বাধ্য করিয়াছি, তুমি আমার সহিত কারাগারে আইস, আমি তোমার বিজয় সিংহকে কারামুক্ত করিয়া দিব।

অমিলা। এত রাত্রে আমাদিগকে কারাগরে প্রবেশ করিতে দিবে কেন?

মোনিয়া। তাহার উপায় করিয়াছি।

অমিলা। তবে চল।

এই বলিয়া অমিলা অগ্রসর হইতেছিল, এমত সময়ে মোনিয়া বলিল "এ বেশে তোমাকে এত রাত্রে কে কারাগারে প্রবেশ করিতে দিবে ?"

অমিলা। তবে কি বেশে যাইব ?

মোনিয়া। সমান্য পরিচারিকার বেশে যাইতে হইবে।

এই বলিয়া মোনিয়া গৃহান্তর হইতে একটি বেশ আনিয়া দিল। অমিলা তাহার সেই সমুজ্জ্বল বেশ পরিত্যাগ করিয়া পরিচারিকার বেশ পরিধান করিল। রূপালোক কি পরিচ্ছদে লুক্কাইত হয়। সেই দীন বসনে ও অমিলার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরাশি বিভাসিত হইতে লাগিল। বসন ফুটিয়া সৌন্দর্য্যালোক বিকশিত হইতে লাগিল। মোনিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল "সখি! এ সুকুমার সৌন্দর্য্যরাশি কি ঈশ্বর বিনাশ করিতে সৃজন করিয়াছেন ? এমন পরিমল পূর্ণ কুসুম কি অরণ্যে বিকাশ হইয়া অলক্ষিত ভাবে নষ্ট হইবে ? কে জানে বিধাতা তোমার বিধি !"

অমিলা। সখি ও সকল কথার এ সময় নয়।

মোনিয়া বলিল "তবে আমার অনুসরণ কর।"

উভয়ে চলিল, একটী গুপ্ত দ্বারদিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল, ক্রমে কারাগার দ্বারে উপস্থিত হইল। সেখানে কৃতান্ত সম রক্ষীবর্গ শানিত কৃপান হস্তে দ্বার রক্ষা করিতেছিল। রমণীদ্বয়কে দেখিয়া তাহারা সসম্ভ্রমে সরিয়া গেল, তাহারা উভয়ে নিঃশব্দে কারাগার মধ্যে প্রবেশ করিল। যে গৃহে বিজয়সিংহ বন্দীভাবে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থানে রমণীদ্বয় উপস্থিত হইল, সেই দ্বারে রক্ষীচতুষ্টয় অতি সতর্কতার সহিত দ্বার রক্ষা করিতেছিল। সে গৃহদ্বার লৌহ নির্ম্মিত, কোথাও একটি ছিদ্র মাত্রও দৃষ্টি-গোচর হয় না। রমণীদ্বয়কে দেখিয়া একজন রক্ষী জিজ্ঞাসা করিল "কে ?"

মোনিয়া বদনে সঙ্কেত সূচক অঙ্গুলি প্রদান করিয়া বলিল "নিঃশব্দে দ্বার উদ্ঘাটন কর।"

রক্ষীগণ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

অমিলা ও মোনিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, দেখিল গৃহমধ্যে বায়াতন নাই বলিলেও হয়, একটি লৌহ আসনে করকপোলিত হইয়া বিজয়সিংহ বসিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার বামপার্শ্বে একটি সামান্য আলোক ধিকি ধিকি

জ্বলিতেছে। বিজয়সিংহ এ দুঃসময়েও কি গাঢ় চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। সে গৃহের যে দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছিল বা তাহার মধ্যে দুইটি রমণী প্রবেশ করিয়াছিল তাহা জানিতে পারেন নাই। রমণীদ্বয় অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে বিজয়সিংহ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন "আমি মরি তাহাতে দুঃখ নাই, কিন্তু ললিত কুসুম জিনিয়া সুকুমারী কমলা কেন যবন গৃহে বন্দিনী রহিবে? হায়! আমি যদ্যপি তাহাকে পরিত্রাণ করিতে পারিয়া সহস্র সহস্র বৎসরও কুক্কুর দংশন জনিত ব্যথা অনুভব করিতাম তাহা হইলেও আপনাকে ভাগ্য-ধর বলিয়া বিবেচনা করিতাম। কিন্তু বিধাতা তুমি বাদ সাধিলে কে তাহা রক্ষা করিতে পারে? ঈশ্বর! কাপুরুষের ন্যায় প্রাণত্যাগ করিতে, বিধর্ম্মি যবনের বন্দী হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেই কি বিজয় সিংহকে রাজ-বংশে জন্ম দিয়াছিলে? রাজপুত বলিয়া পরিচিত করিয়াছিলে? ধিক্ তোমায়, ধিক্ আমার জীবনে।" বিজয়সিংহ কাঁদিতে লাগিলেন। চক্ষু মর্দ্দিত করিয়া জানু পাতিয়া উর্দ্ধমুখে করপুটে আবার কহিলেন "হে পরম পিতা পরমেশ্বর আমার যত কেন হীন অবস্থা হউক না তথাপি আমি তোমার অসীম দয়া কখন বিস্মৃত হইতে পারিব না। দেব! এ অবস্থায় তোমার নিকট আর কি প্রার্থনা করি, আর কিছু না কেবল একটি ভিক্ষা, ভারতভূমি যেন আর অধিককাল বিধর্ম্মি যবনের পদ দলিত না হয়। পিতঃ! কেবল মৃত্যু কালে এক দুঃখ রহিবে যে মাতৃভূমির বিন্দুমাত্র উপকার করিয়া মরিতে পারিলাম না। পশুর ন্যায় জন্মগ্রহণ করিলাম, পশুর ন্যায় জগৎ সংসার ত্যাগ করিব।

বিজয়সিংহ আবার কাঁদিলেন, আবার চক্ষুমর্দ্দিত করিলেন, এমত সময়ে সহসা তাঁহার চক্ষু মোনিয়া ও অমিলার প্রতি নিপতিত হইল, প্রথমে চম-কিয়া উঠিলেন, পরে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কে?"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—000—

আপনায় দাসী।

বিজয়সিংহ কর্ত্তৃক "তোমরা কে?" এই কথাটি জিজ্ঞাসিত হইবামাত্র অমিলা অগ্রসর হইয়া করপূটে কহিল "আপনার দাসী।"

বিজয়সিংহ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কিরূপে এখানে আসিলেন?"

অমিলা। আমি পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়া ছিলাম যে এ অধিনীই দিল্লীতে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবে।

বিজয়। এ নিশীথ সময়ে একজন বন্দীর সহিত সাক্ষাতে প্রয়োজন কি?

অমিলা। আপনাকে কারামুক্ত করিতে আসিয়াছি।

বিজয়। আমাকে কারামুক্ত করিবার আপনার অধিকার কি?

অমিলা। সে কথা পরে বলিব।

বিজয়। তবে আমি মুক্তি গ্রহণ করিব না।

অমিলা। তবে শুনন,—আমি বাদসাহ আরঙ্গজেবের কন্যা।

বিজয়। আমাকে অদ্য কারামুক্ত করিলে কল্য আপনার দশা কি হইবে?

অমিলা কথা কহিতে না কহিতে মোনিয়া কহিল "আমরা তাহার উপায় করিয়াছি।"

বিজয় সিংহ কহিলেন "বাদসাহ পুত্রি অদ্য আমি কারামুক্ত হইলে আজীবন যে আমি বাদসাহের শত্রু হইয়া থাকিব।

অমিলা। তাহাতে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

বিজয়। না বাদসাহ পুত্রি আমা হইতে এ কার্য্য হইবে না, আমি প্রাণ থাকিতে তোমায় বিপদে ফেলিতে পারিব না।

অমিলা। মহারাজ! আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন, আমি

নিশ্চয় বলিতেছি যে, আমার নিমিত্ত আপনার কোন শঙ্কারই কারণ নাই।

বিজয়। সরলে! তুমি এখন ও আরঙ্গজেবকে চেননা তিনি যদিও অপত্যস্নেহ পরবশ হইয়া তোমায় ক্ষমা করেন, কিন্তু এই রক্ষীবর্গের কি হইবে?

অমিলা উত্তর দিতে না দিতে মোনিয়া কহিল "তাহাদের কেশাগ্রও ছিন্ন হইবে না।

বিজয়। আপনি কে?

মেনিয়া। আমি আপাততঃ অমিলার দাসী।

বিজয়। প্রকৃত পরিচয় দিতে বাধা আছে কি?

মেনিয়া। পরিচয় দিবার এ সময় নয়।

বিজয়সিংহ আর কোন প্রশ্ন না করিয়া অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিলেন, পরে কহিলেন "কোথায় যাইব; সংসারে আমার কে আছে?"

মোনিয়া কহিল "সেকি মহারাজ! আপনার নাই কে?"

অমিলা দেখিল বিজয়সিংহের চক্ষে জল আসিয়াছে, কহিল "মহারাজ! এ শোকের সময় নয় শীঘ্র আসুন।"

বিজয়। বাদসাহ পুত্রি! আমি তোমার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলাম, কিন্তু——

অমিলা। মহারাজ বলুন আমি আপনার জন্য সকল কার্য্যই করিতে প্রস্তুত আছি।

বিজয়। উদয় সিংহের কি হইবে?

অমিলা। তাঁহাকেও মুক্ত করিব।

বিজয়। আর ——

অমিলা। বলুন?

বিজয়। কমলা দেবীর কোন সংবাদ জানেন কি?

মোনিয়া বলিল "তিনি সুখে আছেন।"

বিজয়। সুখে আছেন?—রাজকন্যা হইয়া বন্দিনী, সুখে আছেন?

অমিলা কহিল " মোনিয়ার কথার উদ্দেশ্য এই যে তাঁহার কোন শারীরিক অসুস্থতা নাই।"

বিজয়। বাদসাহ পুত্রি! মানসিক যাতনা কি শরীরিক অসুস্থতা অপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক নহে?

উভয়ে নীরব হইলেন, মহারাজ বিজয়সিংহ পুনরপি কহিলেন "আমরা তিনজনে একত্রে বন্দী হইয়াছি কিন্তু এখন কি করিয়া সেই অবলাকে রাখিয়া প্রস্থান করিব?

মোনিয়া কহিল " সেকি মহারাজ! আপনাদের ন্যায় দুইজন ক্ষত্রিয় চূড়ামণি কর্ত্তৃক কি একজন সামান্য রমণী উদ্ধার হইবে না!"

বিজয়সিংহ যেন কিছু অপ্রতিভ হইলেন, মোনিয়া বলিল "আমি স্বীকার করিতেছি যে কমলা দেবীকে শীঘ্র উদ্ধার করিয়া দিব।"

বিজয়সিংহ আর কোন কথা কহিলেন না, তখন মোনিয়া কহিল "আপনারা অপেক্ষা করুন আমি উদয়সিংহকে এখানে আনয়ন করিতেছি," এই বলিয়া সে গৃহান্তরিত হইয়া ক্ষণেক পরেই উদয়সিংহকে তথায় আনয়ন করিয়া কহিল "আপনারা আমার অনুসরণ করুন।"

তাঁহারা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন, কতকদূর যাইয়া মোনিয়া একজন রক্ষীকে কাণে কাণে কি বলিল, রক্ষী দুইজন যবন সেনার বেশ আনিয়া দিল। রমণী বিজয় ও উদয়সিংহকে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিতে কহিলে বিজয়সিংহ বলিলেন " কি অস্পৃশ্য যবনের বেশধারণ করিয়া প্রাণ রক্ষা করিব?"

তখন মোনিয়া ভ্রূকুটি করিয়া কহিল " ক্ষত্রিয় সন্তান হইয়া স্বকার্য্য উদ্ধারে এত অযত্ন কেন?"

বিজয়সিংহ মোনিয়ার মুখাবলোকন করিলেন, কি ভাবিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিলেন, উদয়সিংহও তদ্রূপ করিলেন, মোনিয়া একজন রক্ষীকে সঙ্কেত করিলে সে নিকটে আসিল, রমণী তাহার কাণে কাণে কি কহিল। রক্ষী বিজয়সিংহও উদয় সিংহকে কহিল "আমি আপনাদের কৃতজ্ঞ ভৃত্য, আমার সহিত আসুন।"

বিজয়সিংহ অমিলা ও মোনিয়াকে কহিল "তবে আসি?"

অমিলা কহিল " সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।"

উদয়সিংহও অমিলার প্রতি একটি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, সে দৃষ্টি বিদায় সূচক কি কৃতজ্ঞতা সূচক তাহা আমরা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

বিজয় ও উদয়সিংহ প্রস্থান করিলে মোনিয়া অমিলাকে কহিল "আইস আমরা যাই।"

অমিলা। কোথায় ?

মোনিয়া। অন্তঃপুরে।

অমিলা। তাহা হইলে আমাদের দশা কি হইবে ?

মোনিয়া। কে জানিবে যে আমরা বন্দীদিগকে অব্যাহতি দিয়াছি।

অমিলা। রক্ষীদের দশায় কি হইবে ?—তাহারা প্রকাশ করিবে।

মোনিয়া। তাহার উপায় করিয়াছি।

অমিলা। কি করিয়াছ ?

মোনিয়া। পরে বলিব।

অমিলা। আমরাও কোথাও যাই চলনা ?

মোনিয়া। কোথায় যাইবে ?

অমিলা। যেখানে যাইলে নিরন্তর বিজয়সিংহকে দেখিতে পাইব।

মোনিয়া। সে স্থানত এ পর্য্যন্ত সৃজিত হয় নাই।

অমিলা। বিজয়সিংহ কোথায় যাইতেছেন ?

মোনিয়া। বিজন বনে।

অমিলা। আমিও তথায় যাইব।

মোনিয়া। বাদসাহ পুত্রি তুমি কি সে যাতনা সহ্য করিতে পারিবে ?

অমিলা। সখি মোনিয়া তোমার কি এত দিনে এই বিশ্বাস হইল যে অমিলার পক্ষে বিজন বনে বাস, বিজয়সিংহ অদর্শন জনিত যাতনা অপেক্ষাও ক্লেশ সাধ্য ?

মোনিয়া। না সখি আমি পরিহাস করিতেছিলাম. কিন্তু আপাততঃ আমা হইতে সে কার্য্য হইবে না।

অমিলা। তবে গৃহে গিয়া কি হইবে ?

মোনিয়া। কমলা দেবীর উদ্ধারের উপায় দেখিতে হইবে না ?

অমিলা একটীমাত্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল, কোন কথাই কহিল না, উভয়ে আবার ধীরে ধীরে গুপ্তদ্বার দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

সমাজ-রহস্য।

——০ঃ*ঃ০——

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমাদের সমাজের অবস্থা বড় শোচনীয়। সমাজ গুণীর গুণ অবগত নহে; নির্গুণের গুণ অবগত আছে ও তাহাকেই পরম আদরে বক্ষেঃ ধারণ করিয়া থাকে। নতুবা যাহারা বিবাহ ব্যবসায়ী, দলে দলে বিবাহ করিয়া অশিক্ষিতা অবলা রমনীগণকে যাবজ্জীবনের জন্য দুঃখার্ণবে ভাসাইয়া থাকে, সমাজ তাহাদিগকেই মহাকুলীন, জ্ঞানী ও পণ্ডিত বলিয়া সম্মান করেও—দেখিয়া শুনিয়া আবার তাহাদের হাতে কন্যা সমর্পণ করিয়া আপনাকে ধন্য বিবেচনা করে। সমাজের কি জ্ঞান হয় না? কবে সমাজের চৈতন্য বা ও জ্ঞানলাভ হইবে? সুখের বিষয়, এরূপ মহাকুলীনের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইতেছে। নবধা গুণ বিশিষ্ট কুলীন সমাজে চিরকাল থাকুন, তাহাতে সমাজের ক্ষতি নাই বরং গৌরব আছে কিন্তু বিবাহ ব্যবসায়ী এরূপ নির্গুণ কুলীনের দল নির্ম্মূল হইলেই শ্রেয়ঃ।

দীর্ঘ প্রবাসি ভাই! তুমি যদি বিবাহ করিয়া স্ত্রীকে ভরণ পোষণ করিতে অসমর্থ হইয়া অন্ন সংস্থানের জন্য চিরকাল বিদেশে একাকী বাস করিবে তবে তোমার বিবাহে—গলগণ্ডে আবশ্যকতা কি? পরিবার প্রতিপালনের যোগ্য হইয়া তোমার বিবাহ করাই কি শ্রেয়ঃস্কর নহে? চিররোগী ভাই! তুমি আপন অন্তর্জ্জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত, বিবাহ করিয়া আবার জ্বালার উপর যন্ত্রণা বর্দ্ধিত কেন কর? তাহাতে ফল কি? চাতকিনী যদি দারুণ পিপাসার সময় সুশীতল জলপান করিতে না পারিল, তবে সে তোমাকে যে শত শত বার অভিশাপ প্রদান করিবে, এ কথা কেন বিস্মৃত হইয়া যাও? আর সুরাপায়ী ব্যভিচারাসক্ত ব্যক্তিগণ! তোমাদিগকে কি বলিব, যদি জীবনে পরকুঞ্জে

নিশিযাপন করাই—তোমাদের প্রিয়ব্রত হয়, তবে ফুলশয্যায় বাসর-সজ্জা করিতে বলিয়া কেন অনাথিনী রমণীগণকে (স্ব স্ব পত্নীদিগকে) হস্তপদ বাঁধিয়া জন্মের মত নিরাস-সমুদ্রে নিমগ্ন করিতে থাক? মনুষ্য হইয়া মনুষ্যের প্রতি এরূপ করা কি কর্ত্তব্য? রমণীরা কি পাষাণে নির্ম্মিতা, তাহাদের কি সুখভোগের ইচ্ছা নাই? না, সুখভোগ তাহাদের সহ্য হয় না? তাই বলি, এই সকল ব্যক্তিগণের সধবা নামধারিণী পত্নীগণের বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি নিসর্গ বিকারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য বিধবাদিগকে বিবাহ করিতে অনুমতি দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ হয়, তবে এইরূপ সধবাদিগের বিবাহের অনুমতি দেওয়া কেন না যুক্তিসিদ্ধ হইবে? পক্ষপাতী হওয়া কর্ত্তব্য নহে। এরূপ সধবার বিবাহ সহস্রবার যুক্তিসিদ্ধ।

যে সকল পাঠক যুক্তিবাদী, সৎযুক্তিকেই যাঁহারা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা আর আমাদিগকে প্রলাপগ্রস্ত বলিয়া হাস্য করিতে পারিবেন না। সধবার বিবাহ কর্ত্তব্য, ইহা যুক্তি তাঁহাদিগকে বলিয়া দিতেছে। কিন্তু কথা এই, সকল পাঠক কিছু এক ভাবাক্রান্ত নহেন, সকলেই যে যুক্তি স্বীকার করিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন এরূপও নহে। একজন হয়ত যুক্তিপ্রিয়, অন্যে হয়ত যুক্তি স্বীকার করেন না। শাস্ত্রকেই প্রধান স্বীকার করিয়া শাস্ত্রমতে কার্য্য করিয়া থাকেন। আমরা যখন একটি কঠিন বিষয়ে হস্তার্পণ করিয়াছি, তখন সকলকেই সন্তুষ্ট ও নিরস্ত করিয়া আপন মতে আনয়ন করা কর্ত্তব্য। এই জন্য শাস্ত্রবাদীদিগের সন্দেহ বিমোচন ও আপত্তি খণ্ডনার্থ একবার আমাদিগকে শাস্ত্রানুসন্ধান করিতে হইতেছে। দেখি শাস্ত্রমতে সধবার বিবাহ হইতে পারে কিনা? যদি হয়, তবে আর কাহারও কোন বিষয়ে আপত্তি করিবার পথ থাকিবে না। সধবার বিবাহ সর্ব্ববাদীসম্মত হইবে।

আমাদের শাস্ত্র—হিন্দুশাস্ত্র অনন্ত অর্ণব তুল্য। ইহাতে বহুতর রত্ন আছে। যখন যে রত্নের আবশ্যক হইবে, ইহাতে নিমগ্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিলে সেই রত্নই প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিছুরই অভাব নাই। পাঠক! আসুন, আমরা একবার দেখি সধবার বিবাহ সম্বন্ধে কোন

রত্ন—উপায় ইহাতে আছে কিনা। অধিক অনুসন্ধান করিতে হইবে না, ঐ দেখুন, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গীয় হিন্দু বিধবা রমণী-গণের দুঃখে দুঃখিত হইয়া বহু পরিশ্রম স্বীকার করতঃ পরাশরসংহিতা হইতে যে মত উদ্ধৃত করিয়াছেন; যে মত তাঁহার সমুদয় তর্কের ভিত্তি-স্বরূপ; সেই মত আমাদিগের হাতেও আসিতেছে, এই মত আমাদেরও উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিয়া দিবে। সে মত, সে শ্লোক এই :——

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চসাপৎসু নারীণাং পতিরন্যোবিধীয়তে॥"

নষ্ট, মৃত, প্রব্রজিত অর্থাৎ সংসারত্যাগী যাহার উদ্দেশ নাই, ক্লীব ও পতিত স্বামী হইলে নারীরা এই পঞ্চ বিপদে অন্য পতিগ্রহণ করিতে পারিবে। জয় হউক পরাশরের!

এক্ষণে আসুন এবং বিবেচনা করিয়া দেখুন প্রকৃত বিধবা কাহাকে বলে? যাহার স্বামী মরিয়াছে সেই প্রকৃত বিধবা। অন্য সকলেরা যাহা-দের স্বামী সংসারত্যাগী কি পতিত, শাস্ত্রমতে তাহারা বিধবা হইলেও হইতে পারে,বস্তুতঃ তাহারা প্রকৃত বিধবা নহে, তাহারা স্বামীসত্ত্বে বিধবা। এ বিধবারা পূর্ব্ববর্ণিত মৃত পতিক বিধবা হইতে বহু অংশে বিভিন্ন। সংসারত্যাগী ব্যক্তি মৃত নহে, কালে সে ফিরিয়া আসিলেও আসিতে পারে। যখন তাহার ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা আছে, তখন তাহার পত্নী প্রকৃত বিধবা নহে। এই জন্য দেখিতে পাওয়া যায়, আর্য্য সন্তান মাত্রেও অবগত আছেন এবং এ নিয়ম এখনও প্রচলিত আছে যে, যদি কাহারও স্বামী অনুদ্দেশ হইয়া যায়, তবে তাহাকে তাহার আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়া দ্বাদশ বৎসর কাল অতিবাহিত করিতে হয়। এই দ্বাদশ বৎসর সে সধবার ন্যায় আহার, বিহার করে ও সমাজে সধবা বলিয়া পরিচিত থাকে। পরে দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে যদি তাহার স্বামীর কোন উদ্দেশ পাওয়া না যায়, তখন সে বিধবা বলিয়া পরিচিতা এবং আশা ভরসায় জন্মের মত জলাঞ্জলি দিয়া শাস্ত্রানুসারে তাহার স্বামীর পারলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করে।

পরাশরের মতে স্পষ্টই সপ্রমাণিত হইতেছে, কেবল যে মৃত পতিকেরা

বিবাহ করিতে পাইবে এমত নহে, যাহাদের স্বামী অনুদ্দেশ হইয়াছে, কি ক্লীব কি পতিত, তাহারাও শাস্ত্রানুসারে বিবাহ করিতে পারিবে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যেটি আবশ্যক হইয়াছিল, যেটি তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তিনি তাঁহার বিধবা বিবাহের বিধি নামক পুস্তকে তাহারই মীমাংসা করিয়াছেন। অন্যান্য রমণীগণের সম্বন্ধে কোন মীমাংসা করেন নাই। তাঁহার ন্যায় পরদুঃখকাতর সদাশয় ব্যক্তি যদি ঐ সঙ্গে সধবা-দিগের বিবাহের জন্য একটী বিধি প্রণয়ন করিয়া দিতেন, তবে আজ বাঙ্গালার এ অবস্থা থাকিত না। অন্ততঃ ইহার অনেক উন্নতি হইতে পারিত। অনেক ব্যভিচারাসক্ত বারবধূগত-জীবন পুরুষের চৈতন্যোদয় হইত। স্ত্রী যে সংসারে জীবনের কিরূপ প্রিয়সখী ইহাও তাহারা অনেকে বুঝিতে পারিয়া দুষ্কর্ম্মে নিরত হইতে পারিত।

যাহা হউক যাহা হইবার তাহাত হইয়াছে, এক্ষণে আমাদের তর্কের মীমাংসা করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য! প্রস্তাব দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, শেষে আমাদের এক প্রস্তাবেই আদরিণীর কলেবর পূর্ণ করিয়া ফেলিব। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে সকল মহাকুলীনেরা বহুবিবাহ করিয়া ভার্য্যা প্রতি-পালন করেন না, প্রত্যুত ভার্য্যার বহুপরিশ্রমোপার্জ্জিত অর্থ আত্মসাৎ করিতে অভিলাষী সেই সকলের আর দীর্ঘপ্রবাসী, চিররোগী এবং সুরা-পায়ী ও ব্যভিচারাসক্ত—যাঁহারা সুরাপান করিয়া রাত্রে প্রায় গৃহে থাকেন না; ইহঁাদের পত্নীগণের বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। আর পরাশর মুনিও বলিয়াছেন; নষ্ট, মৃত, প্রব্রজিত, ক্লীব ও পতিত ব্যক্তিদিগের পত্নীরা বিবাহ করিতে পারিবে। আমাদের মতের সহিত এই মতের একবার সামঞ্জস্য করিয়া দেখুন, শাস্ত্রমতের সহিত আমাদের মতের ঐক্যতা হয় কি না। প্রথম পরাশর যাহাদের স্বামী নষ্ট ও মৃত হইয়াছে সেই সকল বিধবার বিবাহ ব্যবস্থা দিয়াছেন, আমরা বলি মহাকুলীনগণের পত্নীরা বর্ত্তমান সময়ে এই বিধির অন্তর্গত! কেন না মৃত পতিকেরা যেমন জন্মের মত স্বামীর আশা ভরসা বিহীনা, অনেক কুলীন কন্যারাও সেইরূপ। অনেক কুলীন বাস্তবিক মৃতবৎ! এ অবস্থায় মহাকুলীন কন্যাদিগের সধবাবস্থায় বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত!

অতঃপর পরাশর যাহাদিগকে প্রব্রজিত করিয়াছেন, আমরা বলি বর্ত্তমান সময়ে তাঁহারাই দীর্ঘপ্রবাসী! এ কথায় অনেক পাঠক কুপিত হইবেন, কিন্তু কি করিব উভয়ের সহিত যখন অনেক বিষয়ের সাদৃশ্য আছে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে তখন কেন না বলিব। শত সহস্রবার বলিব! যাঁহাদের স্বামী অনুদ্দেশ হইয়াছে তাঁহারা মৃত পতিকাগণের ন্যায় আশা ভরসা বিহীনা নহেন, তাঁহাদের আশা ভরসা আছে, দীর্ঘপ্রবাসী ব্যক্তিদিগের রমণী গণেরও আশা ভরসা আছে। জীবনে কখন না কখন স্বামী-সহবাস ঘটিলেও ঘটিতে পারে! তাই বলি, দীর্ঘপ্রবাসী ব্যক্তিদিগের পত্নীগণের ও পুনর্ব্বিবাহ শাস্ত্র সম্মত। ইহাতে কোন আপত্তি নাই।

পরাশরের ক্লীব আর আমাদের বর্ণিত চিররোগী অকর্ম্মণ্য ব্যক্তি একই সম্প্রদায়ভুক্ত! উভয়েরই মনে মনে আশা আছে, কিন্তু সে আশা পরিতৃপ্ত হইবার উপায় নাই। সে দরিদ্রের আশা! মনে মনে উত্থিত হইয়া হৃদয়েই আবার বিলীন হইয়া থাকে। কি পরিতাপের বিষয়! সমাজ! তুমি কি অন্ধ! তোমার কি কিছুমাত্র বিবেচনা শক্তি ও দয়া নাই। কবে তুমি আবার পবিত্র আর্য্যসমাজে পরিণত হইবে? সেদিন কি তোমার হইবে?

পরিশেষে পরাশরের পতিত আর আমাদের সুরাপানে উন্মত্ত বারবিলাসিনী সক্ত ব্যক্তি! ইহাঁদের কোন্ কোন বিষয়ের ঐক্যতা আছে বুদ্ধিমান্ পাঠকেরা ইহার বিচার করিয়া দেখিবেন। আমরা সে তুলনা আর তুলিব না। তবে একথা বলিতে পারি, ইহাঁরা শাস্ত্রানুসারে পতিত। পতিত ব্যক্তিদিগের পত্নীগণের পুনর্ব্বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত!

প্রিয় পাঠক! এতক্ষণে হয়তঃ বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন; পূর্ব্বে আমাদিগকে যে প্রলাপগ্রস্ত বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন, আপনাদের সে বিবেচনা ভ্রমসঙ্কুল হইয়া পড়িল! সধবার বিবাহযুক্তিও শাস্ত্রসঙ্গত সপ্রমাণিত হইয়া গেল। যাহা যুক্তি ও শাস্ত্রসঙ্গত, তাহার অনুষ্ঠান আজি না হউক দুইদিন পরে হইলেও হইতে পারে। জ্ঞানালোক সম্পন্ন ঊনবিংশ শতাব্দীর যে দিনে ইহার অনুষ্ঠান হইবে, সেদিন হিন্দুসমাজের পক্ষে কি শুভদিন হইবে! সেদিন যে অনেকের চক্ষুঃস্থির হইয়া যাইবে?

জগৎ কেবল নিবীড় অন্ধকারময় দেখিতে হইবে। ইহার উপায় কি? আজ যাহাকে অসহায়া অশিক্ষিতা পাইয়া দারুণ মনোকষ্ট প্রদান করিতেছ, সে যখন স্বাধীনা হইয়া স্বীয় মনোমত পতি গ্রহণ করিবে তখন সেই "শেষের দিনের" উপায় কি করিতেছ? আমরা দেখিতেছি বড় অনুপায়! সে ভীষণ পরিণাম-সমুদ্রের কূল কিনারা নাই!

উপসংহারে হিন্দুসমাজকে বলি; সমাজ! তুমি সাবধান হও, সৎপথে আইস, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, পরিণামে মঙ্গল হইবে। নতুবা দেখিতেছ বিধবারা যেমন সৎশিক্ষা পাইয়া স্বাধীনা ও ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিয়া আবার আইনানুসারে পতি পাইবার চেষ্টা করিতেছেন; সেইরূপ স্বামীসত্ত্বেও সধবারা সুশিক্ষিতা ও ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিয়া এক এক নূতন, দেখিতে পরম সুন্দর শতমুখী—স্বামীকে উপহার দিয়া নিসর্গ-বিকার দমনের জন্য দ্বিতীয় পতিগ্রহণ করিতে যত্নবতী হইবেন। চির অত্যাচার কেহই সহ্য করিতে পারে না। তাই বলি যদি মান রক্ষা করিতে অভিলাষী হও, নিজের মঙ্গল প্রার্থনা কর তবে সাবধান হও; যাহাতে আর্য্য রমণীদিগের মঙ্গল হয়, তাঁহারা প্রত্যেকে আবার এক একটী সাবিত্রী হইতে পারেন, ইহার চেষ্টা দেখ। তাহা হইলে পৃথিবীতে আবার পূর্ব্বের ন্যায় পূজনীয় হইতে পারিবে।

শ্রীবি———চ।

মুকুন্দ চরিত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমাদের ইচ্ছা আছে কবিবর মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর জীবন চরিত সমাপন করিয়া মূলগ্রন্থের যে যে অংশ আধুনিক মুদ্রিত গ্রন্থে নাই সেই সকল অংশ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার চণ্ডীকাব্যের সমালোচনা করিব। এজন্য কবির বংশ বর্ণনার পরেই যে কাব্যের উপন্যাস ভাগের

অস্থি স্বরূপ কয়েক পংক্তি কবিতা মূলগ্রন্থে লিখিত আছে নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম ;———

কার্ত্তিক মাসের পৌর্ণমাসী কোজাগর,
মহেশ ভবানী গেলা কুবেরের ঘর,
নিজ ঘরে হরগৌরী দেখি রক্ষোপতি,
পূজি সিংহাসনে বসাইয়া কৈলা স্তুতি,
করজোড়ে কহে আজি পূর্ণ মোর আশ,
কি কারণে আন্যা প্রভু করহ প্রকাশ,
শিব কহে আজি হৈতে তিথি অদ্ভূত,
তোমার ভবনে বসি খেলাইব দ্যুত,
এত বাক্য কৈল্যা যদি মহেশ ভবানী,
বহুরত্ন হীরা নিল পাশার পাতনি,
হরগৌরী পাশা পাতে হইয়া সুশঙ্ক,
পাঁচা গৌরী পাটী প্যায়া ফেলিল বামাঙ্ক,
ধনাধিপ সুভাষ গৌরী হইয়া অঙশী,
বাহিরে পাঁচার বান্ধে মনে মনে হাসি,
মহেশ ফেলিলা পাটী পড়িল দ্বিতীয়া,
মহেশের দুই পাশা দিলেন তুলিয়া,
দুই চারি গৌরী সে ফেলিলা আরবার,
মণিকর্ণ বান্ধে কোপে বাহির চৌয়ার,
মণিকর্ণে ভগবতী ছলেতে বর্ণন,
জিনিতে পারিলা সে তোমার সর্ব্বধন,
পার্ব্বতীর তিনঘর বন্ধন দেখিয়া,
মহেশেরে বলে দুন হাসিয়া হাসিয়া,
ক্রোধে শিব শাঁপে চল জগৎ ভিতর,
মৃত্যুদশা হৈল চল বণিকের ঘর,
কান্দি শিশু কহে দোষোচিত নহে শাঁপ,
বণিকের ঘরে জন্ম এই বড় পাপ।

মণিকর্ণ স্তবন শুনিয়া নানা বিধি,
প্রসন্ন হইয়া বলে শিবগুণ নিধি,
ধনেশ্বর হবে ধনপতি অভিধান,
আমার চরণ বিনা না ভাবিও আন,
এবাক্য বলিতে কলেবর ভস্ম হৈলা,
মণিকর্ণ জন্মিলেন রঘুদত্ত ঘরে,
জন্মিলেন লীলা নিধি পতির মন্দিরে,
দিনে দিনে ধন পতি মদন মূরতি,
লহনারে বিবাহ দিলেন নিধি পতি,
প্রতিদিন ধনপতি শঙ্কর পূজন,
অভয়া মঙ্গল কহে শ্রীকবি কঙ্কণ।

চণ্ডীকাব্য মধ্যে যে দুইটী কাল নির্দ্দেশ আছে তাহাদের পরস্পর সামঞ্জস্য না থকায় একটী যে অমূলক তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। যদি ১৪৬৬ শকে এই মহাকাব্য রচনার সময় অভ্রান্ত বলিয়া গণ্যকরা যায় তাহা হইলে "গ্রন্থোৎপত্তির কারণ" প্রবন্ধ লিখিত বিষয় গুলির আর সত্যতা রক্ষা পায় না। আমরা কবির স্বহস্ত লিখিত যে পুঁথিখানি দেখিয়াছি—তাহার শেষাংশটী নাই—থাকিলে মূলগ্রন্থে "গ্রন্থোৎপত্তির কারণ" প্রবন্ধ অসত্ত্বে ১৪৬৬ শক চণ্ডীকাব্যের জন্মাব্দ বলিয়া অবিবাদিত রূপে স্বীকার করিতাম। কিন্তু বঙ্গদেশের আবাল বৃদ্ধ যাঁহারা চণ্ডীকাব্যের সহিত পরিচিত তাঁহারা সকলে বলেন কবির বংশধরদিগের বাচনিক শুনা যায় যে রাজ অত্যাচার অসহ্য হওয়ায় তিনি জন্ম স্থান ত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর অঞ্চলে চলিয়া যান। কবি আপন জীবনের এতাদৃশ শোচনীয় ঘটনা যে আপন কাব্য মধ্যে উল্লেখ করেন নাই ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। আমরা অতর্কিতরূপে বলিতে পারি যে "গ্রন্থোৎপত্তির কারণ" প্রবন্ধ—কবির নিজের লিখিত এবং কাব্য সমাপ্তির পর সভাস্থ ব্যক্তিবর্গকে কাব্যোৎপত্তির পরিচয় দিবার জন্য লিখিত।

স্বর্গীয় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দামুন্যাবাসী বংশধরদিগের নিকট একখণ্ড দানপত্র আছে। সেখানি কবির পুত্র শিবরাম চক্রবর্ত্তীকে মামুদ খাঁ

নামক তদানীন্তন কোন মুসলমান রাজকর্ম্মচারী কর্ত্তৃক ১০১৪ সালের ১লা ফাল্গুণে প্রদত্ত হইয়াছে। ১০৪৭ সাল ১৬৪০ খৃষ্টাব্দ। আমরা শুনিয়াছি যে কবি আরড় ব্রাহ্মণ ভূমিতে রাজা রঘুনাথের নিকট অবস্থানকালে রঘুনাথের রাজ সংসারে একজন উচ্চতন কর্ম্মচারী আমাদিগের ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আপন গুরু করিয়া তাঁহার নিকট গুরুমন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করেন। ঐ রাজকর্ম্মচারীর বাসস্থান বৰ্দ্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্গত আহারবেলমা গ্রামে। তাঁহার সহিত সেলিমাবাদের জমিদার গোপীনাথ নিয়োগীর সহিত অন্তরঙ্গতা ছিল। তিনি গোপীনাথ নিয়োগীর সাহায্যে বর্দ্ধমানের তদানীন্ত মুসলমান রাজকর্ম্মচারী মামুদ খাঁর নিকট হইতে কবির জন্মভূমি দামুন্যাগ্রামে ১৬ ষোল বিঘা নিষ্কর ভূমি ও কয়েক খান গ্রামের সভা পণ্ডিতের অধিকার দেওয়াইয়া পুনরায় আপন গুরুকে তাঁহার জন্মভূমিতে স্থাপন করেন। কবি কঙ্কণের বার্দ্ধক্য বশতঃ তিনি আপন একমাত্র পুত্র শিবরামের নামে ঐ সম্পত্তির দানপত্র লেখাইয়া লইয়াছিলেন। এ কথার সাঙ্গত্য দেখাইবার জন্য আমরা এই বলিতে পারি যে ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মানসিংহের বঙ্গাধিকার কাল মধ্যে অন্যূন ৪০।৪৫ বৎসর বয়সে কবি এই মহামূল্য কাব্যখানি লিখিয়া উপরিলিখিত ১০৪৭ সাল অর্থাৎ ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে মামুদ খাঁর নিকট দানপত্র প্রাপ্তিরকাল উর্দ্ধসংখ্যা ৮০।৮৫ বৎসর তাঁহার জীবিত থাকা কোনমতে অসম্ভব নহে। চণ্ডী রচনারকালে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যে আমরা অন্যূন ৪০।৪৫ বৎসর বয়সের বারম্বার উল্লেখ করিতেছি কিন্তু ইহার কোন প্রমাণের উল্লেখ করিতেছিনা। কবি আপন গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;——

অনুজ মুকুন্দশর্ম্মা, সুকবি সুকৃত কর্ম্মা,
নানা শাস্ত্রে নিশ্চয় বিদ্বান,
শিবরাম বংশধর, কৃপাকর মহেশ্বর,
রক্ষ পুত্রে, পৌত্রে দিনরান।

ক্রমশঃ

স্বপ্ন।

—ঃ—

বহুদিবসের জ্বররোগে জীর্ণ শীর্ণ দুর্ব্বল হইয়া এক দিবস রজনীকালে বিরামদায়িনী নিদ্রার ক্রোড়দেশে মস্তক ন্যস্ত করিয়া বিমল সুখ অনুভব করিতেছি। আহা! নিদ্রার কি অপ্রতিহত প্রভাব—আমার সমস্ত যন্ত্রনা বিদূরিত করিল—পীড়ার সে ভীষণ যন্ত্রনা সকল ভুলিয়া গেলাম যে যন্ত্রনায় সততঃ অস্থির হইতে ছিলাম—যে যন্ত্রনায় তীব্র আঘাতে আমাকে সততঃ কাঁদাইতে ছিল, সে দুর্ব্বিসহ যন্ত্রনা ক্রমে ভুলিয়া গেলাম। শুধু রোগ যন্ত্রনা কেন?—যে দুর্ভাবনায় মন ক্ষণে উত্থিত ক্ষণে পতিত—সর্ব্বদাই আন্দোলিত হইতেছিল, যে সংসারিক কুটিল চিন্তায় শরীরের শোনিত পর্য্যন্ত বিশুষ্ক করে—প্রাণিকে নিস্তেজ ও নৈরাশ্য কূপে নিমগ্ন করে, সেই সমন সদৃশ শোনিত শোষণকারী দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তা সমস্ত তিরোহিত হইল—আমি শান্ত হইলাম, প্রাণ শীতল হইল। রোগ যন্ত্রনা জনিত আর সে কাতরোক্তি নাই, সে দুঃখাশ্রুপাত নাই, সে হাহাকার শব্দ নাই, সে অধীরতা বা অস্থিরতা নাই; আমি নির্ব্বাক ও নিশ্চিন্ত ভাবে পীড়া শয্যায় শায়িত হইয়া নিদ্রার বিমল সুখ সম্ভোগ করিতেছি—এ সুখ কত দিবস আমার ভাগ্যে ঘটে নাই, জানি না কি সৌভাগ্য বলে আজি আমি নিদ্রার আবেশে অচৈতন্য। এই রজনীতে কত কি কাণ্ড হইতেছে—নিশার এই কয়েক প্রহরের মধ্যে পৃথিবীর কত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে; বহু জনাকীর্ণ গ্রাম, জনপদ, অতল জলে ডুবিয়া যাইতেছে, আবার জলময়ী-নিম্নভূমি উর্দ্ধে উন্নমিত হইতেছে, কত মানব জন্ম পরিগ্রহ করিতেছে, আবার কত মানব অনন্তকালের জন্য পৃথিবীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছে, কত লোক হাহাকার শব্দে কাঁদিয়া কাঁদিয়া গগণ মণ্ডলকে প্রতিধ্বনিত করিতেছে আবার কত লোক হাস্য তরঙ্গে জীবন তরী ভাসাইয়া বেড়াইতেছে, কত সাধ্বী সতী চির কালের জন্য পতি বিচ্ছেদে চির দুঃখিনী হইতেছে আবার কত অনূঢ়া নবকুমারি পতির সহিত

সংমিলিত হইয়া অপার আনন্দ সম্ভোগ করিতেছে, কত জনে রোমিও জুলিয়েটের ন্যায় প্রিয়জন সমাগমে সুখানুভব করিতেছে, পক্ষান্তরে আবার কত জনে দারুন বিরহ ব্যথায় ব্যথিত হইয়া মর্ম্মে মর্ম্মে পুড়িতেছে— এইরূপ জগতে নানা প্রকার ব্যাপার হইতেছে। কিন্তু পৃথিবীতে যাহাই হউক, আমি সে সমস্ত দেখিব কেন? এখন কি আমি সংসারের দাস? পৃথিবীর সম্বন্ধে এখন আমি কে? কেহই নই—এক্ষণে আমি সম্পূর্ণ ভাবে নিদ্রা দেবীর করায়ত্ত। নিদ্রাদেবী যাহা করাইবে তাহাই করিব, যাহা দেখাইবে তাহাই দেখিব, আমার নিজের শক্তি এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে।

ক্রমে নিদ্রা অপেক্ষাকৃত গাঢ় হইয়া আসিল, অমনি নিদ্রাসহচরী স্বপ্ন দেবী আসিয়া জুটিল—ইন্দ্রিয়গণ জাগ্রত থাকিলে স্বপ্নদেবী আসিয়া তাহার কুহকজাল বিস্তার করিতে কোন মতেই সাহসী হয় না; এক্ষণে মানসিক শক্তি নিচয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কার্য্য হইতে অপসৃত হইয়া বিশ্রাম করিতেছে সুতরাং এই সুযোগ পরিত্যাগ করিলে স্বপ্ন কখন আর তাহার কার্য্য সাধন করিতে পারিবে? এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া স্বকার্য্য সাধন তৎপর স্বপ্নদেবী ধীরে ধীরে আমার অন্তরিন্দ্রিয়ে প্রবেশ করিয়া স্বীয় প্রভাবজাল বিস্তার করিল—আমি স্বপ্ন দেখিলাম আমি এক সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছি। জনপদবাসী সকলে আমাকে নরপতি বলিয়া সম্মাননা করিতেছে। আমার আদেশে শত শত রাজকর্ম্মচারী রাজ কার্য্য পরিচালনে অনুরক্ত রহিয়াছে। শিবিকা, যান, বাহক, হয়, হস্তী অসংখ্য আমার ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। আমি যখন যে আদেশ করিতেছি, সেই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তন্মুহুর্ত্তে শত শত লোক ছুটিতেছে। গগণস্পর্শী রাজ অট্টালিকায় বাস করিতেছি—কত শত দাস দাসী আমার পরিচর্য্যায় রত, পাছে আমার কোন অসন্তোষের কারণ উত্থিত হয়, এই ভয়ে সকলে সশঙ্কিত। এইরূপে কিছুকাল আনন্দ উল্লাসে, হাস্য তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে জীবন তরীর হাল চালাইতে লাগিলাম—কিন্তু সুখ সৌভাগ্য কত দিন থাকে? আনন্দের দিন নিমেষের মধ্যে ফুরাইয়া যায়। প্রকৃতির নিয়মই এই। যে সুধাংশু বিমল জ্যোৎস্না বিকীরণে পৃথিবীকে সৌন্দর্য্যের আগার করে, রাহু আসিয়া সেই

শশধরকে গ্রাস করে—যে প্রস্ফুটিত কুসুম স্বীয় সৌন্দর্য্যে ও আমোদে জগতকে মুগ্ধ করে সেই কুসুমের পরমায়ু কতক্ষণ? পরক্ষণেই সেই কুসুম ভূতলশায়ী—হায় রে! যে কুসুমকে মানব বক্ষে ধারণ করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারে না, সেই আদরের ধন ধূলি ধূসরিত। ঐ যে সরোবরে স্বচ্ছ সলিলে পদ্ম ভাসিতেছে—কেমন প্রফুল্ল মনে হাসিতেছে, কিন্তু উহার ঐ মধুর হাসি কতক্ষণ থাকিবে? প্রিয়জন সমাগমের সহিত ঐ হাসির আরম্ভ—তাহার বিচ্ছেদেই ঐ হাসির শেষ। তাই বলি আজি যে হাসিতেছে কাল সে দুঃখে মর্ম্ম বেদনায় অধীর হইয়া কাঁদিবে; পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রকৃতির নিয়মই এই—সেই প্রকৃতির ধারাবাহিক নিয়মানুসারে আমার স্বপ্নলব্ধ এই সোণার সংসারের শেষ হইল—আমার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী আসিয়া উপস্থিত হইল—তাহার সহিত বিবাদ বিসম্বাদে, আমাকে সর্ব্বশান্ত হইতে হইল! "পেয়ে অতুল সম্পত্তি, অদ্য যে রাজ চক্রবর্ত্তী, কল্য তার ভিক্ষাবৃত্তি হতেছে অবলম্বন" এই বাক্যের যথার্থ আমার উপর প্রদর্শিত হইল; আমি এক্ষণে দুঃখে অনাহারে কাঁদিতে কাঁদিতে সময় ক্ষেপন করিতে লাগিলাম। প্রকৃতির কি আশ্চর্য্য নিয়ম—যাঁহার অতিথীশালায় প্রতিদিন সহস্র অতিথী উদর পূরিয়া আহার পাইত—যাঁহার দেবালয়ে নিত্য অগণ্য ব্রাহ্মণের ভোজ্য দ্রব্য প্রস্তুত হইত, আজ তাঁহাকে এক মুষ্টি অন্নের জন্য কাঙ্গালের মত পথে পথে দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করিতে হইতেছে, কিছুই সম্বল নাই—আশ্রয় বিহীন, তরুতল মাত্র সার। কষ্টের এক শেষ হইয়াছে, দুঃখের আর অবধি নাই। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিতেছি, আর স্বীয় অদৃষ্ট লিপি আলোচনা করিতেছি, এমন সময়ে হটাৎ চমকিয়া উঠিলাম আর অমনি আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল—দেখিলাম আমি আমার সেই অপ্রসস্থ কুটিরে পীড়া-শয্যায় শায়িত। এতক্ষণ যে সমস্ত বিষয় সন্দর্শন করিতেছিলাম, সে সমস্ত সত্য নহে—স্বপ্ন মাত্র। আমি অপ্রতিভ হইলাম, কিন্তু আমার বক্ষস্থল দুর দুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, প্রাণবায়ু আন্দোলিত হইতে লাগিল।

মানুষ! তুমি কিসের এত অহঙ্কার কর! তুমি কি ভাবিয়াছ তোমার

চিরদিন সমান যাইবে। আজ ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া তুমি চক্ষে দেখিতে পাইতেছ না, কিন্তু তোমার ঐশ্বর্য্য কত দিন থাকিবে? আমার স্বপ্নলব্ধ সোণার সংসার যেমন, পৃথিবীর ধন ঐশ্বর্য্যও ঠিক সেই প্রকারের। স্বপ্নে আমি যেমন রাজা হইয়াছিলাম, আবার পথের ভিখারী হইলাম, পৃথিবীতে নিমেষে নিমেষে সেই প্রকার ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, এখন পৃথিবীতে অগণ্য দীন পরিবার রহিয়াছে, যাহারা এককালে অতুল ধনের অধীশ্বর ছিলেন; এমন বিস্তর নিরন্ন ব্যক্তি রহিয়াছেন যাঁহারা এককালে অগণ্য অতিথীকেও বিমুখ করেন নাই। তাই বলি সমস্তই স্বপ্ন—সমস্তই ভোজ-বাজি, সমস্তই মিথ্যা। তবে জিজ্ঞাসা এই নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নকে যেরূপ মিথ্যা বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিলাম, সংসারকে, সংসারের ধন ঐশ্বর্য্যকে সেইরূপ অলীক বলিয়া উপলব্ধি হয় না কেন? উত্তর—যত ক্ষণ নিদ্রা না ভঙ্গ হয় ততক্ষণ স্বপ্নকে অলীক বলিয়া কে স্থির করিতে পারে? মানুষ এক্ষণে মোহ নিদ্রায় অচেতন, সেই মোহ নিদ্রার আবেশে মানব এই সংসার স্বপ্ন দেখিতেছে, মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইলেই সমস্ত অসারতা বাহির হইয়া পড়িবে—তখনই উপলব্ধি হইবে, যে এ সংসারে প্রকৃত পক্ষেই ভোজবাজীর ব্যাপার!——স্বপ্ন মাত্র!!

শ্রীরাঃ——

আদরিণীর প্রতি।

১

আ-দ-রি-ণি—আ-দ-রি-ণি!
সারল্য-আবাস আহা কাপট্য বিহীন,
কেমন সুন্দর নাম, পবিত্র প্রীতির ধাম,
আনন্দ উচ্ছ্বাসে যেন আপনিই লীন,
সোহাগের আদরের আসনে আসীন।

২

বড় ভালবাসি আমি,
শ্রবণ মধুর নাম শুনিতে তোমার,
এ হেন পীযুষাসার, ঢালিতে কে পারে আর,
সজোরে কাড়িয়া লও আদর আমার,
শ্রুতি পরিতুষ্টি মাত্র দিয়া উপহার।

৩

যথার্থই আদরিণী;
গুণ জানি হেন, নাম যে দিল তোমায়,
হ'য়ে তার আদরিণী, সোহাগের গরবিনী,
ভুলাও ভারত জড় আধ ভাঙ্গা বোলে,
দেখি তোরে নাচিবারে সকলের কোলে।

৪

তোমার মধুর নাম,
আশা করি, এক দিন মধুর নিনাদে,
হিমানি আলয় হ'তে, কুমারিকা—একমতে
গাহিবে সকলে, হ'বে প্রতিধ্বনি তার,
সাগরের দুই কূলে অতি চমৎকার।

৫

ভারত ললনা যবে,
বিবাহের পরদিন যাবে স্বামী ঘর,
আদরিণী তার সনে, লবে আনন্দিত মনে,
পড়িবে—জুড়াবে তার বিষণ্ণ অন্তর,
ভুলিবে ক্ষণেক—মাতা পিতার অধর।

৬

কতদিনে আদরিণি,
পূর্ণ হবে আমাদের এ আশা সকল,

কালচক্র আবর্ত্তন, অবস্থার বিঘূর্ণন,
কিছুই তোমায় যেন করেনা বিকল,
অবশ্যই একদিন হইবে সফল।

৭

করিয়াছ পদার্পণ,
দ্বিতীয় বরষে এই মাত্র কিছুদিন,
এখনই রূপেগুণে, জানিয়াছি শুনে শুনে
সন্তুষ্ট সবাই, হও ক্রমে দিন দিন,
প্রতিষ্ঠার স্থায়ীত্বের আসনে আসীন।

৮

প্রথম বৎসরে তুমি,
পাইয়াছ উপন্যাসী যেই অলঙ্কার,
"গিরিজা" "জ্যোতির্ম্ময়ী" প্রণয় সতীত্বময়ী,
সাজায়েছে তব দেহ অতি চমৎকার,
নির্ম্মান নৈপুণ্য জানাইছে নির্ম্মাতার।

৯

"নববর্ষ" "প্রাণদণ্ড"
থাকুক তোমার অঙ্গে হইয়া অক্ষয়,
এহেন তোমার তরে, যাঁরা প্রাণপণ করে(ন)
আত্মীয় সুহৃদ বলি জানিও নিশ্চয়,
পিতার সমান সদা করিও প্রত্যয়।

১০

বড় ভালবাসি আমি,
কাটাইতে তব সনে দুঃখের সময়,
প্রবল দুশ্চিন্তা যবে, অদিষ্ট অস্ফুট রবে,
ভীষণ অনল সম পোড়ায় হৃদয়,
তব পাঠ বারি সুধা সিঞ্চি সে সময়।

১১

সংসার স্রোতের ঢেউ,
এড়ায়েছি কত আমি তব আলাপনে,
সুমিষ্ট সুন্দর তব, চরাচর অসম্ভব,
প্রবোধ দিয়াছে কত অদৃষ্ট তাড়নে,
ফেলিয়াছি অশ্রুজল তখন বিজনে।

১২

কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ;
ভুলিতে নারিব কভু তব উপকার,
কর বঙ্গ বিনোদন, কর জ্যোতি বিকীরণ,
বাঁধুক প্রতিভা তব নয়ন সবার,
দেখিয়া তোমায় যেন লাগে চমৎকার।

জনৈক পাঠক

শ্রীকা:——

বিজয় সিংহ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

পিঞ্জরে বিহঙ্গিনী।

রাত্রি প্রায় ৮ টা বাজিয়াছে, বাদসাহের গৃহ যেন আনন্দ নৃত্য করিতেছে, কোথাও বাদ্য কোথাও গীত, বাদসাহের সন্তান প্রভৃতিরা স্থানে স্থানে মনোমোহিনী লইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, তাহাদের কণ্ঠধ্বনি যেন গৃহ ভেদ করিয়া আকাশ স্পর্শ করিতেছে। দেখিয়া বোধ

হইতেছে যে বাদসাহ ভবন আনন্দময়, এখানে বুঝি বিষাদ প্রবেশ করিতে ভীত হয়। দেখিয়া বোধ হইতেছে যে বাদসাহের পৌরবাসী মাত্রেই সুখী। পাঠক! এই সময়ে আমার সহিত আইস, তোমায় অন্তঃপুরে লইয়া যাই। ঐ দেখ একটী সুসজ্জিত গৃহ মধ্যে বসিয়া একটী পঞ্চদশ বর্ষিয়া যুবতী এই গীতটী গাহিতেছে :—

বিধাতা তোমার বল এ কেমন বিড়ম্বনা,
অবলা রমণী ব'লে কেন দাও যাতনা।
কেন এ সাধিলে বাদ, দিয়ে সুখে অবসাদ;
সতীত্ব অধিনী ধন নাশিতে হ'ল বাসনা?
ছিল সুখে স্বামী পাশে, বল তারে কোন দোষে;
যম হাতে দিলে সঁপি করি আকুল পরাণা?

গীত সমাপ্ত হইলে, ক্ষণেক নীরব হইয়া কি ভাবিতে লাগিল, ভাবিতে ভাবিতে তাহার নয়ন ছল ছল করিয়া উঠিল। একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "বিধাতঃ আমায় কেন সুন্দরী করিয়াছিলে, আমাকে যদি অতি কুৎসিত করিয়া সৃজন করিতে, তাহা হইলে কি এই নররাক্ষস দুরন্ত সম্রাটের চক্ষু তাহা আকৃষ্ট করিত। হায়! বিধি লিপি কে খণ্ডন করিবে, ব্রাহ্মণ কন্যা হইয়া ঘৃণিত যবনী হইয়াছি। দুরান্ত চক্ষু শূল যবনের সহবাস করিতে হইতেছে। অনিচ্ছায় বেশ্যা বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি, আমা অপেক্ষা মন্দ ভাগিনী কে আছে? স্বামী, পিতা, মাতা, সমস্তই হারাইয়া প্রাণ ভয়ে পর মনরঞ্জন করিতেছি, স্বপ্নেও তাঁহাদের নাম মুখে আনিতে পাই না।"

এমত সময়ে একটী দাসী আসিয়া কহিল "বিবি! বাদসাহ আজ আপনার গৃহে থাকিবেন, আপনাকে কোন বেশে সুসজ্জিত করিয়া দিব অনুমতি করুন।"

"তোমার যে বেশ ভাল লাগে।"

দাসী বিনা বাক্য ব্যয়ে সুচিকন পরিচ্ছদ আনিয়া তাহাকে সাজাইতে লাগিল, পরিধান সমাপ্ত হইলে কহিল "বিবি তেমোয় কি মনোহর দেখাইতেছে।"

"ঐতেই ত আগুন লেগেছে।"

"সে কি কথা বিবি তোমার ন্যায় ভাগ্যবতী কে আছে? বাদসাহ তোমায় বড় ভালবাসেন, তোমায় না দেখে তিনি দশদিনও থাকিতে পারেন না।"

রমণীর চক্ষু জলে সিক্ত হইল, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

দাসী কহিল "তোমার আবার দুঃখ কিসের, তোমার দীর্ঘ নিশ্বাস ভাল দেখায় না। আমরা জানি আমাদের ন্যায় হতভাগিণী বাঁদীদের জন্যই ঈশ্বর দীর্ঘ নিশ্বাসের সৃষ্টি করেছেন।"

রমণী আর একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল "আমার ন্যায় চির পরাধীনা তোমা অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে মন্দভাগিনী।"

দাসীর সে কথা বিশ্বাস হইল না, ঈষৎ হাসিয়া কহিল "ও কথা কি বল্‌তে আছে।" এমত সময়ে অপরা দাসী সসব্যস্তে আসিয়া কহিল "বাদসাহ আসিতেছেন।"

রমণী উঠিয়া তাঁহাকে দ্বার দেশ হইতে যথা বিহিত অভ্যার্থনা করিয়া গৃহ মধ্যে আনিলেন। বাদসাহ একটী মূল্যবান আসনে উপবিষ্ট হইয়া কহিলেন "বিবি! তোমার অভ্যার্থনায় ও যত্নে আমি অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়াছি। আমার উচিত তোমার অভ্যর্থনা করা, বাদসাহ আরঙ্গজেব তোমার নিকট কোন সম্মানের প্রার্থনা করে না, বরং তাহার ইচ্ছা যে তোমার পরিচর্য্যা করে।"

"সে কি জাঁহাপনা, আমি আপনার নিকট ক্ষুদ্রতম কীটমাত্র, যদি এক পলও আপনাকে পরিতুষ্ট করিতে পারি তাহা হইলে আপনাকে সৌভাগ্যবতী জ্ঞান করিব।"

"দেখ বিবি! আমি তোমার উপরে এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছি যে তোমাকে অবিলম্বে প্রধানা বেগম করিতে স্থির করিয়াছি।"

রমণী বিনীত ভাবে কহিল "এ অধিনী সে মর্য্যাদা পাইতে সর্ব্বতো-ভাবে নিকৃষ্টা।"

বাদসাহ রমণীকে ক্রোড়ে বসাইয়া মুখ চুম্বন করিলেন। দাসীরা তাম্বুলদান রাখিয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃতা হইল।

বাদসাহ কহিলেন "দেখ বেগম আমার মন যখন বড় খারাপ হয় তখন তোমার নিকট আসিয়া যত দূর পরিতৃপ্ত হই এমন আর কাহার নিকট হই না।"

"দাসীর সৌভাগ্য।"

বাদসাহ ঈষৎ হাসিয়া রমণীর মুখ চুম্বন করিয়া করিয়া কহিলেন "সে কি কথা বরং আমার সৌভাগ্য।"

রমণী কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল "অমন কথা মুখে আনিয়া আমাকে অপরাধিণী করিবেন না।"

বাদসাহ কহিলেন "দেখ আমার ইচ্ছা হয় যে সর্ব্বদা তোমার কাছে আসিয়া পরিতৃপ্ত হই কিন্তু রাজকার্য্যের ব্যস্ততায় তাহা হইয়া উঠে না।"

রমণী কহিল "জাঁহাপনা! যদিও অধিনী আপনার সহবাসে স্বর্গ সুখ অনুভব করে, তথাপি রাজকার্য্যের তুলনায় সে সুখ তৃন অপেক্ষাও নিকৃষ্ট, আপনি রাজকার্য্যে অবহেলা করিয়া আমাকে সুখিনী করিবেন না।"

"বিবি! বলিতে কি অদ্য কএক দিন হইতে আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছে। এ দিকে বিজয় সিংহ ও উদয় সিংহ পলায়ন করিয়াছে, আবার পশু শিবজি আমার বিদ্রোহিতাচরণ করিতেছে। শীঘ্রই একটা তুমুল সংগ্রাম বাধিবার সম্ভাবনা, কে যে বিজয় ও উদয়কে মুক্ত করিয়াছে তাহা এখনও সম্পূর্ণ স্থির হইতেছে না। যে সকল রক্ষীবর্গ তাহাদের রক্ষণা বেক্ষণায় নিযুক্ত ছিল তাহারাও নিরুদ্দেশ হইয়াছে। এ মায়া কে বিস্তার করিয়াছে, প্রিয়ে! বলিতে কি আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। বেগম ফুলসমের পুত্র জাফরকে বিদ্রোহিতা দমন করিতে পাঠাইয়াছি। শিবজি হত হইলে নিশ্চিন্ত হই। বিজয় সিংহকে পিপিলিকার ন্যায়ও জ্ঞান করি না।"

রমণী কহিল "শুনিয়াছি শিবজি নাকি বড় পরাক্রমশালী।"

"বাদসাহের অসংখ্য সেনানী অপেক্ষাও কি শিবজি পরাক্রমশালী।"

"সে কথা কি সম্ভবে।"

"সে যাহাই হউক আমি অতি সামান্য শত্রুকেও বিশ্বাস করি না।

ইচ্ছা করিতেছি যে স্বয়ং শীঘ্রই যুদ্ধ যাত্রা করিব। কি জানি বালক জাফর যদি কৃতকার্য্য না হয়।

রমণী কহিল "অধিনীর অপরাধ মার্জনা করিবেন—জাঁহাপনা যুদ্ধে যাইবেন শুনিয়া আমার হৃদয় কাঁপিতেছে।"

বাদসাহ ঈষৎ হাস্যসহকারে রমণীর মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন "সে বিষয়ে ভীত হইও না।"

"ঈশ্বর আপনাকে সর্ব্বথা রক্ষা করুন। কিন্তু জাঁহাপনা যুদ্ধকালে এ অধিনীকে আপনার সেবার্থ যদ্যপি লইয়া যান তবে বড় আহ্লাদিত হই।"

"প্রিয়ে যুদ্ধে রমণী লইয়া যাত্রা করা নীতি বিরুদ্ধ, নতুবা তোমায় লইয়া যাইতাম, বিশেষতঃ যুদ্ধ কুসুম নিভ কমনীয় নহে। বিপদ সর্ব্বদাই আশঙ্কা করিতে হয়। শুনিলাম যে জাফর তাহার নূতন বেগম কমলাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছে, ইহাতে আমি সন্তুষ্ট নহি।"

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমত সময়ে একজন দাসী ভীতিবিহ্বলা হইয়া আসিয়া কহিল "বাদসাহ পুত্রী অমিলা ও তাঁহার দাসী মোনিয়াকে অনেকক্ষণ হইতে অনুসন্ধান করা যাইতেছে, কিন্তু কোথাও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।"

বাদসাহ "সে কি?" বলিয়া তথা হইতে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন। দাসীও তাঁহার অনুসরণ করিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

——:০:——

যবন শিবির।

একটি প্রকাণ্ড প্রান্তরে শত শত যবন শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রত্যেকের শিরভাগে অর্দ্ধচন্দ্র সুশোভিত যবন পতাকা পত পত শব্দে উড়িতেছে। শিবির রক্ষণাবেক্ষণার্থ শত শত রক্ষী উলঙ্গ অসি হস্তে

কৃতান্তের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। সেনাগণ মত্ত হইয়াছে, “আল্লা আল্লা” রব করিতেছে। পাঠক! এই সময়ে আমার সহিত একটি শিবির অভ্যন্তরে আইস। দেখিয়াছ কে একটি অষ্টাদশ বর্ষীয়া যুবতী ধূলিশয্যায় শায়িত রহিয়াছে। ইহাকে চিনিয়াছ কি? ইনি আমাদের পূর্ব্ব পরিচিতা কমলা দেবী। প্রিয় পাঠক! একবার শিবির মধ্যে ইতিস্তত দৃষ্টি সঞ্চালন কর তাহা হইলেই বুঝিবে নবাবের নবাবী কিরূপ ছিল। বাদসাহ পুত্র যুদ্ধে আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার শিবির বহুমূল্য বস্ত্র নির্মিত। তৃণ দল মূল্যবান কিংখাবে আচ্ছাদিত। চতুর্দ্দিকে কিংখাপের পরদা তাহাতে বড় বড় মুক্তার ঝালর শোভা পাইতেছে। উপবেশনাসন সমস্তই প্রায় স্বুবর্ণ নির্ম্মিত, তাহার কারুকার্য্যের মূল্য স্বর্ণ অপেক্ষাও অধিক। কমলা দেবীর বদন দ্যুতি যদিও মলিন ও হীনপ্রভ তথাপি তাহা শিবিরস্থ সমস্ত মনিমুক্তাকে হারাইয়াছে। কমলা দেবী উপাধানে বদন ন্যস্ত করিয়া কাঁদিতেছিল। অনেকক্ষণ নীরবে রোদন করিয়া পরে চক্ষু মুছিয়া উপবেশন করিয়া কি ভাবিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে কহিল “রমণীটি বলিয়াছিল আমায় উদ্ধার করিবে, সে কথা কি মিথ্যা? আমায় যুদ্ধক্ষেত্রে আসিতে কহিয়াছিল, আমিত আসিয়াছি—কিন্তু যুদ্ধ কই? পামর জাফর আমার রূপে মুগ্ধ হইয়াছে, অতি শীঘ্র যদ্যপি আমি এ যমপুরী হইতে উদ্ধার হইতে না পারি, তবে না জানি আমার কপালে কি ঘটিবে। আর স্তোপ দিয়া কতকাল রাখিব। পামর হয়ত এক দিবস বল প্রকাশ করিবে।” এই কথা বলিতে বলিতে কমলা শিহরিয়া উঠিল। আবার বলিতে লাগিল “এ সংসারে আমার একটি স্নেহাধার পিতা ছিলেন—” আর কথা কহিতে পারিল না কাঁদিতে লাগিল, অনেকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে রহিল পরে বলিল “রমণী বলিল বিজয় ও উদয় সিংহকে গোপনে কারামুক্ত করিয়াছে—একথা কি সত্য?—নবাব পুত্রী—অমিলা, আহা অমিলার নাম করিলেও আনন্দ হয়। অমন পাষাণে নলিনী বিকাশ কিরূপে হইল। অমিলা বা ইহাতে এত আনন্দ প্রকাশ করে কেন? বিজয়সিংহ ও উদয় সিংহ কারা যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে বলিয়া যেন আর তাহার আনন্দ

ধরে না। আমাকে স্নেহময়ী ভগ্নীর ন্যায় যত্ন করিত। যদি অমিলা না থাকিত তাহা হইলে যে আমার দশায় কি হইত তাহা আমি ভাবিতেও শঙ্কিত হই।" আবার ক্ষণেক কি ভাবিল, আবার বলিল "বিজয়সিংহ তুমি হয়ত আমায় বিস্মৃত হইয়াছ? না না তাহা কি সম্ভব; সে সুকুমার হৃদয় কি পাষাণের আশ্রয় স্থল হইতে পারে? বিজয়সিংহ আমায় ভালবাসেন। আমি যবনের সহবাসে আছি বলিয়া তিনি যদি আমায় গ্রহণ না করেন—যদি আমায় অসতী বিবেচনা করেন।" কমলার চক্ষে জল আসিল, চক্ষু মুছিয়া বলিল "রে নির্দ্দয় বিধাতঃ তোর মনে এই ছিল।" আবার কাঁদিল, আবার বলিল "বিজয়ের পায় ধরিয়া বলিব যে আমি অসতী নই। তিনি যদি তাহা বিশ্বাস না করেন। না করেন তাঁর পদতলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিব।" কমলা আবার কাঁদিতে লাগিল।

এমত সময়ে বাদসাহ তনয় জাফর শিবির মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল "একি সোণার কমল ধূলায় কেন?"

কমলা চক্ষু মুছিয়া কহিল "আর অধিকদিন এ ভাবে থাকিব না।"

জাফর। জান্! তুমি এখনও কাঁদিবে? আমি আশায় আর কত কাল বাঁচিব?

কমলা। যতদিন পারেন।

জাফর। আর যে অসহ্য হইয়াছে।

কমলা। যুদ্ধ ব্যবসায়ীর কি যুদ্ধ সময়ে রমণীতে মনোনিবেশ করা উচিত। আপনি যুদ্ধে জয়ী হউন আমি আহ্লাদের সহিত আপনার বেগম হইব।

জাফর আহ্লাদে কমলার অঙ্গ স্পর্শ করিতে যাইতেছিল। কমলা বিদ্যুত বেগে দণ্ডায়মানা হইয়া কহিল "আবার? আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমার অনিচ্ছায় আমাকে স্পর্শ করিলে আমি আত্মহত্যা করিব।

জাফর। না জান্, তুমি রাগ করিও না আমি তোমায় স্পর্শ করিয়া বিরক্ত করিব না। কিন্তু তুমি আমার একটি অনুরোধ রাখ এই হিন্দুবেশ পরিত্যাগ করিয়া যবন বেশ পরিধান কর।

কমলা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল "ভাবিবেন না সময় হইলে সকলই করিতে হইবে।"

জাফর আহ্লাদে গদগদ হইয়া কহিল " জান্! তুমি আগ্রায় থাকিতে ভালবাস না দিল্লীতে থাকিতে ভালবাস, না শিবিরে শিবিরে ভ্রমণ করিতে ভালবাস? "

কমলা। আপনাকে দেখিতে পাইলে আমি সকল স্থানেই সুখানুভব করি।

জাফর। তোমার ন্যায় রমণী যাহার দর্শন অভিলাষ করে সেত ভাগ্যধর পুরুষ।

কমলা। ও কথা কি বলিতে আছে।

জাফর। সম্পূর্ণ বলিতে আছে, আমি তোমার একজন দাসানুদাস মাত্র।

এমত সময়ে একজন দাসী আসিয়া কহিল " জাহাপনা কোন বিশেষ কার্য্য বশত, সৈন্যাধ্যক্ষ আপনার চরণ দর্শণাভিলাষী হইয়াছেন। আপনার অনুমতি হইলে তিনি অপেক্ষা করেন। "

জাফর বিরক্তি সহকারে কহিল " তুমি তাহাকে অপেক্ষা করিতে বল আমি যাইতেছি। "

দাসী নিষ্ক্রান্তা হইলে জাফর কমলাকে কহিল " দাস এখন বিদায় প্রার্থনা করিতেছে, প্রিয়ে কথা কও, চাঁদবদন তুলিয়া বিদায় দাও। "

কমলা মনে মনে বলিল " ঈশ্বর! না জানি আপনি অধিনীকে কতদিনে এই বাক্য যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি দিবেন। " একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল " আসুন! "

জাফর কহিল " প্রিয়ে আমায় বিদায় দিতে কুণ্ঠিত হইতেছ? আমি এখনি আসিতেছি, নতুবা অনুমতি হয়ত যাই না। "

কমলা কহিল " সে কি কোন বিশেষ আবশ্যক না থাকিলে তিনি এ সময়ে আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিবেন কেন? আপনি শীঘ্র আসুন " অগত্যা জাফর প্রস্থান করিল। আমরা শুনিয়াছি যে তিনি সে দিবস সৈন্যাধ্যক্ষের সহিত ভালরূপে কথা কহেন নাই।

———

আগমনী।

স্নানান্তে লক্ষ্মী সরস্বতী চুল শুখাইতে ছিলেন এমন সময় কৈলাশ হইতে ভুলোর মা পুজার তত্ত্ব লইয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া লক্ষ্মী সরস্বতী "ঐ মা পুজার তত্ত্ব পাঠাইয়াছেন" বলিয়া, নিকটে যাইয়া বাবা কেমন আছেন, মা কেমন আছেন এবং দাদারা ও খোকা কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সরস্বতী ভুলোর মার হাত হইতে সন্দেশের হাঁড়িটী নামাইয়া লইয়া বস্ত্রের পোটলা খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং কহিলেন "ভুলোর মা, এবার বাবা এমন ছাই কাপড় দিয়েছেন কেন?"

ভুল। ওর চেয়ে আর ভাল কাপড় পাওয়া যায় নাই; আবার দোলের সময় ভাল কাপড় পাঠাবেন বলে দিয়েছেন। ঐ কাপড়ের ভিতর নেকোন আছে,—জামাই বাবু কোথায়?

লক্ষ্মী। তিনি ঘরে আছেন। হালা ভুলোর মা, বলি বৌর আর এর মধ্যে ছেলে টেলে হবে না?

"একখান ফলন্ত পাত পড়েছে দেখে এসেছি" বলিয়া, ভুলোর মা নাভিকুণ্ডের ভিতর হইতে পরিধেয় বস্ত্রের একটা কোন টানিয়া বাহির করিল এবং ৫। ৭ টী বন্ধন মোচন করিয়া দুইটী টাকা ও একটী আদুলি বাহির করিয়া লক্ষ্মীর হাতে দিয়া কহিল "টাকা দুইটী জামাই বাবুকে জুতা কিন্তে আর আদুলিটী তোমাদের মাচ খেতে দিয়েছেন। ৩রা কার্ত্তিক পূজা, ২৭ আশ্বিন সকলে রওনা হইবেন, তোমার মা অবিশ্যি অবিশ্যি তোমাদের মাথার দিব্বি দিয়ে যেতে বলেছেন, না গেলে বড্ডো দুখুঃ কর্‌বেন। ঐ কাপড়ের ভেতর থেকে নেকোন খানা দেও, জামাই বাবুকে দিয়ে আসি।

লক্ষ্মী পত্রখানি বাহির করিয়া কহিলেন "ওমা! এ লেখা এমন বিশ্রি কেন? খোকা লিখেছে বুঝি।" সরস্বতী "দেখি" বলিয়া পত্রখানি

লইয়া কহিলেন "এলেখা বাবার হাতের, সেয়াই কালীতে কঞ্চির কলম দিয়ে লেখা, দেখে চিন্তে পারচো না?"

ভুলোর মা পত্র লইয়া প্রস্থান করিলে সরস্বতী, লক্ষ্মীকে কহিলেন "দিদি, পূজোয় যাবে?" (১)

লক্ষ্মী। আমি ভাই যাব না। তুমি যেও, নচেৎ মা দুঃখ করবেন।

সর। দিদি, তুমি যাবে না কেন?

লক্ষ্মী। কি সুখে যাব? গিয়ে ত কোন সুখ নাই বরং পদে পদে দুঃখ পেতে হয়। ভগ্নি, একি কম দুঃখ! আমি যে কি বস্তু হতভাগারা চিন্তে পাল্লে না, চিন্লে যত ইংরাজ প্রভৃতি বিদেশীয়েরা। আমার যাদের প্রতি স্নেহ মমতা, যাদের জন্য অন্তরে কেঁদে মরি, যারা কিসে সুখী হবে ভেবে ভেবে অস্থির হই, তারা কিনা আমাকে শুঁড়ির দোকানে ও বেশ্যা মন্দিরে রেখে আসে? আমি ফল পুষ্প, লতা পাতা, বন জঙ্গল সকল স্থানেই বিরাজ করি জেনে, যে জাতি ম্লেচ্ছের দাস হইয়া পৃষ্ঠে পাদুকাঘাত খাইয়া আমাকে পাইতে ইচ্ছা করে, তাহাদের কি মুখ দেখিতে আছে?

সর। দিদি, আমাকে তুমি যেতে বল্‌চো, আমার কি যাওয়া উচিত? আজ কাল আমাকে কলু, কুমার, কুমোর, চামার ও চণ্ডালে পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতেছে। এবং অনেকে আমাকে ইংলণ্ড, আমেরিকা, জর্ম্মণী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

লক্ষ্মী। তোমারও যাওয়া উচিত নয়। তবে আর ২। ১ বৎসর যাইয়া দুষ্ট মূর্ত্তিতে রাজপুরুষদিগের স্কন্ধে চাপিয়া এই পরামর্শ দেওগে— তাঁহারা যেন উচ্চ শিক্ষার ধ্বংশ জন্য কলেজগুলিকে উঠাইয়া দিতে যত্ন করেন।

(১) লক্ষ্মী সরস্বতীর মধ্যে কে বড় এই বিষয় লইয়া অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। পাঠ্যাবস্থায় আমরা বিদ্যা আদায়ের জন্য সরস্বতীকে বড় বলিতাম, কিন্তু তাহাতেও তিনি কৃপা করেন নাই; এক্ষণে লক্ষ্মীকে আমাদের বড় বলিয়া স্বীকার করিতে হইতেছে, যেহেতু যতদিন পৃথিবীতে থাকিব টাকা কড়ির বিশেষ আবশ্যক হইবে।

এই সময়ে নারায়ণ পূজা উপলক্ষে বাজার দেনা মিটাইতে কি খরচ হইবে হিসাব দেখিয়া ধার্য্য করিতেছিলেন। ভুলোর মা নিকটে যাইয়া কহিল " জামাই বাবু, ভাল আছ ত? এই নেকোন এনেছি লও।"

নারায়ণ পত্র লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন ;——

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বাসয়ুরস্তু বিশেষ।—

বাবাজীবন, আগামী ৩ রা কার্ত্তিক মদীয় শ্বশুরালয়ে শ্রীশ্রী৺ শারদীয় পূজা ও তদুপলক্ষে নৃত্য গীত ও উৎসবাদি হইবে। তুমি সপরিবারে মদীয় ভবনে আগমন করিলে আমরা সকলে একত্র হইয়া তদীয় ভবনে যাত্রা করিব। আসিতে কোন মতে অন্যথা করিবে না। বৎসরান্তে শ্রীশ্রী৺ শারদীয় পূজা উপলক্ষে পরস্পরে দেখা সাক্ষাৎ হয় একান্ত বাসনা, অতএব তোমাদিগের আসা না হইলে আমি এবং বাটীর মধ্যে মহা দুঃখিতা হইবেন। পত্র বাহিকা মাং শ্রীমতী কন্যা মাতা দ্বয়ের জন্য দুইখানি নীলাম্বরি সাটী এবং তোমার ধুতি উড়ানী প্রেরণ করা হইল। এবং তোমার বিনামা খরিদ কারণ দুই টাকা এবং মৎস্য খরিদ বাবৎ এক আদুলি ও কিছু মিষ্টান্ন ও পাঠান হইল। আমরা ২৭ শে তারিখে রওনা হইব অতএব তৎপূর্ব্বে আসা উচিত হইতেছে।

ভুলোর মা, যাবার সময় পত্রের উত্তর নিয়ে যাস, এক্ষণে স্নান করে জল টল খেগে। মনে মনে ভাবিলেন—কর্ত্তা লিখেছেন "পূজা উপলক্ষে নৃত্য গীত ও উৎসবাদি হইবে" ঐ সঙ্গে মদের ঢেউ খেলিবে ও অভিসারিকাদিগের সুযোগ উপস্থিত হইবে লিখিলে ভাল করিতেন।

ভুলো। দিদিদের সঙ্গে করে তোমাকে যেতে হবে, নইলে মা বড় দুঃখ করবেন।

ভুলোর মা প্রস্থান করিলে নারায়ণ কহিলেন " যাব কি? যাওটা বিড়ম্বনা মাত্র। নারায়ণ যখন অন্যমনস্ক হইয়া যাওয়া উচিত কি না ভাবিতেছিলেন তখন সরস্বতী ধীরে ধীরে গৃহ প্রবেশ করিয়া নারায়ণের অজ্ঞাতসারে তাঁহার পশ্চাৎদিক হইতে নিজের মৃণাল-সদৃশ-স্বর্ণ বলয় সংযুক্ত ভুজদ্বয় দ্বারায় গলা বেষ্টন করিয়া ধরিলেন এবং তাঁহার পৃষ্ঠে

ভর দিয়া নিজ মুখখানি নারায়ণের মুখের নিকট লইয়া যাইয়া কহিলেন "আমি যাব।"

নারায়ণ একদৃষ্টে দেবীর সেই সময়ের রমণীয় শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখেন সামান্য বেশে তিনি আশ্চর্য্য শোভা ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার নাতি উষ্ণ নাতি শীতল আলুলায়িত কেশদাম গণ্ডে কপোলে, স্কন্ধে এবং পৃষ্ঠদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে এবং তদুপরিস্থ সূক্ষ্ম বস্ত্র ভেদ করিয়া তাহার জ্যোতি নির্গত হইতেছে। নারায়ণ এক দৃষ্টে সেই শোভা সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন। সরস্বতী কহিলেন "আমি যাব।"

নারা। কোথায় যাবে?

সর। মা, মামার বাড়ী নিয়ে যাবেন, বলে পাঠিয়েছেন।

নারা। তুমি যাও তাতে কোন আপত্য নাই, কিন্তু তাহারা তোমার প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া বীণা হস্তে নৃত্যকারীর ন্যায় যে সাজায়, দেখিয়া আমার বড় লজ্জা হইয়া থাকে। বলিতে কি চালে বসিয়া যখন ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতি অষ্টকোটী দেবতা তোমার প্রতি চাহিয়া, মুখ টিপিয়া হাস্য করেন তখন লজ্জায় আমার কথাটী কবার যো থাকে না।

সর। আমার কাটামোখানা দেখেন তাহাতে তোমার লজ্জা কি? আজ কাল যে আমার বরপুত্রেরা স্ত্রীকে উলঙ্গ বেশে কেমন দেখায় দেখিবার জন্য ফটোগ্রাফ তুলে বৈঠকখানায় টাঙ্গাইয়া রাখিয়া থাকেন।

নারা। তোমার দিদি কি যাবেন?

সর। তিনি যাবেন না, বল্লেন যাদের জন্য যাওয়া তারা আমাকে বড় অপব্যয় করে, এজন্য যাব না।

এই সময় লক্ষ্মী গৃহমধ্যে প্রবেশ করায় সরস্বতী জিহ্বা কাটীয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। নারায়ণ লক্ষ্মীর প্রতি চাহিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন "তুমি এবার পূজায় যাবে না?"

লক্ষ্মী। না।

নারা। তোমার ভগ্নীর যাইতে বড় ইচ্ছা হয়েছে।

"ছেলে মানুষ যখন যাবার সাধ হয়েছে সঙ্গে করে নিয়ে যেও।"

বলিয়া খট্টাঙ্গে যাইয়া শয়ন করিলেন এবং চক্ষে অঞ্চল দিয়া মৃদুস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দনে নারায়ণ বিস্ময়াভিভূত হইলেন। সরস্বতী দ্রুত গিয়া শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিলেন এবং "দিদি তুমি কাঁদচো? বলিয়া, সযোরে তাঁহার মুখ হইতে হস্ত টানিয়া লইয়া কহিলেন "হাঁ, কাঁদ্‌চো দেখি! দিদি, আমার মাথা খাও, সত্য করে বলো— কাঁদ্‌চো কেন?"

লক্ষ্মী। ভগিনী, আমি যে কেন কাঁদ্‌চি তাকি তুমি জান না? কেন যে আমার চক্ষে জল পড়্‌ছে তাকি তুমি জান্তে পার্‌চোনা? দিদি, আমি যে যাবনা বলে মনে কত কষ্ট পাচ্চি তা অন্তর্য্যামী ভগবানই জানেন। আহা! আমি ভিন্ন যে ভারতবাসীদিগের উপায় নাই, আমি না যাইলে তারা যে অন্নাভাবে মারা যাবে, চতুর্দ্দিকে হাহাকার রব উঠিবে। তাদের দুরবস্থার কথা যত আমি মনে ভাবচি, তত আমার বক্ষঃস্থল নয়নজলে ভেসে যাচ্চে। তবে যে আমি যাবনা বল্লাম, বিস্তর মন কষ্টে। সরস্বতী, একি কম দুঃখের কথা লোকে আমাকে চিনেও চিনে না, আমার সদ্ব্যয় জানে না। তুমি বিদ্যাদান কর, এজন্য এই দিব্য দিতেছি এখন হতে এই উপদেশ দিও—যেন তারা আমাকে কলম পিশে না উপার্জ্জন করতে চায়, সকলে ব্যবসা বণিজ্য করিলে তবে প্রাপ্ত হবে; নচেৎ পাদুকাঘাত লাভের আশা করিলে আমি কাহাকেও দয়া করিব না।

নারা। চল না কেন, তিন দিনেতে লোকে তোমায় কত অপব্যয় করিবে?

লক্ষ্মী। এ বৎসর যাব না, ৭২ সালের ন্যায় মধ্যে মধ্যে চৈতন্য দেওয়া ভাল।

নারা। এ বিষয়ের পরে বন্দোবস্ত করা যাবে, এক্ষণে ভূলোর মাকে দেখে শুনে খেতে দেওগে, কুটুম্ব বাড়ীর লোক। আর যদি যাওয়া স্থির হয় অদ্যই কাপড় গুলো ধোলাই করুতে দেওগে, কারণ পূজার আর দিন নাই।

লক্ষ্মী সরস্বতী প্রস্থান করিলে নারায়ণ পত্র লিখিতে বসিলেন;— প্রণামা শতকোটী নিবেদনঞ্চাগে।———

মহাশয়ের পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম, এবং পত্রের

জায় অনুযায় দ্রব্যাদিও পাইলাম। আমি সপরিবারে ২৬ শে তারিখে উপস্থিত হইয়া মহাশয়ের শ্রীচরণ দর্শন করিব। ইতি

পূঃ—পত্র বাহিকাকে চারি আনা মজুরি দিলাম। বাটীর মধ্যে আমার প্রণাম জানাইবেন।

অপরাহ্নে ভুলোর মা পত্র লইয়া প্রস্থান করিল। ভুলোর মা কৈলাশে আসিয়া সংবাদ দিলে ভগবতী অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইলেন। এবং সদানন্দকে পত্র পাঠ করিয়া শুনাইতে কহিলেন। পত্র পাঠ শেষ হইলে ভূতনাথ একটা ভূতের হাতে কয়েকটী পয়সা দিয়া কহিলেন "বাজার হইতে একটু তানপুরার তার কিনে আন, পূজবাড়ীতে গিয়া কদিন আমোদ করিতে হইবে। প্রত্যাগমন কালে ছিদ্‌মে ছুতোরকে দোলাখানা মেরামৎ করে রং মাখিয়ে দিয়ে যেতে বলে আসিস্।"

ভূত প্রস্থান করিলে আশুতোষ নন্দীকে ডাকিয়া কহিলেন "ষাঁড়-গুলকে রীতিমত ঘাস জল দিও, ধান্য ক্ষেত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখ, যদি অপরের গরু বাছুরে শস্য নষ্ট করে পোঁওে দিতেও ত্রুটি কর না। আমি যেখানে শয়ন করি অল্প অল্প জল পড়ে. পূজার কদিন যদি বর্ষা হয় খাটখানাকে ধরাধরি করে সরিয়ে রেখ।

নন্দীকে পরামর্শ দিয়া তিনি ব্যাগ গুছাইতে লাগিলেন। ব্যাগের মধ্যে একটি ছোট হুঁকো, ভাঙ্গা কল্কে, গাঁজা, কয়েকখানি টিকা ও একটি দেশালাই বাক্স রাখিলেন। ভগবতী দেখিয়া কহিলেন "ভদ্র সমাজে যাচ্চ, ও গুলো নিয়ে গেলে ব্যাগ শুদ্ধ টেনে জলে ফেলে দেব।"

কার্ত্তিকও পোর্টমেণ্ট সাজাইতে বসিলেন। অনেকগুলি ভাল ভাল বস্ত্র স্তরে স্তরে সাজাইয়া গন্ধ দ্রব্যের শিশিগুলি পাছে ভাঙ্গিয়া যায় এই আশঙ্কায় অতি সাবধানে বস্ত্রের মধ্যে রাখিলেন। গণেশও ব্যাগ গুছাইলেন এবং ব্যাগের মধ্যে একখানি চেলি একযোড়া খড়ম ও একটী পুঁটলি বাঁধিয়া কতকগুলি সিদ্ধি লইলেন। ভগবতী, লক্ষ্মী, সরস্বতীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন এবং এক একবার গৃহমধ্যে যাইয়া তোরঙ্গ খুলিয়া সিঁদুরের কৌটা, আল্‌তা ও মাথাঘসা এবং কি কি বস্ত্রাদি লইয়াছেন দেখিতেছিলেন।

বাড়ীতে মহা ধূমধাম। সূত্রধরেরা ঠুক্‌ঠাক শব্দ করিয়া দোলা মেরামত করিতেছে এবং রং মাখাইতেছে। দরজিরা কার্ত্তিক গণেশের পীরাণ ও শিবের গায়ের মের্জাই শেলাই করিতেছে। বেহারারা আসিয়া বায়নার টাকা লইয়া "টং টং" শব্দে বাজাইয়া দেখিতেছে। সদানন্দ আনন্দ মনে ভৃত্য ও পরিচারিকাদিগকে নূতন বস্ত্র দান করিতেছেন। মেথর ধোপা নাপিত প্রভৃতির বেতন এবং চৌকিদার, ডাকের পিওন প্রভৃতিকে পার্ব্বনী দেওয়া হইতেছে। বাজার দেনা এক পয়সাও রাখিতেছেন না, যে দোকানে যে দ্রব্যের উঠ্‌না খাইয়াছেন বেবাক পরিষ্কার করিয়া দিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে দুইখানি শিবিকা আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তন্মধ্যে একখানি হইতে নারায়ণ, অপর খানি হইতে সরস্বতী নামিয়া দেবাদিদেবকে প্রণাম করিলেন। ভোলানাথ লক্ষ্মী না আসায় অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কহিলেন " এ বৎসর কোজাগর পূজা হইবে না দেখ্‌চি।"

ভগবতীর ঝি জামাই পাইয়া আজ মহানন্দ। তবে লক্ষ্মী না আসায় দুঃখও করিতে লাগিলেন। নারায়ণ অনেক রজনী পর্য্যন্ত সম্বন্ধী দ্বয়ের সহিত মিষ্টালাপ ও গল্পাদি করিতে করিতে অধিক রাত্র পর্য্যন্ত কাটাইয়া নিদ্রা যাইলেন। দেখিতে দেখিতে ২৬ শে রাত্র অতিবাহিত হইয়া যাইল।

প্রাতে উঠিয়াই সকলে স্নান করিলেন। জয়া ভাত ডাল প্রস্তুত করিয়াছিল প্রত্যেকের কোলে দিয়া যাইল। আহারান্তে সকল দলবদ্ধ হইয়া হিমালয়ের নিম্নে আসিয়া নামিলেন।

সকলে নানা গ্রাম ও জনপদের মধ্যে দিয়া বঙ্গদেশাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাহারা যে স্থানের মধ্যে দিয়া আসেন দেখেন প্রত্যেক স্থানের লোকেই পূজার আমোদে মাতিয়াছে। নির্ধন ব্যক্তিরা নিজ হস্তে বাড়ীর সম্মুখস্থ বন জঙ্গল পরিষ্কার ও দূর্ব্বাঘাস ছুলিতেছে। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা গ্রামস্থ রাস্তা ঘাট গুলি পরিষ্কার করাইয়া দিতেছেন। কোন কোন পূজাবাড়ীর সম্মুখে তালপত্র শুখাইতেছে, বাড়ীর দরজায় চূনের গোলা মাখান হইতেছে, বাড়ীর ভিতরে ডোমেরা খান খান শব্দে বাঁশ চিরিয়া টাট্‌ বাঁধিতেছে। কোন বাড়ীর ভিতর ঠাকুর চিত্র

হইতেছে, গ্রামের ছেলে আর বাকী নাই সকলেই এই স্থানে আসিয়া যুটিয়াছে। কতকগুলো ছেলে দরজার নিকট খেলা করিতেছিল, ভগবতীর দোলা দেখিয়া "একখানা ডুলিরে, একখান ডুলি" বলিতে বলিতে কিছুদূর পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া আসিল। ইহারা যত অগ্রসর হন ততই পূজার আমোদ দেখিতে পান। দেখেন বিস্তর তাজা ও পাকা শিক্কাধারী তসর কাপড় পরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা পুঁথি বগলে হন হন শব্দে রাস্তা দিয়া চলিয়াছে। কৃষ্ণপুরে গড়োগোয়ালারা বোধোন পূজার নৈবেদ্য মস্তকে বাটী বাটী বাটোয়ারা করিয়া দিতে বাহির হইয়াছে। মালীরা সাজের চুবড়ী মস্তকে রাস্তা দিয়া ছুটিতেছে। চিত্রকারেরা রংয়ের ডালা মস্তকে ও খড়ি মাটীর ভাঁড় হাতে দ্রুতগতি যাইতেছে। কুচো কুমোরেরা ঘট ভাঁড়, টাটি ও কল্কে প্রভৃতি লইয়া বাবুদের বাড়ী দিতে যাইতেছে। প্রত্যেক বাড়ীর দ্বারে দ্বারে "ব্যা ব্যা" শব্দে পাটা চীৎকার করিতেছে। ঢাকীরা ঢাক ঘাড়ে বাজাইতে রওনা হইয়াছে। বাজার হইতে কাদা মাথা কৃষকেরা এবং মেছুনী, গোয়ালিনী প্রভৃতিরা মানচেষ্টারের তাঁতিদিগের তাঁতের পাট তুলা মিশান বস্ত্র খরিদ করিয়া, বগলে করিয়া আনিতেছে। ইহারা কোন কোন বাজারের মধ্যে দিয়া আসিতে লাগিলেন। দেখেন পূজা উপলক্ষে বাজার গুলিও সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছে। বস্ত্র বিক্রেতারা নানা বর্ণের বস্ত্র আনিয়া দোকান সাজাইয়াছে এবং খরিদারেরা বস্ত্র বগলে দোকান হইতে বহির্গত হইতেছে। ময়রারা পূজা বাড়ীর জন্য নানা প্রকার মিষ্টান্ন ভিয়ান করিতেছে এবং এক একটা দোকানে ৫। ৭ খান খোলা চাপিয়াছে। বেণের দোকানে মাথা ঘসা ও আলতার খরিদারে পরিপূর্ণ হইয়াছে। খেলেনদার জুগীর দোকানেও ধূম ধাম কম নয়, কোন দোকানে বসিয়া বাবুদের বাড়ীর পরিচারিকা রেশমের সূতায় বাজু তাবিজ লবঙ্গ ফুল গাঁথাইতেছে। কোন দোকানে বসিয়া ইতর জাতীয় স্ত্রীলোকেরা চূড়ী পরিতেছে, চুড়ী পরিতে হস্ত ক্ষত বিক্ষত হইয়া শোণীত ধারা বহিতেছে, যন্ত্রনায় কাঁদিয়া চক্ষু জলে মাটী ভিজাইতেছে কিন্তু তথাপি পরিব না বলিতেছে না। গ্রামে গ্রামে প্রবাসি স্কুল বালকেরা আসিয়া রাস্তা ঘাট আলো করিয়া বেড়াইতেছে।

চাকরেদিগের নৌকা ঘাটে লাগিয়াছে এবং তন্মধ্যে যাহাদের বাড়ী পূজা আছে তাঁহারা কর্ম্ম স্থান হইতে ঘৃত, ময়দা, চাউল, রম্ভা, নারিকেল এবং বাতাবী লেবু কিনিয়া আসিয়াছেন, মুটেরা মাথায় করিয়া তুলিতেছে। কোন কোন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেরাণী বাটী আসিয়াছেন, নৌকার মাজি তাঁহার কার্পেটের ব্যাগ হস্তে তুলিয়া দিতে যাইতেছে। যাত্রার দল রাস্তা দিয়া দল বদ্ধ হইয়া চলিয়াছে, তাহাদের পেটরা লইয়া বুড়ো বুড়ো বাঁকী গুলো ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছে, এবং চতুর্দ্দিক হইতে "কার দলরে, কার দলরে।" শব্দ হইতেছে। কবিওয়ালারাও গাইতে যাইতেছে, ইহাদের কোন আপদ বালাই নাই, কোমরে কাপড় বেঁধে শুধু হাতে যাইতেছে, এবং এক একবার অভ্যস্থ গান গুলি আবৃত্তি করিতেছে;—

কও দেখি উমা, কেমন ছিলে মা, ভিকারি হরের ঘরে।

জানি নিজে সে পাগল, কি আছে সম্বল, ঘরে ঘরে বেড়ায় ভিক্ষা করে॥—ইত্যাদি।

ভগবতী এই সকল দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মনে মনে কহিলেন "আহা! আমার আগমনে লোকের কি আনন্দ। যত দিন পৃথিবী থাকিবে, যতদিন সমস্ত আর্য্য সন্তান ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান এবং মুসলমান প্রভৃতিতে মিশিয়া গিয়া একটী হিন্দু থাকিবে পৃথিবীতে আসিতে নিরস্ত হইব না।

ক্রমে সন্ধ্যা হওয়ায় সকলে একটী পান্থ শালায় বাসা লইলেন। সদানন্দ এক ছিলিম তুরিতানন্দ টানিয়া তানপূরা হস্তে গান ধরিলেন;

দেখে ভারতের দুঃখ বড় ব্যথা পাইরে মনে।
পাঁচজনে শুষ্‌চে এরে, লুঠছে ঘুঠে বত্রিশ জনে॥
সোনার ভারত মাটী হ'ল, যা ছিল এর সকল গেল,
ভারত বাসী মাটী খেয়ে, দম্‌কা ভেদে মরচে প্রাণে॥
ভারতের আর কি ধন আছে, চাটী মাটী সকল গেছে।
কর্‌চে বাটী, কিনে মাটী, এ দুঃখ কি সহে প্রাণে॥

শ্রীদুর্গাচরণ রায়
জামালপুর।

আশা মিটিল না।

" Exiles, the proverb says, subsist on hope,
Delusive hope still points to distant good,
To good that mocks approach."

এই প্রপঞ্চ জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়া যে দিন হইতে জ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছে—যে দিন ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুখ দুঃখ, ভয় ভরসা, ভাল মন্দ বিবেচনা করিতে এবং মনোবৃত্তি সমুদায়ের চালনা করিতে শিক্ষা করিয়াছি, সেই দিন হইতে আশা করিয়াছিলাম, যখন বয়োপ্রাপ্ত হইয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইব, তখন প্রভূত অর্থোপার্জ্জনে ধনেশ্বর হইব, আমাদিগের বাস ভবন ইন্দ্রালয় তুল্য করিব, (বাল্যকালের কথা!) আত্মীয় স্বজনবর্গের সুখ-সচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিব—মাতৃভূমির শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া তাহাকে ধরাগ্রগণ্য করিব—দীন দরিদ্র দিগের দারিদ্র্য দুঃখ নিরাকরণের অশেষ বিধ উপায় করিব—তাহাদিগের জন্য অর্জ্জিত অর্থ উৎসর্গ করিব—পৃথিবীতে দরিদ্রের দুঃখ রাখিব না—অনাথ দীন হীন বর্গের অন্ন বস্ত্রাভাব মিটাইব—নিরাশ্রয় বালক বালিকা দিগের ভরণপোষণ, এবং বিদ্যাশিক্ষার উপায় বিধান করিব—অসহায়া পতিপুত্রহীনা কামিনীকে আশ্রয় দিব,—স্বহস্তে তাহাদিগের অশ্রু মুছাইব—আশা এরূপ ছিল যে, তাহাদিগের সকল দুঃখ বিদূরিত করিব—মানুষে যাহা কখন পারে না, আমি তাহা করিব। যে যে উপায়ে পারি, সমাজের কুরীতি সমুদায় সংশোধন করিয়া, সুনীতি ও সুশিক্ষা দ্বারা সমাজকে বিশুদ্ধ করিয়া তুলিব, সমাজের সকল অভাব দূর করিব, প্রথমে আপনার জন্ম ভুমির, আপন সমাজের, আপন জাতির, পরিশেষে সমস্ত পৃথিবীর অভাব ঘুচাইব।

রেলওয়ে শকট চক্রের অপেক্ষাও কালচক্র দ্রুতবেগে ঘুরিতেছে, দেখিতে দেখিতে আমার বাল্যকাল কাটিয়া গেল, যৌবন নিকট হইল, গোচে গোচে বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিলাম—দূর হইতে সংসার

কাননের সুচারু সুচিকন শোভা দেখিয়া মন ভুলিয়া গেল। কাননের শীর্ষ-দেশ শ্যামল নবীন নধর পল্লব-রাজিতে অপূর্ব্ব শোভিত, মধ্যে মধ্যে নীল, লোহিত পীতাদি নয়নাভিরাম কুসুমদামের মনোহারিতা, তদুপরি শিখী পংক্তির বিন্যস্ত পুচ্ছ-শোভা, তন্নিম্নে আরণ্য তরু সমুদায়ের স্তম্ভ সকল নব-মুকুলিতা-লতিকালিঙ্গনে ঘনতর শ্যাম দেখিয়াছি, তৎপ্রদেশের অপূর্ব্ব কল্পিত সুখ লাভের প্রত্যাশায় প্রধাবিত হইতে লাগিলাম। যত নিকটস্থ হইতে লাগিলাম, কলনিনাদি-বিবিধ বিহঙ্গম কুলের সুশ্রাব্য মধুর কণ্ঠস্বর ঐকতান বাদ্যের ন্যায় শ্রবণ জুড়াইতে লাগিল। তখন অশেষ আগ্রহ জন্মিল—ইচ্ছা হইল অবিলম্বে তাহাতে প্রবেশ করিয়া জীবন সার্থক করিতে হইবে। তখন আমাকে কেহ বারণ করিল না—বরং অনেক লোককে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহাদিগের অনুবর্ত্তী হইলাম। ভিতরে যাইয়া দেখি, তাহার কিছুই নাই—ভয়াল সিংহ শার্দ্দূলাদি শ্বাপদেরা ঘূর্ণিত লোচনে লাঙ্গুল সঞ্চালন করিতে করিতে বিকট মূর্ত্তিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। স্থানে স্থানে বিশালদেহী অজাগরগণ নিশ্বাস হুতাশনে তত্তৎ স্থানের লতাগুল্মাদি দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। দেখিয়াই শোণিত শুষ্ক হইয়া গেল।

সংসারে প্রবেশ করিয়াই ত এই বিষাদ! যেরূপ লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াছিলাম, তাহার ফল পাইলাম না—যাহা উপার্জ্জন করিতে লাগিলাম, তাহাতে নিজের উদর শোষণ করিয়া পরিবার প্রতিপালন করা চলে না। আশা সঙ্গে আছে—ভয় কি? যাহার মোহন মন্ত্রে জগৎ মুগ্ধ! মিথ্যাকে সত্যের পরিচ্ছদ পরাইয়া মনুষ্য মুগ্ধ করিতে যাহার মত পটু পৃথিবীতে আর কেহ নাই, হয় কে নয়, নয় কে হয় করিয়া দেখাইতে যাহার মত আর দ্বিতীয় নাই, আশার কুহকে সংসার চলিতেছে, আশা না থাকিলে মনুষ্যের যে কি হইত বলা যায় না! আশাই জগৎ রাখিয়াছে! সংসারে প্রবেশ করিবা-মাত্র ভয় পাইলাম—হতাশ হইলাম, পূর্ব্বের ইচ্ছা, পূর্ব্বের সাধ মিটাইতে পারিব মনে হইল না। আশা তাহা হইতে নিবৃত্ত করিল, মিষ্ট বচনে কাছে আসিয়া আশ্বাস দিয়া বলিল "ভয় নাই আর কয় দিন? অপেক্ষা কর তোমার সকল সাধ মিটিবে, এমন সময় আসিবে যখন তোমার সকল

ইচ্ছা সিদ্ধ হইলে, সকল সুখে সুখী হইবে”। বরাবর যাহার কথা শুনিয়া, যাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি তাহার একটা কথার সার্থকতা দেখিতে পাইলাম না বলিয়া চিরকালের জন্য তাহাকে অবিশ্বাস করা বড় ভাল হয় না; তাহার কথায় নির্ভর করিয়া রহিলাম। দুদিন, একদিন, দুমাস, একমাস, দুবছর, দশবছর করিয়া, বল, বুদ্ধি, ভরসার সময় কাটিয়া গেল, আশার কোথাও সফলতা দেখিতে পাইলাম না। মনে দুঃখ হইল, ক্রোধ জন্মিল, ক্ষোভ আসিয়া উপস্থিত হইল। মনে করিলাম, যদি আশার সাক্ষাৎ পাই, মনের মত শাস্তি দিব, দুর্দ্দশার চূড়ান্ত করিব—অধিকক্ষণ নয়—একটু পরেই অপূর্ব্ব বেশ ভূষায় অঙ্গাবরণ করিয়া হাসিতে হাসিতে আশা আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল,—রাগে ফিরিয়া দেখিতে ইচ্ছা হইল না। আশা তখন স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া, প্রিয়সম্ভাষণে কথা কহিয়া আবার লোভ দেখাইতে লাগিল। কোন মতে বিশ্বাস করিব না—কোন মতে তাহার কথায় কর্ণপাত করিব না—কিন্তু কি মোহন-মন্ত্র জানে মন ভুলাইয়া দিল—বেলা দ্বিপ্রহর অতীত, দিবাকর পশ্চিম গগনে নামিতেছেন—আশা পূর্ব্বদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া একটী রমণীয় ইন্দ্রধনু দেখাইয়া বলিল “ঐ ইন্দ্রধনু যে স্থানে মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়াছে সেই স্থানে পৌঁছিলেই তোমার ইষ্ট সফল হইবে—বেগে চল; যত শীঘ্র পৌঁছিবে, তত শীঘ্র তোমার কামনা পূর্ণ হইবে।” তখন চারুহাসিনীর বাকচাতুরী বুঝিতে না পারিয়া, কথার সত্যাসত্য বিবেচনা না করিয়া দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিলাম—যত যাই, পথ আর ফুরায় না—শেষে দৌড়িতে লাগিলাম; যত দৌড়ি, ইন্দ্র ধনুও দৌড়িতে থাকে, ধরা দেয় না—ক্রমে বেলা শেষ হইয়া আসিল—আমারও তিন কাল গিয়া এক কালে ঠেকিল—বৈকালিক সমীরণে পূর্ব্বাকাশের জলদমালা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল—ইন্দ্রধনুও লুকাইল—আমি হত বুদ্ধি-দণ্ডায়মান হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—ভাবিলাম আশা মিটিল না—কুহকিনী তখনও ছাড়ে না—ভয়ে নিকটে আসিতে পারে না। দূর হইতে আমার পুত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তখনও আমাকে রাজপিতা হইবার কথা বলে। এই জগতে আশার-ছলনায় না ভুলিয়াছেন, এমন ব্যক্তি নাই—রাজা, মন্ত্রী, অধ্যাপক, প্রজা,

ধনী, দরিদ্র, বালক, বৃদ্ধ, বনিতা তাহার নিকট প্রতারিত না হইয়াছে এমন লোক নাই। আশা কখন সত্য কথা বলে না—লোকের সহিত প্রবঞ্চনা, প্রতারণা ভিন্ন কদাপি সরল ব্যবহার করে না,—লোক জানিয়া শুনিয়াও তাহার কথায় বিশ্বাস করিতে, তাহার কথায় নির্ভর করিতে ছাড়ে না। আশার অদ্ভুত শক্তি, আশ্চর্য্য বাহাদুরী!

সন্ধ্যা হইল, সূর্য্য অস্তাচলে চলিলেন, আকাশ অন্ধকারময় হইল, জীবন-সন্ধ্যা নিকট, আশা মিটিল না,—মনে করিয়াছিলাম, সমস্ত জীবন মধ্যে প্রতিদিন একটী সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া সকল মঙ্গল ধাম সেই করুণাময় বিশ্ববিধাতার তত্ত্বানুচিন্ততে বিমলানন্দ ভোগ করিব, তাহাও হইল না। ইহকাল পরকাল দুই কালেরই কাজ হারাইলাম, বিদ্যাচর্চ্চায় বাল্যকাল কাটিয়া গেল—"হাহা" করিয়া সংসার চিন্তায় যৌবনকালটা অতিবাহিত করিলাম—আশার শঠতায় ভুলিয়া হতবুদ্ধি মূঢ়ের ন্যায় বার্দ্ধক্যেও আসল কার্য্যের কিছু করিতে পারিলাম না। এখন কিছুই হইল না—ধনের আশা—স্বজনের আশা—বড় হইবার আশা—সকল আশাই ফুরাইয়া আসিল—যাহা মনে করিয়াছিলাম, তাহার কিছুই করিতে পারিলাম না—যেমন আসিলাম তেমনি চলিলাম—আসা যাওয়া সার হইল, ভূতের ব্যাগার খাটিয়া চলিলাম, কিছুই করিতে পারিলাম না। স্রোতো জলের বুদ্বুদের ন্যায় উঠিয়া একটু ভাসিয়া গিয়া স্রোতে মিসাইতে চলিলাম; আর কিছু হইল না, কেবল মাত্র এলাম গেলাম, কিছুই রাখিয়া যাইতে পারিলাম না। মনের আশা মনেই রহিয়া গেল।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

ধর্ম্মহিতৈষী। মাসিক পত্র। মূল্য এক পয়সা। কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও এ পত্রখানি প্রচারের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলাম না। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রখর তপনতাপের উত্তেজনায় বোধ করি ইহার জন্ম, আষাঢ়ের জল পাইয়াছে, কিরূপ দাঁড়ায় বলা যায় না। ইহার যেমন ছাপা, তেমনি কাগজ, তেমনি লেখা। আশা করি প্রকাশক মহাশয় আর এরূপ পত্র প্রচার করিয়া পাঠক সমাজকে ক্ষতিগ্রস্থ ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবেন না।

গোপাল ভাঁড়। শ্রীকিষণলাল বর্ম্মণ সম্পাদিত। কলিকাতা।

আমাদিগের নবদ্বীপের রসিক বন্ধু অনেকদিনের পর অনুগ্রহ করিয়া সাক্ষাৎ করিয়াছেন। গোপাল ভাঁড়ের হাসি ভরা মুখ দেখিয়া সুখী হইলাম। আমরা ভাঁড় মহাশয়কে প্রকৃতই সমাদর করিয়াছি। এই নিবেদন যে ভাঁড় মহাশয় যেন শীঘ্র আমাদের প্রতি নিদয় হইয়া অন্তর্দ্ধান না হয়েন।

বাবুদের এ না হোলে মজা কি। প্রহসন। কলিকাতা বঙ্গ-বিদ্যা প্রকাশিকা যন্ত্রে মুদ্রিত।

সমাজ সংস্কার এ প্রহসন খানির উদ্দেশ্য হইলেও ইহা কুৎসিত রুচির পরিচারক, সুতরাং ইহার সমালোচনা করিয়া আদরিণীর অঙ্গ কলুষিত করিব না।

গাঁজাখুরী। কলিকাতা পাইক পাড়া হইতে প্রকাশিত।

গাঁজাখুরী—গাঁজাখোরের লেখা নহে; ইহার উদ্দেশ্য ভাল বলিয়া বোধ হইল।

সময় কাটান।

সময় অন্য কথায় জীবন। সময় যত যাইতেছে আমাদের জীবনের দিনও তত কমিতেছে। সময় কাটিয়া আমাদের বয়োবৃদ্ধি হয় কিন্তু জীবন কমে। সুতরাং আমরা যখনই সময় কাটিতেছেনা বলিয়া অনুতাপ করি, তখনই একপ্রকার জীবনের অল্পত্ব প্রার্থনা বা বাসনা করি। দীর্ঘ-জীবন বাসনা কেনা করে? অথচ প্রায় সকলই কোন না কোন সময়ে দিন কাটিতেছে না বলিয়া পরিতাপ করে। মনুষ্য জীবনের এই অদ্ভুত রহস্য সহজে বুঝা যায় না। যখন সময়ই জীবন, তখন সেই সময়ের অন্তর্ধান বাসনা যে এক প্রকারে জীবন কমাইবার ইচ্ছা তাহাতে সন্দেহ কি? মনুষ্য অল্পায়ুত্ব হেতু প্রায় সতত ক্ষুণ্ণ. অথচ সেই জীবনের সময়ের দ্রুতগমন বাসনা করে, মানব মাত্রেরই এই ভ্রমান্ধতা বড়ই কৌতুকাবহ।

মনুষ্য মাত্রেরই সময় আছে, সুতরাং সেই সময় যে কোন প্রকারেই হউক কাটাইতেই হইবে। ক্রীড়া করিয়া হউক, শ্রম করিয়া হউক, আমোদ করিয়াই বা হউক—সময় কাটান চাই, তুমি যদ্যপি বৈরাগ্যবশতঃ সময় কাটাইতে না চাও, সময় আপন কার্য্য আপনি করিয়া তোমায় কাটাইয়া যাইবে। সে যাহাই হউক মনুষ্য আপন আপন জীবন কিরূপে সাধারণতঃ অতিবাহিত করিতেছে দেখা যাউক।

জীবন অতিবাহিত কিরূপে করা উচিত তাহা দেখিতে গেলেই সর্ব্বনাশ! তখন ঈশ্বর কেন পৃথিবী সৃষ্ট করিয়াছেন, কি নিমিত্ত অসংখ্য জীবসম্প্রদায় সৃজন করিয়াছেন, তাঁহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি, প্রভৃতি তর্ক আসিয়া পড়ে, ও আমরা একবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়ি। সে কারণ স্থির করা সহজ নহে, সহজ হইলেও আমাদের ন্যায় ব্যক্তির তাহাতে হস্তক্ষেপ ধৃষ্টতা মাত্র, সুতরাং তাহা ত্যাগ করিয়া, জীব সৃজনই সৃষ্টির উদ্দেশ্য ধরিয়া লইলাম। এবং সেই সৃষ্ট জীবসম্প্রদায় কিরূপে তাহাদের

ক্ষণস্থায়ী অথচ মূল্যবান সময় অতিবাহিত করিতেছে তাহা দেখা যাউক।

আমরা বলিলেই কেমন একটা বাঙ্গালি বাঙ্গালি বুঝায়। যখন বুঝায় তখন তাহাকে ত্যাগ করিবার আবশ্যক নাই। আরও আমরা অর্থাৎ বঙ্গবাসীরা কিরূপে দিন কাটাইতেছে তাহা পর্য্যালোচনা করা যতদূর সুখকর তত বোধ করি অন্য কিছু নহে। ইংরাজ, ফরাসী, ইটালিয়ান, এমেরিকান প্রভৃতিরা কিরূপে সময় অতিবাহিত করে তাহা বোধকরি অনেকেই জানেন, কিন্তু বুঝেন না, আমরা কিরূপে সময় কাটাই তাহা যে আমরা জানি না ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব, কিন্তু জানিয়াও জানি না, সুতরাং আমরা কিরূপে সময় কাটাই তাহা দেখা আবশ্যক।

প্রথমত মনুষ্যের শ্রেণী বিভাগ করা যাউক—অর্দ্ধেক বাদ দাও স্ত্রীলোক। বাকি অর্দ্ধেকের অধিকাংশ শ্রমজীবী, কতক মধ্যবিত্ত অতি অল্প বড় লোক। প্রথম ধর শ্রমজীবী—প্রাতঃকালে উঠিল, কার্য্য আরম্ভ করিল, সন্ধ্যার সময় শেষ হইল, এই অবিশ্রান্ত শ্রমের ফল স্বরূপ যাহা পাইল তাহাতে কায় ক্লেশে জীবন ধারণ মাত্র করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিল। এই রূপেই সন্তান সন্ততিক্রমে বংশবৃদ্ধি হইতে লাগিল, কিন্তু দিন এক রকমেই কাটে, আপনারও যে রূপ কাটিয়াছিল, সন্তানেরাও সেইরূপে কাটাইতে লাগিল। মনুষ্য জীবন ধারণ করিয়া যে মনুষ্যের শুভ বাসনা করে না, সে আবার মনুষ্য কিসের? এ শ্রেণীর সে বাসনা নাই, স্বীয় উন্নতির চেষ্টাও নাই। পাশ্চাত্য শ্রমজীবীগণের অসাধারণ অধ্যবসায় ও উদ্যম দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়, প্রাণ পুলকিত হয়, কি কৃষি কি শিল্প সকল বিষয়েই তাহাদের অসাধারণ নিপুনতা জন্মিয়াছে, সকল বিষয়েই তাহারা আশ্চর্য্য উন্নতি করিয়া অজ্ঞানকে শিক্ষা দিতেছে, স্বদেশ বিদেশের মঙ্গল করিতেছে ও আপনাদের উন্নতি করিয়া সংসারের সুখ বৃদ্ধি করিতেছে। যাহাই হউক আমাদের দেশস্থ অধিকাংশ শ্রমজীবীই পরাধীন নহে, পরপাদুকা স্পর্শের সুখাস্বাদে বিরত। সংক্ষেপে তাহাদের সহস্র দুঃখ সত্ত্বেও এই এক নিরূপম সুখ আছে, এই সুখই—যদিও তাহারা না জানুক—অজ্ঞাতসারে তাহাদের সকল ক্লেশের শান্তি করে।

দ্বিতীয় কথা মধ্যবিত্ত লোক। তাহাদের মধ্যে আবার দুই ভাগ করা আবশ্যক। সহর ও পল্লীস্থ, এই সম্প্রদায় লোকই সহরের বাবু—বাবু-আনার মধ্যে ধোপার খরচই অধিক। ১৫৲ টাকার কেরাণীগিরিই অধিকাংশ লোকের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে, ইহাতেই তাঁহারা মেদিনী ফাটাইয়া দেন। ইহাদের সময় কাটান অতি আশ্চর্য্য। প্রাতঃকালে উঠিয়া নাকে মুখে ভাত গুঁজিয়া আফিসে দৌড়ান, সেখানে ঘাড় হেঁট করিয়া ১০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত কার্য্য করিতে হয়। অধিক কি আলস্য ত্যাগ করিলে দেবাবতার অধ্যক্ষ মহাশয় চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া উঠেন। সাহেব পাদুকাস্পর্শ প্রত্যহই হইয়া থাকে। ইহাই যদ্যপি দুঃখের সীমা হইত তাহা হইলেও ক্ষতি ছিল না, ঘরে আসিলে প্রণয়িণী উগ্রচণ্ডীরূপিনী হইয়া অলঙ্কারের জন্য বাক্‌যুদ্ধ আরম্ভ করেন, সমস্ত রজনীই কলহে অতিবাহিত হয়, সকালে মুখ ভার করিয়া পিণ্ড সিদ্ধ করিয়া দেন, বাবু তাহাই যেন তেন প্রকারেন উদরস্থ করিয়া সাহেবের লাথি খাইতে ছুটা ছুটি আফিসে যান। ইহারা কেরাণী বাবু বলিয়া বিখ্যাত—সে দিন সেনসাস্ (Census) প্রসাদে ইহাদের দুরবস্থার শেষ দেখা গিয়াছে। যাহাই হউক, বঙ্গের বড় ভাগ্য অপ্রসন্নতা, কেননা সে সমস্ত কেরাণী বাবু এত নিগ্রহ সহ্য করিয়াও মুচকি হাসেন। বাহিরে ক্ষুদ্র নবাব। একে সংসার চলে না তাহাতে আবার রাত বেড়ান রোগটীও প্রবল। এই শেষ নহে—জ্বালার উপর যন্ত্রনাও আছে। কাহাকে কোন ব্যবসা করিতে দেখিলে অমনি চক্ষু ঘুরাইয়া বলেন “বাঙ্গালির ছেলে বাপ পিতামহ যা করেছে, তাই করে খা, ব্যবসার রোগ কেন?” কিছু দিবস হইল এক দিন ট্রেনে যাইতে ছিলাম। পথে দেখিলাম কতকগুলি মসিজীবী প্রভুর নিগ্রহ সহনান্তর গৃহে যাইতেছেন। ভাবে বোধ হইল তাঁহারা প্রত্যহ ট্রেনে যাতায়াত করেন, (Daily passenger.) যাহাই হউক তাহারা পরস্পরে গল্প করিতেছেন যে “অমুক বড় বোকা এমন মুরুব্বি থাকিতে কিছু করিল না, একটু চেষ্টা করিলে বড় লোক হইতে পারিত” অপর ব্যক্তি কহিল “সে কি করে?” উত্তর করিল “———” এই লোক গুলি যাহার কথা কহিতেছিল তাঁহার ধারণা যে,

যদ্যপি বিনা দাসত্বে ক্লেশেও দিনপাত হয়, তাহা হইলে সুখ স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত ইংরাজ পাদুকা লেহনের আবশ্যক নাই। আরও আত্মগত উন্নতির নিমিত্ত ব্যস্ত থাকিলে স্বদেশের বা সাধারণের কিছুতেই বিশেষ উপকার করা যায় না। পাঠক! তাঁহার অপরাধ তিনি তাহাদের মত গোলাম নহেন, এই নিমিত্ত তিনি বোকা, আর তাহারা সামান্য গোলামী করিয়া বুদ্ধিমান। এ কথায় গোল্ডস্মিথের—কারাবাসী, শান্ত্রি ও মুটের গল্প মনে পড়ে, ও হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না।

সে কথা যাউক এখন পল্লিগ্রামবাসী ঐ শ্রেণীর লোকদিগের দিন-পাতাবস্থা দেখা যাউক, তাঁহারা আবার "সোপাপিষ্ঠ ততোধিক" প্রাতে উঠিয়া হুঁকা হাতে একবার কাহার বৈটকখানায় বা তদাভাবে চণ্ডিমণ্ডপে উপবেশন, পরে স্নান আহার নিদ্রা। বৈকালে আবার হুঁকা হাতে পাঁচজনে বসিয়া জমীদার গমস্তা ও নানা রকমে নানা লোকের নিন্দা করিয়া কতক রাত্রি কাটাইয়া আহারান্তে শয়ন। যাহাই হউক নিন্দায় ইহাদের মতি কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে সহুরে বাবুদের উপর ইহাদিগকে আসন প্রদান করিব। কেন না তাহাদিগের অপেক্ষা ইহারা সুখী। যদিও তাহাদের ন্যায় ইস্ত্রি করা জামা ও সোজা সিঁতি নাই বটে তথাপি, ৮টা বাজিলে নাকে মুখে ভাত গুঁজিয়া ছুটা ছুটীর যন্ত্রণা ইহারা অবগত নহেন। ইহা-দের ন্যায় তর্ক নবীশ দ্বিতীয় নাই। লেখক যা ভারত। বিদ্যাসুন্দর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুস্তক আর নাই—মাইকেল নবীন কোথায় লাগে। আমি একদিন পল্লীগ্রামের একজন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে "কবিত্ব" বুঝা-ইতে গিয়া মহা বিপদগ্রস্থ হইয়া ছিলাম। তিনি যে সে দিন আমায় মারেন নাই ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য। সেই পর্য্যন্ত শপথ করিয়াছি, যে পল্লীগ্রামবাসী সেকেলে, অৰ্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত হইয়াও যাহারা শিক্ষিত বলিয়া অভিমান করে, তাহাদিগকে আর কখন ভাল কথা বলিব না, তাহারা যাহা বলিবে তাহাই শিরোধার্য্য করিয়া তাহাদের নিকট জ্ঞানী ও শিষ্টাচারী বলিয়া পরিচিত হইব।

শেষ কথা বড় লোক। ইহারা কুঁড়ের বাদ্‌সা। অতুল ঐশ্বর্য্য সুতরাং যাহা করেন তাহাতেই তরিয়া যান। অনেকে সাক্ষর পর্য্যন্ত করিতে

পারে না, অথচ বাহিরে সংবাদ পত্র হাতে ব্যতীত ভ্রমন করেন না। তাহাও হয় ত স্ত্রীর অনুরোধে লইয়া থাকেন। তাকিয়া হেলান দিয়া আলবোলায় তামাক টানিয়াই দিন কাটান। প্রধান কার্য্য নিদ্রা ও আহার। কেহ বা সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া বারবণিতার অনুরোধ রক্ষা করেন, কিন্তু ভাল কার্য্যে ব্যয় নাই। প্রকৃতই বড় লোক হইতেই দেশের মঙ্গল হইয়া থাকে। যাহাদের অন্ন চিন্তা ভয়ঙ্কর তাহারা যদিও দেশের মঙ্গল কল্পে উপেক্ষা করে তাহা ততদূর দূর্ষ্য নহে কিন্তু যাহাদের উপর দেশের হিতসাধন সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করে, তাঁহারা যদ্যপি একেবারে ঔদাস্য প্রকাশ করেন তাহা হইলে আর কি হইবে। তাহা হইলে কোন কালেই ভারতের দুরবস্থা ঘুচিবে না। কোন কোন লম্বোদর ক্রীড়ামোদেই মত্ত, দেশের অবস্থা দেখেন না। "পোহাবার, কচেবারই" ভাল বুঝেন। "আঠার" ফেলিয়া তিন ঘুঁটি বার ঘর চালিতে বড় ব্যস্ত। কিন্তু এদিকে যে ছক্কা বন্ধ থাকায় ঘরের পাকা ঘুঁটি চালিয়া খেলা খারাপ হইবে তাহা ত জানেন না। যাহাই হউক বড় লোকদের দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছি!

তাহার পর একবার আমাদিগের অর্দ্ধাঙ্গিনী যোষিৎবর্গের সময় কাটানর বিষয় ভাবিয়া দেখা যাইবে কি? আমাদের বোধ হয় তাহার আবশ্যক নাই। এখন রমণীকুল কিরূপে যে দিন কাটান তাহা আর কাহারও চক্ষে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বুঝাইবার আবশ্যক নাই। বঙ্গের পুরুষ সম্প্রদায় শিক্ষা পাইয়া ত এইরূপে দিন কাটান, সে অবস্থায় অশিক্ষিতা * রমণীকুল যে অতি শোচনীয় অবস্থায় দিনপাত করিবে তাহাতে সন্দেহ কি? যে পর্য্যন্ত না কর্ত্তৃপক্ষীয়েদের হৃদয় হইতে "রমণীগণকে শিক্ষা প্রদান করা অন্যায়" এই কুসংস্কার অন্তর্হিত হইতেছে তত দিনে রমণীকুল কিরূপে সময়াতীত করে তদ্পর্য্যালোচনা নিরাবশ্যক। তাহার পর এক কথা বলিলে ক্ষতি নাই, শিক্ষা বলিলে দুই এক খানি নাটক নভেল পাঠ বুঝায় না। নাটক নভেল পাঠ করিয়া

* অশিক্ষিতা বলায় শিক্ষিতা রমণীগণ রাগ করিবেন না, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যে অশিক্ষিতা তাহাতে সন্দেহ নাই।

শিক্ষিতা হইয়াছি এই এক কুসংস্কার রমণী হৃদয়ে আধিপত্য করিয়াছে তাহার জ্বালায় আমরা ব্যতিবস্ত। ভালরূপে তাহারা যত দিনে শিক্ষা না পাইতেছে তত দিনে তাহাদের শিক্ষায় সুফল না ফলিয়া বিষময় ফল ফলিবে। ৺ ঈশ্বর গুপ্ত মহাশয় বলিয়াছেন :—

"এরা এ বি পড়ে বিবি সেজে বিলাতি মেম হবেই হবে,
এরা গাউন পরে টাউন হলে বিলাতি বোল কবেই কবে।
আর কি এরা তেমন করে সাঁজ সেঁজুতির ব্রত নেবে,
আর কি এরা তেমন করে পিঁড়ি পেতে অন্ন দেবে।
আর কিছু দিন থাকলে বেঁচে সবাই দেখ্‌তে পাবেই পাবে,
এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগি গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।"

স্বর্গীয় গুপ্ত মহাশয়ের কথা ফলিবার আর দেরি নাই, কিন্তু তাহাতে ফল কি হইবে? আজ কাল রমণীগণের শিক্ষায় এক ফল এই হইয়াছে, বাটীর সংবাদটা পাওয়া যায়, আর ধোপার ও বাজার খরচের জমা খরচ প্রায় রাখিতে হয় না। যাহা হউক ইহাও সৌভাগের কথা বটে। বাঙ্গালির এই দগ্ধ জীবনে সাহেব নিগ্রহের পর আবার ঐ সমস্ত কার্য্য করিতে হইলে নিতান্ত কম ক্লেশ হয় না। সেই ভয়ে অনেকে জমাখরচের পাঠ উঠাইয়া দিয়াছেন।

প্রিয় পাঠক! এইবার বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি যে আমরা কিরূপে সময় কাটাই। সময় কাটান ধরিতে গেলে আমাদের "জীবনের উদ্দেশ্য কি?" এ প্রশ্নটী উত্থিত হয় ও আমরা একেবারে জ্ঞানশূন্য ও স্তব্ধ হইয়া যাই। আহার ও নিদ্রাই যদ্যপি মনুষ্যের জীবনের প্রধান কার্য্য হইল তবে মনুষ্যে ও পশুতে প্রভেদ কি? পশুও নিদ্রা যায়, আহার করে। মনুষ্যও যদ্যপি সেই সমস্ত কার্য্যই করে তবে মনুষ্য ও পশুতে প্রভেদ কি? আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও ইদানিন্তন বাঙ্গালির দিন কাটান দেখিয়া এতদুভয়ের কোন পার্থক্য স্থির করিতে পারিলাম না। যত চিন্তা করি ততই গোলযোগ বাধে। যত প্রভেদ করিতে চেষ্টা করি তত যেন সেই এক কথায় টানিয়া লইয়া যায়—প্রভেদ নাই!!!

প্রিয়তমের প্রতি।

হের নাথ! গগণ মাঝারে নিশাকর,
বিরাজিছে তারা দল সরসীর বুকে;
খেলিছে কৌমুদী-জাল মানস রঞ্জন,
হাসিছে প্রণয়-রসে কুমুদ সুন্দরী,
হাসিছে মধুর-মৃদু জগৎ সংসার।
হাসিয়া আনন্দ মনে প্রফুল্ল-প্রসূনে,
সাজাইছে নিশীথিনী উদ্যান সকল;—
প্রাণনাথ আজ যেন সব প্রেমময়।
আমিও এনেছি নাথ চিত্ত-ফুল-দলে,
প্রাণ-সূত্রে গাঁথি মালা দিতে উপহার;
পূর্ণ কর মনবাঞ্ছা এ সুখ নিশিতে,
তেমতি ভাসিব মোরা প্রেম-সরোবরে।
ধর নাথ! পরগলে এ মোহন-মালা;
আজি হ'তে আমি নাথ সপিনু তোমায়,
জীবন, যৌবন, কুল, অকপট-চিত্তে।
এ অধিনী রবে তব মঙ্গল সাধনে।
প্রথম সাক্ষাত যবে প্রেম-সম্মিলন,
তব তীব্র-প্রেম-দৃষ্টি, সেহ'তে হৃদয়ে,
হয়েছে যে ভাবাঙ্কুর না হবে বিনাশ
জীবন থাকিতে মম দেহের ভিতর।
দেখ নাথ চিত্ত পটে রয়েছে অঙ্কিত;
তব প্রেমময়-মূর্ত্তি; বিধির সৃজন,
স্মৃতিবর্ণে—সুচিত্রিত বিমোহিছে প্রাণ,
কেমনে ভুলিব তাহা হইয়া পাষাণী?

শুধু নয় চিত্ত পটে ; অন্তরে বাহিরে,
লোকালয়, জলস্থল, কুঞ্জ-পুষ্পদলে,
সুরম্য-পর্য্যঙ্ক, চারু কোমল-শয়নে,
গৃহ কার্য্য, স্নান, ধ্যান, নিশার স্বপনে,
তব প্রতিবিম্ব-প্রভা খেলিছে নিয়ত।
বিস্মৃত-জলধী জলে ডুবাব কেমনে,
প্রেমের প্রতিমা খানি হইয়া পাষাণী ?
(ভুলি নাই ভুলিবনা চির অঙ্গিকার।)
যদ্যপি আমারে যাও করি পরিত্যাগ,
এ নয়ন অন্যরূপ দেখিবে না আর ;
হৃদয় দিবেনা স্থান অন্য প্রতিমায়,
যে আশা-বিটপী-পদে করেছি আশ্রয়,
এ লতিকা অন্য মুখে যাবেনা কখন।
যখন কাঁদিবে মোর অবোধ পরাণ,
স্মরিব ও মুখ-শশি বিরলে বসিয়া।
খুলিব হৃদয়-দ্বার—মানস-আসনে
নয়ন ভরিয়া রূপ হেরিব তখন।
দাসির এ চিত্ত হ'তে হবেনা অন্তর,
ভুলি নাই ভুলিব না চির অঙ্গিকার।
পুরাও মনের বাঞ্ছা এ সুখ নিশিতে,
"ধর নাথ ! পর গলে এ মোহন মালা।"

শ্রীমতী বিনোদিনী দেবী।

বিজয় সিংহ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

সাহস।

বিজয়সিংহ ও উদয়সিংহ রক্ষীর অনুগমন করিলে, রক্ষী তাঁহাদিগকে নগর হইতে সাত ক্রোশ পূর্ব্বে লইয়া গেল, তথায় এক নিবিড় জঙ্গল ছিল, তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। ক্রমে একটি কুটিরের সম্মুখীন হইয়া তাহার দ্বারে ধীরে ধীরে তিনবার আঘাত করিলে এক ব্যক্তি তন্মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলেন, এবং তাঁহার অনুসরণ করিতে কহিলেন।

বিজয়সিংহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমাদিগকে কোথায় লইয়া যাইতে চাহেন?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "কুক্কুর দংশনে প্রাণত্যাগ অপেক্ষা গুরুতর অমঙ্গল ঘটিবার যদি সম্ভাবনা না থাকে তবে আমি যেখানে যাইতেছি সেখানে যাইতে বাধা কি?"

বিজয়সিংহেরও অধর প্রান্তে অল্প হাসি দেখা দিল, তিনি আর কোন কথা না কহিয়া চলিলেন। ক্রমে তাঁহারা আরও ভয়ানক বনমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। বনের কতকদূর যাইয়া দেখিলেন অনেকগুলি শিবির দেখা যাইতেছে। বিজয়সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন "ঐ শিবির কাহাদের?"

"মহারাষ্ট্রীয়দের।"

"ইহাদের অধিপতি কে?"

"শিবজি।"

"শিবজি কি এইস্থানে আছেন?"

"আছেন।"

"সাক্ষাৎ হইবে কি?"

"হইতে পারে।"

"তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমার বড় ইচ্ছা।"

"তবে সাক্ষাৎ করুন,—আমিই শিবজি।"

বিজয়সিংহ ও উদয়সিংহ তাহাকে অভিবাদন করিলেন এবং তিনিও প্রত্যাভিবাদন করিলেন।

বিজয়সিংহ বলিলেন "আমরা কে তাহা বোধহয় আপনি জানেন না।"

শিবজি ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "সমস্তই জানি, আমার কন্যাদ্বারা বাদসাহপুত্রী অমিলার বিশেষ সাহায্যে ও যত্নে আপনারা রক্ষা পাইয়াছেন। আমি যদি একদণ্ড পূর্ব্বে সংবাদ পাইতাম তাহা হইলে বৃদ্ধ রাজা প্রতাপ সিংহের অকাল মৃত্যু বোধহয় হইত না। প্রতাপসিংহ আর একবার বিপদ্‌গ্রস্থ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছিলেন, সে বারেও আমার কন্যা তাঁহাকে রক্ষা করেন, সে কথা পরে বলিব। সে যাহা হউক তোমাদিগকে লইয়া যাইবার অতি অল্প সময় পরেই আমার কন্যা কর্ত্তৃক সে সংবাদ পাই, এবং তখনি তাহাকে ছলে কৌশলে বাদসাহ ভবনে পরিচারিকা রূপে নিযুক্ত করাইয়া দি। আরও কৌশল দ্বারা অনেক যবন বেশধারী মহারাষ্ট্রীয় সেনাকে কারাগার রক্ষকরূপে নিযুক্ত করাই, তাহাদেরই অসাধারণ অধ্যবসায় গুণে তোমরা এ যাত্রা শীতল শোণিতে প্রাণত্যাগ করিলে না।"

বিজয়সিংহ বলিলেন "আপনি আমাদের যে পিতার তুল্য কার্য্য করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এ জীবনে যে আপনার অসীম উপকারের যথাবিহিত প্রত্যুপকার করিতে পারিব, সে আশা নাই।"

শিবজি। প্রত্যুপকার প্রত্যাশায় কি আমি তোমাদের উপকার করিয়াছি?

বিজয়। আমি সে কথা বলি নাই, আপনার দেবতুল্য হৃদয় দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছি।

শিবজি। সে কথা কিছু মনে করিও না।

বিজয়। আমাদের অপরাপর পরিবারেরা কিরূপ অবস্থায় আছেন বলিতে পারেন কি?

শিবজি। তাহারাও আমার তত্ত্বাবধানে আছেন, কাহারও কোন অনিষ্ট হয় নাই।

বিজয়। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। আমাদের জীবন দানের অবশ্য কোন গুহ্য বৃত্তান্ত আছে, যদি বলিতে বাধা না থাকে তবে কি শুনিতে পাই না?

শিবজি। প্রধান উদ্দেশ্য ভারতমাতার অঙ্ক বীর শূন্য হইতে না দেওয়া।

বিজয়। আপনার কন্যার সাহস ধৈর্য্যতা ও চতুরতা সর্ব্বাংশে প্রসংশনীয়, তিনি আমাদের অশেষ উপকার করিয়াছেন; বলিতে কি যেদিন ভারতের সমস্ত অঙ্গনার সরমা আদর্শ হইবে, সেই দিন ভারতমাতার হাসিমাখা বদনদ্যুতি দেখিতে পাইব। সরমা আমাদের যে উপকার করিয়াছেন, এ জীবনে যে তাহার প্রতিশোধ দিতে পারিব তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারি না।

শিবজি। সর্ব্বাংশে পারিবে, যদ্যপি দুইজন মাত্রও যবন বধ করিতে পার তাহা হইলেই সরমার যত্নের দ্বিগুণ প্রতিদান দেওয়া হইবে।

বিজয়সিংহ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন "সেটা কেবল প্রতিহিংসামাত্র, আমাদের দ্বারা যে ভারতের কোন বিশেষ মঙ্গল সম্পাদিত হইবে সে আশা নাই।

শিবজি। সত্য, কিন্তু আমরা কাপুরুষ হইব কেন? "যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।" যাহাই হউক এখন পরিশ্রান্ত হইয়াছ, চল শিবিরে বিশ্রাম করিবে।

বিজয়। সরমা কি আসিয়াছেন?

শিবজি। দুই এক দিনের মধ্যেই সাক্ষাৎ হইবে।

বিজয়। সরমাকে দেখিলে আমরা বড়ই আহ্লাদিত হইব।

শিবজি শিবিরাভিমুখে চলিলেন, বিজয় ও উদয়সিংহ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

——oo*oo——

গুপ্ত কল্পনা।

একটী নব শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ড উপরে বিজয় সিংহ উদয় সিংহ ও শিবজি উপবিষ্ট, তাঁহাদের নিকটে সরমা অবনত মস্তকে দণ্ডায়মানা, সকলেই চিন্তা মগ্ন। দেখিলেই বোধ হয় যেন প্রত্যেকেই কোন বিশেষ চিন্তা করিতেছে। কাহার মুখে কথা নাই। ইহারা যে স্থানে বসিয়া ছিলেন সে স্থানটী বড় মনোরম ও পরিপাটি। চতুর্দ্দিকে নিবিড় কানন শ্রেণী, বৃক্ষে বৃক্ষে শাখায় শাখায় নবকিশলয়দাম পরিশোভিতা, লতিকা মহিরুহ বিজড়িয়া রহিয়াছে। কেহ বা শাখা ধরিয়া ঝুলিতেছে। বিবিধ পুষ্প তাহাতে সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। তাহাদের বিমোহিনী পরিমল বায়ুভরে কানন মণ্ডল বিকীর্ণ করিতেছে। সেই সৌরভে বিভোর হইয়া নানাবিধ পক্ষিগণ মনের আনন্দে গান করিতেছে। কিন্তু এই শোভা সেই সমস্ত চিন্তা নির্ম্মগ্ন ব্যক্তিগণের মানস আকৃষ্ট করে নাই। তাঁহারা আপন চিন্তাতেই মগ্ন। স্বভাবের শোভা দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে তাঁহাদের সময় ছিল না, বা রুচি হইতেছিল না।

যে দিন স্বকার্য্য সাধনে আর্য্যসন্তানগণ এতদূর যত্নপর হইবে, যে প্রকৃতির রমণীয় বেশ তাহাদের ঘৃণা উদ্দীপনা করিয়া দিবে। সে শোভা চক্ষে দেখিবে না, আপন কার্য্যেই রত রহিবে। সেই দিন ভারতের প্রকৃত দিন আসিবে। সেই দিন হইতে ভারতবাসী মনুষ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। কিন্তু সে দিন কোথায়? সে দিন শিবজির ছিল বিজয় সিংহের ছিল, কিন্তু তাহার পর হইতে নির্জ্জীব ভারতে আর সে দিন নাই। এখন সেই প্রাতঃস্মরণীয় আর্য্যগণের সন্তানেরা হীনবল ও ক্ষীনমনস্বিতা-সম্পন্ন হইয়া বালকের ন্যায় ক্রীড়ামোদী হইয়াছে। নতুবা ভারত! তোমার দশা কেন এরূপ হইবে? বিংশতি কোটি সন্তানের প্রসবিনী হইয়া কেন অত্যাচারী যবন পদ দলিত হইবে?

অনেকক্ষণ সেই নিস্তব্ধতার পরে শিবজি কহিলেন "আরঙ্গজেব যদ্যপি আর পঞ্চবিংশতি সহস্র সেনা লইয়া জাফরের সহিত মিলিত হয় তাহা হইলে যবন সেনাকে বিমুখ করা বড় সঙ্কট হইবে।"

বিজয় সিংহ কহিলেন "এখন কি উপায় স্থির করিয়াছেন?"

শিবজি। শত্রু সংহারে কি মহারাষ্ট্রীয়েরা বিমুখ হইবে?

বিজয়। সত্য, কিন্তু আমরা এই অল্প সংখ্যক সেনা লইয়া কি করিয়া পঞ্চদশ সহস্র সেনার প্রতিদ্বন্দ্বী হইব?

সরমা বিজয় সিংহের প্রতি একটী তীব্র দৃষ্টি প্রয়োগ করিয়া কহিল "তবে কি অমোদের সকল যত্ন ব্যর্থ হইবে?"

বিজয়। আপনার উপকারের প্রতিদান দিতে আমি একক পঞ্চদশ সহস্র যবন সেনার সহিত সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু তাহাতে মহারাষ্ট্রীয়ের কি উপকার হইবে? রাজপুতগণের কি উপকার হইবে?

সরমা। আপনার ও মহারাজ উদয় সিংহের সৈন্যগণকে এখানে আসিতে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহারা মিলিত হইলে কি আমরা কৃত-কার্য্য হইতে পারিব না?

উদয় সিংহ। তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা জয়ী হইব।

সমরা। উত্তম, কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহারা না আইসে সে পর্য্যন্ত কি আমরা নিশ্চেষ্ট রহিব।

উদয় সিংহ। কখনই না। আরঙ্গজেবের সসৈন্যে জাফরের সহিত মিলিত হইতে এখনও বিলম্ব আছে, ইতি মধ্যে যবন সেনাদিগকে হীনবল করা কর্ত্তব্য।

সরমার চক্ষু যেন জ্বলিয়া উঠিল কহিল "আপনি যথার্থ রাজপুত নামের উপযুক্ত বটে, আমার বিবেচনায় অদ্য রাত্রেই যবন শিবির আক্রমন করা বিধেয়। আমি শুনিয়াছি যে যবনেরা রজনীতে সুরাপানাশক্ত হইয়া মত্ত থাকে, সে সময়ে তাহাদিগকে সহসা আক্রমন করিলে তাহারা নিশ্চয়ই পরাজিত হইবে। আরও শ্রুত হইলাম যে কমলাদেবী জাফরের সহিত আসিয়াছেন। এই উদ্যমে কমলা দেবীকেও উদ্ধার করা যাইতে পারে।"

বিজয় সিংহ সোৎসুক ভাবে কহিলেন "যদি কমলা দেবী জাফরের সঙ্গে থাকেন তবে তাঁহার উদ্ধারের এই উপযুক্ত সময় বটে।

সরমা কহিল "একটু প্রতিহিংসা হৃদয়ে থাকা চাই, কেবল কমলা দেবীকে উদ্ধার করা এ যুদ্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে।"

বিজয় সিংহ। সরমে! তুমি বালিকা সেই নিমিত্ত ভাবিতেছ যে হিন্দুরা পুনর্ব্বার ভারতে সম্রাজ্য স্থাপনে কৃতকার্য্য হইবে। আর কি ভারতের সে দশা আছে? তুমি কি দেখিতেছ না যে প্রায় সকল ক্ষত্রিয় রাজপুত্রেরা যবনের প্রীতিভাজন হইবার লালসায় তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া স্বজাতীয়ের শোণিতে পদধৌত করিতেছে? বলিতে কি অন্ধতার যে তমোময় গর্ভে আর্য্যসন্তানগণ নিপতিত হইয়াছে তাহা হইতে আর উত্থিত হইতে পারিবে না।

সরমা। তবে যুদ্ধ সাধ কেন?

বিজয়। ভিত্তিহীন আশা।

সমরা। ছি! ছি! তবে বৃথা যবন শোণিতে হস্ত কলঙ্কিত করিবেন কেন?

বিজয়। সরমে! তুমি অন্যায় বুঝিতেছ, আমরা ত সে দলভুক্ত নহি।

সরমা। মহারাজ! আপনাদের ন্যায় বীরকেশরী যদ্যপি শিবাশিশু বধে ভীত হয় তবে ভারতের কলঙ্ক কে প্রক্ষালিত করিবে? কে আর মাতা বসুন্ধরার নয়ন বারি মুছাইয়া দিবে। কে আর ভারত সন্তানদিগের মস্তক হইতে অধীনতার লৌহ পাদুকা বিচ্যুত করিবে?

বিজয়। যিনি ত্রিলোক পালক তিনিই সে কথা বলিতে পারেন; কিন্তু দেখিয়া বোধ হয় যে ভারতবাসীরা সাধ করিয়া অধীন হইতে চাহে; নতুবা অধিক কি যদ্যপি প্রত্যেক ভারতবাসী যবনদিগের প্রতি এক একটী মাত্র লোষ্ট্র নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে যবনদিগকে ভারতের আশা ত্যাগ করিতে হয়;

শিবজি অনেকক্ষণ কোন কথাই বলেন নাই, পরে বিজয়সিংহের দিকে ফিরিয়া কহিলেন "ভারতের পুনরুত্থান আশা এখনও আমাদের হৃদয়ে তাড়িত বেগে প্রধাবিত হইতেছে। কি! ভারত যবন পাদুকা বহন

করিবে? মহারাষ্ট্রীয়েরা জীবিত থাকিতে? ক্ষত্রিয় কুমারেরা জীবিত থাকিতে? অহো! বিড়ম্বনা! হায়! মা ভারত! তোমার ললাটে কে লৌহ লেখনীতে একথা লিখিয়াছিল, পুত্র হইয়া আমরা মার এ দশা দেখিব! হে ত্রিলোক পালক মহাদেব, হয় তোমার ত্রিশুলাঘাতে ভারত প্রাণহীন করিয়া ফেল। ভারত সাগরতলে আশ্রয় গ্রহণ করুক, নতুবা দেব! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও, আমরা আমাদের প্রিয়, প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়, ভারত মাতাকে যবন কবলচ্যুত করি। ভারত যে যবন পদদলিত হইবে, একথা সহ্য করিতে পারিব না। শিবজি থাকিতে শিবজির হৃদয়ে এক বিন্দু শোণিত থাকিতে এ কথা সহ্য করিতে পারিব না। দিল্লীর সিংহাসন ভারতবাসী কর্ত্তৃক অধিকৃত না হইয়া, বিধর্ম্মী বিদেশবাসী অস্পৃশ্য শৃগাল কর্ত্তৃক অধিকৃত হইবে! আর শিবজি জীবিত থাকিতে এই অগণিত ক্ষত্রিয়কুমার জীবিত থাকিতে তাহা অম্লান বদনে দেখিবে? ধিক্ জীবনে! সাগর তটস্থিত অগণ্য বালুকাবৎ যবন সৈন্যদল মধ্যে অকুতো দম্ভে অকুতো সাহসে প্রবেশ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিব, তথাপি জীবন থাকিতে দিল্লীর সিংহাসনে শৃগালের অধিপত্য দেখিতে পারিব না। কি! যবনেরা আমাদের বুকে বসিয়া আমাদের শোণিত পান করিবে আমরা সহ্য করিব। আমরা জীবিত থাকিতে বিদেশবাসী যবন আসিয়া ভারতে সম্রাজ্য স্থাপনা করিবে আমরা অম্লান বদনে সহ্য করিব, বীর প্রসবিনী মহারাষ্ট্রীয় রমণী কি এই অপমান সহ্য করিব বলিয়াই আমাদিগকে জঠরে ধারণ করিয়াছিলেন? অহো বিড়ম্বনা! অহো পরিতাপ!!

বিজয় ও উদয় সিংহ যেন নববলে বলিয়ান্ হইলেন। বলিলেন "ভারত নিশ্চয়ই স্বাধীন হইবে, দেবাদিদেব মহাদেব আমাদের সহায়তা করিবেন, বল—হর হর মহাদেব।"

সকলের বদনে সেই "হর হর মহাদেব" ধ্বনি উচ্চারিত হইল। সেই ধ্বনি অরণ্য পরিব্যাপ্ত করিয়া যেন আকাশে প্রতিধ্বনিত হইল। শিবজির বদন উৎফুল্ল হইল।

প্রাসাদ ও পরিবার।

ঈশ্বর সৃষ্ট জীবগণের মধ্যে মানবগণ বুদ্ধিবৃত্তি হিতাহিত জ্ঞান ও মনোভাব প্রকাশক ভাষা প্রাপ্ত হইয়া অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে, এবং সেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন মানসে নিজ ধীশক্তি পরিচালিত অশেষ-সুকৌশল-সম্পন্ন-কার্য্য-পরম্পরার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন পুরঃসর স্বজাতীর মধ্যে মাননীয় ও বিখ্যাত হইবার জন্য অহর্নিশ চিন্তা তৎপর রহিয়াছে। সুচিন্তা-প্রসূত সৎকার্য্য সমূহ সর্ব্বদাই ভূমণ্ডলের কোন না কোন দেশে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সঙ্গত সুচিন্তাই মানবের উন্নতির দৃঢ়মূল ভিত্তি ও নানা রাগ রঞ্জিত সুদুর্ল্লভ যশের কেতন স্বরূপ। কোন কোন প্রদেশস্থ কৃত্রিম স্তম্ভ নিখাতাদি সময়ে সময়ে ঐশীশক্তির অবমান সূচক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কোন কোন বিদ্যালোক সম্পন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তির অসাধারণ ক্রিয়াকলাপ সন্দর্শন করিলে সর্ব্বনিয়ন্তার "একমেবাদ্বিতীয়ম্" নামের ব্যত্যয় বলিয়া উপলব্ধি হয়। ভ্রান্ত মানবের এরূপ বিশ্বাস বা অনুমান যে অসঙ্গত তদ্বিষয়ে কেহই দ্বিধাচিত্ত হইতে পারেন না। ইহা নিঃসন্দেহ যে অতুলনীয় ঐশীসক্তির নিকট মানবের চিন্ত-লব্ধ ফল অতীব অকিঞ্চিৎকর; যাহা হউক এই উভয়বিধ কার্য্যের যে কোন নিগূঢ় অভিসন্ধি ও মূল কারণ আছে তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। যে হেতু কার্য্য কারণ ও ফলের নিকট সম্বন্ধ অপ্রতিহত ভাবে সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। যেখানে মরিচীমালীর কিরণ জাল প্রবেশ পথ পাইতে পারে না, যথায় পবন স্বীয় একাধিপত্যের কণামাত্র শক্তিও প্রচার করিতে অসক্ষম, বুদ্ধিমানগণের ধীশক্তি তথায় প্রবল প্রতাপে অনিবার্যবেগে আধিপত্য করিতে পারে বটে, কিন্তু প্রায়ই মঙ্গলময়ের মঙ্গলময় অনেক কার্য্যের কারণানুসন্ধানে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও তাহার কিছুমাত্র [illegible] পারেন না, কিন্তু মানবকৃত কার্য্য পরম্পরার মূল উদ্দেশ্য অবগত হইবার জন্য অধিক আয়াস বা যত্নের আবশ্যকতা দৃষ্টিগোচর

হয় না। পুষ্করিণী খনন সুপ্রশস্ত বৃক্ষরাজী বিরাজিত রথ্যা নির্ম্মাণ মনোজবগামী বাষ্পীয় রথ সুদুস্তর অর্ণব তরণোপযোগী বাষ্পীয় পোত মহোচ্চ পর্ব্বত সমূহের গঞ্জনা দায়িকা মনোরম প্রাসাদ সমূহ প্রভৃতি যে সমস্ত কার্য্যই মানবের বুদ্ধি কৌশলের পরিচয় প্রদান করুক না কেন তাহার যে কোন মূল উদ্দেশ্য অবশ্যই আছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অনেক ব্যক্তি অনেক দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া নানাবিধ কার্য্যসম্পন্ন করে বটে, কিন্তু তৎ তৎ কার্য্যের গূঢ় অভিপ্রায় সকলের বোধগম্য নহে তজ্জন্য প্রাসাদ-সহ পরিবারের যে বিশেষ সম্বন্ধ অনুভূত হইতেছে তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

সমাজমধ্যে ধনশালী ব্যক্তিগণ আপনাদিগের সুখসচ্ছন্দতা ও নিরাপন্ন অবস্থা দৃঢ়ীকরণ মানসে আবাস বাটীর স্থায়িত্ব ও মনোহারিতা সম্পাদনে সর্ব্বদা নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া যাহা নিজের ও সাধারণের সুরুচিকর বলিয়া বিবেচিত হয় সেইরূপ গৃহাদি প্রস্তুত করাইয়া থাকেন। গৃহ সকল নানা প্রকোষ্ঠে পরস্পর গ্রথিত থাকিয়া কার্য্য সৌকার্য্যের ও গমনাগমনের সুশৃঙ্খলা সম্পাদন করিয়া দেয়।

পরিবারস্থ জন সমূহের সমষ্টি অট্টালিকার নির্ম্মাণ রুচির অনুকৃতি। ইহার এক একটী প্রকোষ্ঠ এক একটী স্ত্রী বা পুরুষ, যে গৃহগুলি সজ্জিত তাহারা স্ত্রী অবিধেয়। এই সকল গৃহ যেমন লোকমাত্রেরই স্পৃহনীয় সংসারের অবলাগণও সেইরূপ মানব মণ্ডলীর একমাত্র আরাধ্য দেবীরূপিনী অলং অলঙ্কার ব্যতিরেকে তাহাদের হৃদয় কিছুতেই উদ্বেল বিহীন হয় না। যে গৃহগুলি অলঙ্কৃত অথচ বহুবিধ সতত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীতে পরিপূর্ণ তাহারা পুরুষ পদবাচ্য হইতে পারে। পুরুষগণ যেরূপ সংসারের গুরুভার বহনে সর্ব্বক্ষণ ক্লান্ত থাকে এই গৃহগুলিও সেই রূপ গুরুভার দ্রব্য সামগ্রীতে পরিপূর্ণ। কতকগুলি গৃহ উক্ত দ্রব্য পূর্ণ অথচ নয়ন মনস্তৃপ্তিকর দ্রব্য সমাচ্ছন্ন, এই গুলিই সংসারের ভীষণ চিন্তাকারে বাবু ব্যক্তি।

সৌধের সমীপবর্ত্তি কতকগুলি পর্ণকুটীর, প্রাসাদ নির্ম্মাণোপযোগী চূর্ণাদি উপাদান সমূহে পরিপূর্ণ থাকে। কোন গৃহে মৃদভাণ্ড, কোন কুটীরে লৌহযন্ত্র, কোনটীতে বা কাষ্ঠাদি বর্ত্তমান থাকে: ইহাদিগকে সংসারের দাসদাসীগণ মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে। চূর্ণ কাষ্ঠাদি পরিপূরিত

গৃহ ব্যতিরেকে যেমন অট্টালিকার সৌধনাম অন্বর্থ হইতে পারে না, সেরূপ দাসদাসী বিহনে সম্ভ্রান্ত পরিবারবর্গের একদণ্ডও চলিবার উপায় নাই। কোন কবি—

"ভৃত্যাভাবে ভবতি মরণং কিন্তু সম্ভাবিতানাং"

এই যে বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা অযথার্থ নহে। দীন দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন লোকদিগের পরিচারক হীন হইয়া থাকা অধিক কষ্টের বিষয় হইতে পারে না। একখানি কুটীর প্রস্তুতের আয়োজনই বা কি? স্বল্প মূল্যবান তৃণ কাষ্ঠাদি যাহার শ্রেষ্ঠতম উপাদান তাহার আবার সঞ্চয়কারী অন্য গৃহের আবশ্যক কি? প্রাঙ্গন বা অনাবৃত স্থানই তাহাদের অবস্থিতি স্থান; এই সকল ক্ষুদ্র গৃহই যেন প্রাসাদের প্রসাদ পাইবার জন্য অবস্থিত হইয়া নিম্নতম মানবমণ্ডলীকে উপদেশ দিতেছেন, যে তোমরাও আমাদের ন্যায় প্রাণপনে স্ব স্ব ক্ষমতানুযায়ী প্রভু সেবায় অবহিত থাক, কদাচ আলস্য পরতন্ত্র হইয়া বা অপথে পদার্পণ পূর্ব্বক ধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিও না।

কতকগুলি গৃহের বাহ্যিক সুরপুরী গঞ্জক সৌন্দর্য্যরাশি দশদিক উজ্জ্বল করিয়া সকলের নয়ন মন অহরহ হরণ করিতেই যেন নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু সেই সকল গৃহের অভ্যান্তর ভাগ নরকের ভীষণতম প্রদেশের ন্যায় অতিশয় কুৎসিত ও বিভৎস দ্রব্যে পরিপূর্ণ, এই সকল গৃহই সংসারের কপটাচারী দুরাত্মা ব্যক্তিগণ, কবিরা ইহাদিগকে বিষকুম্ভ পয়মুখ বর্ণন করেন। যখন ইহাদের বদন বিনিস্মৃত বচন সুধা সাধারণের শ্রবণ বিবর পূর্ণ করে, যখন ইহাদের বাহ্যিক হাবভাব ভঙ্গে প্রত্যেক মানবের মনকে সতেজে আকর্ষণ করে, যখন ভ্রান্তগণ ইহাদের মায়ায় বিমোহিত হয় তখন আর তাহাদের উদ্ধারের বিন্দুমাত্র উপায় থাকে না। উল্লিখিত জনগণ তাহাদের নিকট অমরবাদী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাহারা বাহ্যিক কৃত্রিম দয়া দাক্ষিণ্যাদি বিবিধ সদ্গুণে সকলকে বশীভূত ও হিতাহিত বিবেক শূন্য করিয়া জাল বদ্ধা বিহঙ্গিনীর উপর ব্যাধে আধিপত্যের ন্যায় স্বীয় বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক অনায়াসে স্বকার্য্য সাধন করিয়া লয়, ইহাদিগের হৃদয় কন্দরে কখনও ধর্ম্ম সূর্য্য স্বীয় প্রখর প্রভা প্রকাশ করিতে পারে

না, পৃথিবীর যাবতীয় কুৎসিত মনোবৃত্তি তথায় সচ্ছন্দভাবে সঞ্চরণ করিতেছে। ইহারাই নরকের কীট পদবাচ্য এবং ইহাদের মনোবৃত্তি গৃহান্তরস্থ বিভৎস দ্রব্যরাশী ভিন্ন আর কিছুই নহে।

কোন কোন গৃহের সজ্জীকরণ প্রণালী ইহার ঠিক বিপরীত ভাবাপন্ন। অভ্যন্তরের মনোহর কান্তি, সজ্জনের কায়মনের পরিচয় প্রদান করে। গৃহের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট না হইলে ইহার যে মনোহারিতা আছে, তাহা উপলব্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই, অথবা অনেক বহিঃস্থ ঘৃণিত রূপ দেখিয়া ব্যাহত হইয়া থাকে। যাহার অন্তঃভাব অশেষ সদ্‌গুণে বিভূষিত অথচ লোকের নিকট সেই সমস্ত গুণ প্রকাশে অক্ষম তাহারা অবশ্যই লোকের নিন্দনীয় হইতে পারে না। কারণ যদিও অবস্থা প্রতিকুল বশতঃ সেই সকল মানব আপনাদিগের সদ্বৃত্তি সমুহের ফলোপধায়িতা দেখাইতে একান্ত অক্ষম, যদিও কার্য্য দ্বারা সাধারণের দুঃখ মোচন তাহাদিগের পক্ষে সম্ভব নহে, তথাপি ঐ সকল ব্যক্তির চিত্ত যে অনবরত পরদুঃখে পীড়িত অপরের উন্নতি চেষ্টার অনুকুল তাহাতে সংশয় হইতে পারে না।

এক একটী প্রকোষ্ঠ পরিদর্শন করিলে অন্তঃকরণ বচনাতীত আনন্দরসে নিমর্জ্জিত হয়। ইহার বাহিরের সৌন্দর্য্য অতীব স্নিগ্ধকর, এই ভাব সুরুচির পরিচায়ক বিবিধ কারু কার্য্যে ঘটিত অত্যুজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ উদ্ভাসিত এবং সূক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন মানবগণ কর্ত্তৃক অশেষ প্রকার শিল্পকার্য্যময় কাষ্ঠাদির দ্বারা আচ্ছাদিত থাকাতে সমধিক মনোরম হইয়াছে। অভ্যন্তর ভাগ এই সমস্ত শোভা হইতে বঞ্চিত হয় নাই, প্রত্যুত তথায় নানাবিধ প্রয়োজনীয় গৃহসেব্য দ্রব্যাদি যথাস্থানে সুসজ্জিভূত থাকাতে অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যছটা প্রকাশ করিয়াছে, এই সকল গৃহই পরিবার মধ্যস্থ দেবোপম মানবগণ; আহা! তাঁহাদিগের দর্শন কি পবিত্রতাময়, তাঁহাদিগের ক্রিয়া কলাপ কি মহোপকারী অভিপ্রায় সংযুত, স্বার্থপর হিতৈষিতা তাঁহাদিগের নিকট হইতে সসম্ভ্রমে বহুদূরে অবস্থিত হইয়াও যেন ভয়াকুল ব্যক্তির ন্যায় কম্পান্বিত কলেবর হইতেছে; দ্বেশ হিংসাদি ষড়্‌রিপু তাঁহাদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে কোথায় যে অন্তর্হিত হইয়াছে তাহা অবগত হইবার উপায়মাত্র নাই। পরনিস্ট চিন্তা পরধন হরণেচ্ছা প্রভৃতি অশেষ প্রবৃত্তি সমূহ উক্ত

মহাত্মাদিগের হৃদয়ের কণামাত্র স্থানও অধিকার করিতে সাহসী হইতেছে না, অন্তরস্থিত প্রদেশে দয়া দাক্ষিণ্যাদি বীজসমূহ প্রথিত ও বিস্তীর্ণ-শাখা-পল্লবাদি-বিভূষিত এবং সুমধুর অমৃতোপম ফল ভারে অবনত হইয়া আহা মরি! কি অনুপমীয় শোভাই বিকাশ করিতেছে। স্বর্গে দেবতা-দিগের সর্ব্ব দুঃখ বিনাশক—আনন্দবর্দ্ধক যে নন্দনকানন আছে, যাহার গুণ গরিমা কবিগণ প্রতিক্ষণ বর্ণন করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না, ইহার নিকট তাহা অতিশয় হেয় পদার্থ রূপ প্রতীয়মান হয়। এই সমস্ত গৃহ বহুসংখ্যক মানবের বাঞ্ছনীয়, অনেকে বিরাম লাভাশয়ে এই স্থানে আগমন করিয়া থাকেন, সাধু সচ্চরিত্র দয়াশীল ব্যক্তি কাহার আদরণীয় নহেন? কোন্ নিষ্ঠুরস্বভাব তাঁহার গুণগরিমায় আকৃষ্টচিত্ত না হয়? সম্মুখস্থিত গরল ও সুধার স্পষ্ট প্রকাশমান অবয়ব ও গুণাগুণ অবগত হইয়া কে অমৃতের পক্ষপাতী হইতে বিমুখ হয়? যিনি পরদুঃখে নিয়ত চক্ষের জল বিসর্জ্জন করিয়া সাধারণের আন্তরিক কষ্টের লাঘবতা সম্পাদনে সতত সচেষ্ট থাকেন, তাঁহার সহিত সমদুঃখতা প্রকাশে কে বিরত থাকিতে পারে? গৃহের অন্তরস্থ প্রাচীরসংলগ্ন নানাবিধ মনোরম প্রতিমূর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছে। কোনটী স্নিগ্ধধীর স্বভাব সম্পন্ন; কোনটী গম্ভীরভাবে অবস্থিত হইয়া সকলকে যেন ধর্ম্ম ও পরোপকারিতা বিষয়ে উপদেশ দিতেছে। কোনটীই বা যেন নিজ অসামান্য বিদ্যাবুদ্ধি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উচ্চতম আসনে আসীন হইয়া গৃহাগত মানবমণ্ডলীকে বলিতেছে "তোমরাও আমার এই স্বভাবের অনুকরণ করিয়া নশ্বর মর্ত্তধামে অবি-নশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে সতত যত্নবান হও। এই সমস্ত প্রতিমূর্ত্তিই উক্ত দেবোপমের মানসিক সদ্গুণ রাশি। ইহা মানবমাত্রেরই উচ্চতম আদর্শ, সাধারণের একমাত্র উপাস্য, ও দেশোন্নতির সৎলক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। এই সকল মহান পুরুষ যে সকলের আশ্রয়স্থান নিম্নলিখিত কবিতার্দ্ধই তাহার বিশেষ প্রমাণস্থল হইতেছে।

ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা।
ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা॥

কোন কোন গৃহ ইহার ঠিক বিপরীত। তাহার অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ

অত্যন্ত অপ্রীতিকর। দৃষ্টিপথে পতিত হইলেই অন্তঃকরণে স্বাভাবিকী ঘৃণার উদয় হইয়া থাকে। সংসারের যে সকল মানবের বাহ্যিক সৌন্দর্য্য বিন্দুমাত্র পরিলক্ষিত হয় না এবার মানসিক প্রবৃত্তি নীচতার উচ্চতম সোপানে আরূঢ়, যাহারা সদ্‌গুণ সমূহের মর্ম্ম কিছুমাত্র অবগত নহে, যাহাদের দ্বারা মরণ ধর্ম্মশীল মানব অহরহ অশেষ বিপদে দুঃখে অভিভূত হইতেছে, তাহারাই এইরূপ মৃদুপদবাচ্য।

অধিকাংশ প্রাসাদের সম্মুখভাগে ও পার্শ্বদেশে নানাবিধ পুষ্পবৃক্ষ বিরাজিত উদ্যান, সুপ্রশস্ত প্রসন্ন সলিল পূর্ণ কুমুদ পদ্মাদি বিবিধ জলপুষ্পে শোভমান দীর্ঘিকা বিরাজমান থাকাতে তাহার শোভা সদ্‌গুণে বর্দ্ধিত হইতেছে। দীর্ঘিকা-সলিলস্নাত সুস্নিগ্ধ সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহে পুষ্পগন্ধ হরণ করিয়া আপনার চৌরাপবাদ বিমোচন করিবার অভিপ্রায়েই যেন সকলকে উক্ত গন্ধ বিতরণ পূর্ব্বক বশীভূত করিতেছে। অগণিত মধুমক্ষি পুষ্পমধু আহরণ করিতে অভিলাষী হইয়া প্রতি পুষ্পে এক একবার উপবিষ্ট ও পুনরুত্থিত হইয়া যেন মধুর রসাস্বাদন করিতেছে, অথবা পবনের মধুগন্ধ হরণকার্য্য অবগত হইয়াই যেন ক্ষোভভরে গালি দিতে দিতে শূন্যমার্গে উত্থিত হইয়া তাহাকে পদাঘাত করিতেছে। এই সমস্ত শোভা ও সুগন্ধিই মানবের যশোরাশিরূপে পরিণত। যেমন রোপণ কর্ত্তার আন্তরিক যত্ন ও সুরুচি না থাকিলে পুষ্পবাটিকার সৌন্দর্য্য রক্ষিত হয় না, সেইরূপ কর্ম্মকর্ত্তার ক্রিয়াদোষ ঘটিলেও তাঁহার যশের গৌরব থাকে না। কেহ কেহ অজ্ঞতাবশতঃ দুর্গন্ধ পুষ্পবৃক্ষ রোপণ করিয়া আপনার অকীর্ত্তি দিগদিগন্তে বিস্তার করিতে সঙ্কুচিত হন না। বাটীর চতুর্দ্দিকে আবর্জ্জনা ও মলমূত্র পরিত্যাগ করিয়া সাধারণের চিত্ত কলুষিত করিতে অনেকে কুণ্ঠিত হন না। অনেকে অপযশকে অঙ্গের অলঙ্কার বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহাদের ইহা চিন্তা করা উচিত যে যাহাতে স্বীয় অন্তঃকরণ বিমল আনন্দনীরে নিমগ্ন হয়, যাহাতে মনের জড়তা বিনষ্ট হয়, যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে সকলের মনস্তুষ্টি জন্মে, তাহাতে অনাসক্ত থাকা অতিশয় নির্ব্বোধের ও অপরিণাম-দর্শীতার কার্য্য। কোন কবি বলিয়াছেন—

এই জ্ঞান, আত্মচিত প্রীতিয়াতে হয়।
ইষ্টদেব তুষ্ট তাতে হইবে নিশ্চয়॥

সকল কার্য্যেরই এক একটী প্রতিবন্ধক আছে। কোন কার্য্যই নির্ব্বিঘ্নে সমস্ত বাধা অতিক্রম করিতে পারে না। আজ যাহা সুদৃঢ় ও নয়ন-মনোরঞ্জক বলিয়া গণিত হইতেছে, কে বলিতে পারে যে কালের কুটিলগতির অপ্রতিহত প্রভাবে পরিণামে তাহা ধ্বস্তমূল ও ভয়ঙ্কর দৃশ্য না হইবে। অদ্য যাহা সাধারণের চক্ষে সুদৃশ্য ও অমৃতোপমরূপে প্রতীয়মান হইতেছে, ভবিষ্যতের গর্ভে তাহার যে বিষময় ফল প্রোথিত রহিয়াছে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? বর্ণিত প্রাসাদ বা মানবমণ্ডলী তাহার ব্যত্যয় ভাবাপন্ন হইবে ইহা কি বিশ্বাস্য? সুদৃঢ় ভিত্তির অসদ্ভাব, প্রবলবেগে বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টি ও বজ্রপতন, পার্থিব অগ্নির পরাক্রম প্রভৃতি কারণবশতঃ অনেক গৃহ, মানবের অন্তিম দশার পরিচারক হইয়া ভূমিসাৎ হইতেছে। যাহা এক সময়ে আকাশমার্গে মস্তকোন্নত করিয়া উচ্চশির ভূধরকে উপহাস করিত, যাহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল কান্তি মানবের কথা দূরে থাকুক বন্য পশুপক্ষীগণের অন্তঃকরণকে আকর্ষণ করিত, যাহার সুনিপুণ রচনা পারিপাট্যে সকলেই বিমোহিত হইত, সময়ান্তরে তাহারও চিহ্নমাত্র—অস্তিত্বমাত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। কালের অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মানুসারে পার্থিব পরমাণু পৃথিবীতেই বিমিশ্রিত হইয়া যায়। পরিবারও এই নিয়মের বশবর্ত্তী। যে যে কারণ প্রাসাদ পতনের নিদানভূত তাহার সমভাবাপন্ন পর নিন্দা, পরদ্বেষ অসূয়া মাৎসর্য্যাদি ও মানবের অন্তরায়ের হেতুভূত। মর্ত্তধামে এমন অনেক অসার অকৃতজ্ঞ নরাধম আছে যাহারা পরের উন্নতি দর্শনে আপনাদের সর্ব্বস্বনাশ হইল বিবেচনা করেন। কোন পরিবার ধর্ম্মপথে থাকিয়া ন্যায়ানুগত ব্যবহার দ্বারা আপনাদের ও দেশের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনে ক্রমশই অগ্রসর হইতেছে, ইহা আর তাহাদের সহ্য হয় না। কেহ বা স্বকীয় বিষ্ণুবুদ্ধি ও তেজস্বীতা প্রভাবে গণনীয় ও আদরণীয় হইতেছে। ইহা কি পাপাত্মা নীচাশয় দিগের সহনীয় হইতে পারে? কিরূপে উক্ত সদাত্মাগণ সৎকার্য্য হইতে সতত বিরত থাকিয়া, তাহাদের মতানুবর্ত্তী হন; কিরূপে তাঁহারা লোকের অপ্রিয় ভাজন ও অযশোভাগী হইয়া

সমধিক কষ্টে জীবন অতিবাহিত করিতে সক্ষম হন, অথবা কি প্রকারেই বা একবারেই তাহাদের অধঃপতন হয়, সর্ব্বদা সেই ছিদ্র অন্বেষণ করিতে নিযুক্ত হইয়া অনেক সময় আপনাদের অসদভিপ্রায় সংসাধন করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে সৎস্বরূপ জগদীশ্বর অনেক সময় অসৎব্যক্তির কদভিপ্রায় পূর্ণ করিতে পরাঙ্মুখ থাকেন। প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু প্রভৃতি দ্বারা কি সকল গৃহই বিনষ্ট হয়? যাহা জীর্ণ-অন্তঃসার-শূন্য, যাহার উপকরণ সামগ্রী অসার ভাবাপন্ন, এবং যাহার প্রাচীনত্ব প্রতিক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে, সেই সকল গৃহই সামান্য কারণে ভগ্ন বা স্থানচ্যুত হইতে পারে। কিন্তু যে মহাত্মাগণ অচল-অটল-ভাবে স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে সর্ব্বদা যত্নশীল, যাঁহার অধ্যবসায় সুদৃঢ় পণ, কিছুতেই অস্থির ভাবাপন্ন হয় না, যিনি পর নিন্দাদি অগ্নিকে স্বীয় কার্য্যের পরিশোধয়িতা স্বরূপ বিবেচনা করেন; দুরাত্মাগণ-প্রদত্ত দুষ্পরিহার্য্য কলঙ্কলেপ যাঁহাদিগের পক্ষে সুস্নিগ্ধ চন্দনলেপ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাঁহারা কি কোনরূপে আপন আপন কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে সঙ্কুচিত বা ভগ্নোৎসাহ হন? তাঁহারা প্রতিক্ষণেই তুলাদণ্ডযোগে দেখিতে পান যে ধর্ম্ম প্রবৃত্তি, পরহিতৈষী দয়া, দাক্ষিণ্যাদির এক একটী জীবন অপেক্ষা অসংখ্যগুণ ভারসম্পন্ন। এই গুণেই তাহারা মর্ত্তধামে অজরামররূপে বিরাজ করেন।

জীবন সম্বন্ধে ও উভয়ের সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ভূমণ্ডল মধ্যে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য যে সমস্ত বিষয় বর্ত্তমান আছে বা যাহা অতীত ও ভবিষ্যতের অন্তরে অন্তর্নিহিত তাহার কিছুই স্থায়ী নহে। কোনটীই চিরকাল অবিনশ্বরভাবে অবস্থিত হইতে পারে না। অনেকে কোন কোন, বস্তুর দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব-কল্পনা মানসে ভূধরের সহিত উপমা দিয়া থাকেন কিন্তু সেই অচল কি চির অচল থাকিতে পারে? তবে ইহাই সদভিপ্রেত যে সকলেই দীর্ঘজীবি বা বিনাশরহিত না হউক কোন কোনটী যে আপন দেহ দীর্ঘকাল অচলভাবে রক্ষা করে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। আমাদের জীবনকাল মধ্যে কতশত অট্টালিকার তিরোভাব, সহস্র সহস্র পরিবারের উচ্ছেদ দশা দৃষ্ট হইল, আবার হয়তঃ পিতৃ পিতামহ বদন বিনিঃসৃত

বাক্যে অনেক প্রাসাদের দীর্ঘকাল স্থায়িত্বের বিষয় শ্রুতিগোচর হইতেছে এবং সাধারণের নিকট মহাত্মাগণের সুখ্যাতি বাক্যও অহরহ শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, এই কীর্ত্তি সমূহই তাঁহাদিগের স্থায়িত্ব বিষয়ে সম্যকরূপে নিঃশয়ান্বিত করিয়া আমাদিগকে নিজ পথানুবর্ত্তী হইতে উপদেশ দিতেছে। পুরাকালীন বহুসংখ্যক রাজপ্রাসাদ যদি এক্ষণে কেবলমাত্র ইষ্টক প্রস্তর রাশিতে পরিণত হইয়াছে যদিও তথায় অধিষ্ঠাতা মহাত্মাগণের পরিবর্ত্তে সারমেয়াদির আবাসস্থান হইয়াছে, কিন্তু ইতিহাসে ভূগোলে কি তাহা সহজে বিস্মৃত হইতে দিবে? সেই ভারত নক্ষত্র দ্রৌপদী সংযুত পাণ্ডবগণ, সেই সত্য প্রতিজ্ঞ, পিতৃভক্তিপরায়ণ রামচন্দ্র প্রভৃতি মহাত্মাগণ কতকাল হইল ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের অক্ষয় কীর্ত্তি কি তাঁহাদিগকে চির সজীবতা রক্ষা করিতেছে না?

অতএব পার্থিব বিনশ্বর অনেক বস্তুর সহিত মানবের যে কোন নিগূঢ় সম্বন্ধসূত্র গ্রথিত আছে, যাহা প্রত্যেক বিচক্ষণ ব্যক্তি জ্ঞানচক্ষুরুন্মেষবশতঃ অবগত হইতে পারেন, তাহার যথার্থ নির্ণয় করা সাধারণেরই কর্ত্তব্য কার্য্য। যখন আমাদিগকে অহরহ সংসারক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে হইতেছে ও হইবে, যখন বাহ্যবস্তুর সহিত আমাদের নিত্যসম্বন্ধ অপরিহার্য্য, তখন তাহার তত্ত্বানুসন্ধান না করা অতীব নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য।

শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ মণ্ডল।—বাওয়ালী।

সমাজ-রহস্য।

—০:*:০—

প্রতিবাদ।

আজি কালি আদরিণীতে সামাজিক প্রবন্ধের অবতারণা সুলক্ষণের চিহ্ন, যে দেশের সমাজে অসংখ্য দোষ বর্ত্তমান, যে সমাজে পড়িয়া অসংখ্য প্রাণী যম যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, যাহার সংস্কারে খুব অল্পলোকই যত্নপর, সে সমাজের কথা যিনি তুলেন, তিনি যথার্থই দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

তাঁহার চীৎকার উপস্থিত অশ্রুত থাকিলেও কখন না কখন কর্ণে প্রবেশ করিবে, কখন না কখন নিস্পন্দ ভারতের চৈতন্য সম্পাদন করিবে। আদ-রিণীর সমাজ-রহস্য অতি সুন্দর প্রবন্ধ। সমাজ-রহস্যে যাহা আছে তাহা ভারতের চিন্তার বিষয় বটে। ভারতের সামাজিক উন্নতি না হইলে কখন তাহার প্রকৃত উন্নতি হইবে না। সমাজ দোষপূর্ণ থাকিলে উন্নতির আশা বিড়ম্বনা মাত্র। এই ভাবিয়া বিহারীবাবু সমাজ-সংস্কার ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন, সামাজিক প্রবন্ধ লিখিয়া দেশের চৈতন্য সম্পাদন করিতেছেন। বিহারী বাবুর উদ্দেশ্য মহৎ। প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় বিহারী বাবু প্রয়োজনীয় বিষয় ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না। এইটি বিহারী বাবুর বিশেষ গুণ। কোন কাল্পনিক ঘটনা লিখিয়া লোকের মনোরঞ্জন করিবেন, এরূপ ইচ্ছা বিহারী বাবুতে নাই, বিহারী বাবু কখন হিন্দুপুরস্ত্রীবর্গের সঙ্গীত শিক্ষা লিখিয়া হিন্দুমহিলাদের শিক্ষা দিতেছেন। কখন মনুষ্য-রহস্য লিখিয়া অন্ধ ভারতবাসীর চক্ষু ফুটাইতেছেন, আবার কখন বা সমাজ-রহস্য লিখিয়া সমাজের উন্নতির পথ পরিষ্কার করিতেছেন। তাঁহার সমাজ-রহস্য পড়িয়া বাস্তবিকই আমরা সুখী হইয়াছি। তিনি যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন, একটী ব্যতীত তাহার সকল গুলিরই আমরা অনুমোদন করি। তিনি লিখিয়াছেন,—

"পরাশর যাহাদিগকে প্রব্রজিত করিয়াছেন আমরা বলি বর্ত্তমান সময়ে তাঁহারাই দীর্ঘ প্রবাসী। একথায় অনেক পাঠক কুপিত হইবেন কিন্তু কি করিব উভয়ের সহিত যখন অনেক বিষয়ের সাদৃশ্য আছে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে তখন কেন না বলিব। শত সহস্র বার বলিব। যাহাদের স্বামী অনুদ্দেশ হইয়াছে তাঁহারা মৃত পতিকাগণের ন্যায় আশা ভরসা বিহীন নহেন। তাঁহাদের আশা ভরসা আছে, জীবনে কখন না কখন স্বামী সহবাস ঘটিলেও ঘটিতে পারে। তাই বলি দীর্ঘ প্রবাসী ব্যক্তি-দিগের পত্নীগণেরও পুনর্ব্বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত, ইহাতে কোন আপত্তি নাই।"

আমরা কুপিত হই নাই, বরং দুঃখিত হইয়াছি। আমাদের বিবেচনায় তাঁহার মত সর্ব্ববাদী সম্মত নহে। তিনি প্রব্রজিত ব্যক্তিবর্গকে বর্ত্তমান সময়ের দীর্ঘ প্রবাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং উভয়ের সাদৃশ্যগত দোষ

দেখিয়া একের যেরূপ শাস্তি হওয়া আবশ্যক অপরেরও সেইরূপ হওয়া উচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তবে দেখা যাইতেছে যে তিনি অনুদ্দেশ ও দীর্ঘ প্রবাসীর মধ্যে কোন প্রভেদ রাখিতেছেন না। তাঁহার মতে অনুদ্দিষ্ঠ ব্যক্তি স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া সংসারত্যাগী হইয়াছে বলিয়া যেমন অপরাধী, দীর্ঘ প্রবাসী উদরান্নের চেষ্টায় স্ত্রীকে স্বদেশে রাখিয়া বিদেশে অবস্থিতি করিতেছে বলিয়া তিনিও তেমনি অপরাধী। বিহারী বাবু এরূপ সাদৃশ্য কেমন করিয়া টানিলেন বুঝিলাম না। দীর্ঘ প্রবাসীর অপরাধ কি? সে স্ত্রী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবে কেন? সে ত অনুদ্দেশের ন্যায় ইচ্ছাক্রমে গৃহ ছাড়ে নাই। তবে তাহার অপরাধ কি? সে উদরান্নের চেষ্টায় বিদেশে অবস্থিতি করিতেছে এই কি তাহার অপরাধ? সে সারাদিন খাটিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া সংসার নির্ব্বাহ করে এই কি তাহার অপরাধ? সে অল্প বেতন প্রযুক্ত আপন স্ত্রীকে কাছে রাখিতে পারে না এই কি তাহার অপরাধ? যদি এই অপরাধে স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে অনুজ্ঞাত হয়, এবং স্ত্রী যদি সেই অনুজ্ঞা পালন করে, তবে স্ত্রীলোক তুমি উৎস[illegible] তোমার মুখ [illegible] দেখিতে চাহি না। যাহার মুখ দেখিয়া সংসার জ্বালা তুচ্ছ জ্ঞান হয়, সংসার ভার বুক ঠুকিয়া বহন করা যায়, যাহার মিলন-সুখ আশায় দীর্ঘকাল প্রবাস যাতনা অনায়াসে সহ্য [illegible], সেই মোহিনী প্রতিমা স্বামীর দারিদ্র্য নিবন্ধন তাহাকে ত্যাগ করিয়া, তাহাকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া চলিয়া যাইবে, আর সমাজ নিস্তব্ধভাবে তাহা দেখিবে? এই যদি সমাজ সংস্কার হয় তবে দেখিতেছি, অল্প বেতন-ভোগীর কপাল পুড়িয়াছে। সে আর বৃথা ভূতের বোঝা ব[illegible]িতেছে। এবার বঙ্গে যে সংস্কারের সূত্রপাত হইতেছে তাহাতেই তাহার দফা রফা হইবে। সে যে সম্বৎসর পরে একবার প্রিয়া সম্মিলন সুখ আশায় বসিয়া থাকে [illegible]বার সেই মুখারবিন্দ দেখিয়া দীর্ঘকালব্যাপী বিরহানল নির্ব্বাপিত করিবে বলিয়া ভরসা বাঁধে, সেই মুখে সহানুভূতির কথা শুনিবে বলিয়া জীবনের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ অগ্রাহ্য করে, তাহা আর অধিক দিন করিতে হইবে না। সমাজের নূতন সংস্কারে তাহার জীবনের একমাত্র আশা, একমাত্র ভরসা, এক[illegible]ত্র শান্তি, একমাত্র অবলম্বন, তাহার স্ত্রী তাহাকে ত্যাগ

করিয়া অপরকে বিবাহ করিবে। আর সে—সে তখন কি করিবে? সে কি আর সংসারী হইতে পারিবে? যে স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য বিদেশে অবস্থিতি করিতেছে সেই স্ত্রী তখন আর তাহার নয়—সে কি আর বিদেশ থাকিতে চাহিবে? অবিরত পরিশ্রম দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া যাঁহার দুঃখ দূর করিতে সতত চেষ্টা পাইতেছে সে তখন অপরের হইবে, সে আর কি ধনোপার্জ্জন করিবে? যে পত্র দ্বারা তাহার সর্ব্বদা সংবাদ লইতেছে সে তাহার তখন উদ্দেশ লইবে না—সে কি বাঁচিয়া থাকিবে? কখনই না, জীবন তখন ভারগ্রস্থ হইবে। হৃদয়ে যে আশা ভরসা উৎসাহ সহিষ্ণুতা ছিল তাহা তখন বিনষ্ট হইবে, তখন মনে হইবে যত শীঘ্র এই পাপের সংসার হইতে পাপের সমাজ হইতে অব্যাহতি পায় ততই ভাল।

দীর্ঘ প্রবাসী সম্বন্ধে, প্রবন্ধের আর একস্থানে বিহারী বাবু যাহা বলিয়াছেন তাহা যুক্তিসঙ্গত কিনা দেখা কর্ত্তব্য। নতুবা প্রতিবাদ অসম্পূর্ণ থাকে। তিনি লিখিয়াছেন——

"দীর্ঘপ্রবাসী ভাই! তুমি যদি বিবাহ করিয়া স্ত্রীকে ভরণ পোষণ করিতে অসমর্থ হইয়া অন্ন সংস্থানে চিরকাল বিদেশে একাকী বাস করিবে তবে তোমায় বিবাহে—গলগণ্ডে আবশ্যকতা কি, পরিবার প্রতিপালনের যোগ্য হইয়া তোমার বিবাহ করাই কি শ্রেয়স্কর নহে।"

পরামর্শ অতি সৎ। কার্য্যে পরিণত হইলে সংসারে দুঃখের অনেক হ্রাস হয়। কিন্তু আবার অপর পার্শ্বে দেখিতে গেলে ইহার সারত্ব থাকে না। এ সংসার ত সুখের নয়। ইহাতে দুঃখরূপ ভীষণ অনল অবিরত জ্বলিতেছে এবং সেই অনলে মানুষ হাড়ে হাড়ে দগ্ধ হইতেছে, ইহাতে সুখের যে বিকাশ তাহা ক্ষণিক, এই আছে এই নাই। দুঃখের হাত এড়াইতে যেন দরিদ্র লোক বিবাহ করিল না। মনে করিল যখন সময় হইবে তখন বিবাহ করিয়া সুখী হইবে। কিন্তু সুসময় কই আর আসিল না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল তথাপি সময় আসিল না। [illegible]ও হইল না। হৃদয়ের বিমলভাব ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইতে লাগিল, রিপুর প্রবলতাড়নে সে অন্ধ হইল এবং সেই অন্ধতা প্রযুক্ত সুখময় ঘূর্ণাবর্ত্ত এড়াইতে পারিল না। তাহাতে আসিয়াই পড়িল। পাঠক

দুঃখ কি বুঝিয়াছেন সে মদ্যপায়ী বেশ্যাসক্ত হইল—জগতের এক অদ্ভুত জীব হইয়া দাঁড়াইল। বিবাহ করিয়া যে সে প্রকৃত সুখী হইত আমি এমন কথা বলিতেছি না। প্রকৃত সুখী জগতে কে? তবে সুখ দুঃখের পরিবর্ত্তন পরম্পরায় মানুষ ক্ষত বিকৃত হইত না। দয়া মায়া স্নেহ মমতা প্রযুক্ত হৃদয়ে কাঠিণ্যজন্মিত না। এই সকল গুণে বিভূষিত থাকায় সে সংসারের অনেক কাজে আসিত। দেখিতে গেলে দরিদ্রের সংখ্যা ধনীর তুলনায় অনেক বেশী, এবং সময় অসময়, দেখিয়া যদি তাহাদের বিবাহিত হইতে হয় তাহা হইলে আর তাহাদের বিবাহ হয় না। সুতরাং বিবাহ ধনীরই একচেটিয়া থাকে, এবং তাহাদের বংশ পরম্পরা লইয়া জগত কিছুদিন চালিত হয়। পরে আর চলে না, কেন না দরিদ্র না থাকিলে ধনীরা কেমন করিয়া চলিবে। এবং দরিদ্রও থাকিতেছে না কারণ তাহাদের বংশ বৃদ্ধি হইবে না। স্বীকার করি বিবাহ প্রথা না থাকিলেও বংশ বৃদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলে সমাজ থাকে না। আর সমাজ না থাকিলে মানুষ পশুর মধ্যে গণ্য।

কেহ বলিতে পারেন দীর্ঘ প্রবাসীর ও অবিবাহিতের ন্যায় দশা ঘটিতে পারে। একেবারে ঘটিতে পারে না এমন কথা বলিতেছি না, তবে তাহা ঘটা তত দূর সম্ভব নয়, কেন না সে জানে যে তাহার এক ভালবাসার সামগ্রী গৃহে আছে, তাহাকে অনাদর করিতে সে সাধ্যমতে প্রস্তুত নহে। ভালবাসারূপ অমোঘ অস্ত্র তাহার হৃদয়ে থাকায় দৈহিক শত্রু তাহার কিছুই করিতে পারে না। সে বিদেশে তাহারই চিন্তায় নিমগ্ন থাকে। অন্য চিন্তা হৃদয়ে আইসে না। আর যদি তাহার ভালবাসার ধন ভালবাসাময়ী হয় তাহা হইলে সে গৃহে থাকিয়া বিদেশস্থিত স্বামীর উপর প্রাণমন সমর্পণ করিয়া রাখে, এবং সম্বৎসর পরে তাহার একবার দর্শন পাইলেই অদর্শনজনিত ক্লেশ বিস্মৃত হয়।

এতক্ষণে বোধহয় লেখকের মত খণ্ডন হইয়া থাকিবে। এতক্ষণে বোধ হয় দরিদ্রের বিবাহ যুক্তিবিরুদ্ধ নয় বলিয়া ধারণা হইতে পারে। এতক্ষণে বোধহয় দীর্ঘ প্রবাসীর বিবাহে দম্পতির বিশেষ ক্ষতি হয় না বলিয়া প্রতীতি হইতে পারে। অতএব আমরা বিদায় হইলাম।——শ্রীভগবতীচরণ গুপ্ত।